জীবন-সৈকত

(ছায়াচিত্রে সি-আই-ডি)

প্রবোধ সরকার

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং-এর
পক্ষ হইতে
শ্রীবলাই সেন ও শ্রীবিভূতি সেন
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮

পপুলার আর্ট প্রিণ্টার্স
১নং মুক্তারাম বাবু সেকেণ্ড লেন হইতে
শ্রীশিবচন্দ্র মৈত্র কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

জীবন-সৈকত

[ছায়াচিত্রে--সি-আই-ডি]

এক

মাথার ওপর কেউ না থাকলে যা হয়! আয়ু কমে এলো বা বয়সের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চললো তথাপি বিপুলের বিয়ের ফুল আর ফুটলো না। বেঁচে থাকলে বিয়ে একদিন না একদিন হবেই, এই মনগড়া তত্বকথা ভেবেই বা বিয়ের সম্বন্ধে বিলকুল কোন কথা না ভেবেই সে আটাশ বছর হেসে এবং হাসিয়ে কাটিয়ে দিলে।

বৈচিত্র্যহীন বাঙালীর জীবন নিতান্ত একঘেয়ে, আবার এই এক-ঘেয়েমিটা বিয়ের ব্যাপারে আতিমাত্রায় একচেটে। এক ঝলক পাশ্চাত্য আবহাওয়া জোর জবরদস্তিতে ঢুকে না পড়লে জীবনটা 'মরু' হ'য়ে না যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। বরাত বড় বালাই! হঠাৎ একদিন গোধূলির আলো-আঁধারে বিপুলের বরাতটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো।

আধুনিক ফ্যাসানের একটা বড় বাড়ীর চত্বরে ছোট-খাটো ষ্টেজ। সম্ভ্রান্ত বংশীয় তরুণ তরুণীরা প্রাচ্য নৃত্যকলা প্রদর্শনে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের আনন্দবর্দ্ধন করবেন। আনন্দ-বাসর নিশ্চয়! অতি আধুনিক রুচিসম্পন্ন তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ। পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর আধিক্যে, দামী এসেন্সের সৌখীন গন্ধে, তরুণ-তরুণীর আনন্দ-বিহ্বল মাতামাতিতে অনভ্যস্তের মাথা ধরে, মন খারাপ হয়।

আর্টিষ্ট সুবোধ চট্টো বিপুলের বহুদিনের বন্ধু। আজকের আনন্দ-বাসরের পরিচালক সুবোধ নিজে গিয়ে বিপুলকে নিমন্ত্রন করে এসেছে। না এসে বিপুল পারলে না। অবিবাহিতের পক্ষে এতবড় লোভনীয় আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করা মানেই মহাপাতককে প্রশ্রয় দেওয়া।

আলাপ-প্রলাপ হাস্য-পরিহাসের অস্ফুট গুঞ্জন থেমে গেল, সরে গেল ষ্টেজের পর্দা। পরিচালক ষ্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় নৃত্যকলার সম্বন্ধে মিনিট পাঁচেক বক্তৃতা দিলেন উদাত্ত-কণ্ঠে। বক্তার বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র চারিদিকে পড়লো হাততালি।

ঘোষকের ঘোষণা অনুসারে আরম্ভ হলো ঝান্সীর রাণীর 'সংগ্রাম-নৃত্য'। কুমারী গীতার সংগ্রাম-নৃত্য দেখে বিপুল মুগ্ধ হ'লো—একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়; বিপুল মুগ্ধ হলো কুমারী গীতাকে দেখে। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়; পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ার ঘাড়ে দোষ না চাপিয়েও অসঙ্কোচে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নজীর ভূরি ভূরি দেওয়া আছে পুরাণ আর ইতিহাসের পাতায় পাতায়। ভারতীয় আবহাওয়ায় বহুদিন থেকে নায়ক নায়িকাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে আসছে, গীতাকে দেখে বিপুল মুগ্ধ হ'লো। সুবোধ চট্টোর (আধুনিক যুগে ছোট নামের অনেকেই পক্ষপাতী, যেমন 'সুবোধ চট্টো') মধ্যস্থতায় ওদের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ হ'চ্ছে গ্রীণ্‌রুমের একাংশে:—

—আজকের আসরের ইনিই magnet—কুমারী গীতা ঘোষ!

বিপুল সসম্ভ্রমে নমস্কার করলে, স্মিত হাস্যে ঘাড় বেঁকিয়ে গীতা করলে নমস্কার-বিনিময়। গীতাকে উদ্দেশ ক'রে সুবোধ বললে, আর ইনি— মিষ্টার বিপুল বাসু! আধুনিক আর্টের উপাসক এবং সমঝদার!

আবার নমস্কার-বিনিময় ও ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

বিপুল নিজেই নিজের অভিভাবক। পিতার মৃত্যুর পর অগাধ bank balanceএর অধিকারী। কলকাতা সহরে খানদশেক বাড়ীর মালিক। পায়ের ওপর পা দিয়ে অনায়াসে সে পারে জীবনটা হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে। করিত্‌-কর্ম্মা লোক বলা যেতে পারে বিপুলকে। অখণ্ড বিশ্রামকে আমল না দিয়ে সে হয়েছে সখের ডিটেকটিভ। বন্ধু-

মহলে 'C. I. D. (Hon)' অর্থাৎ 'অবৈতনিক ডিটেকটিভ' নামে বিপুল পরিচিত। বন্ধুরা বলেন, বাল্যে এবং যৌবনে অসংখ্য ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার ফলে কর্ম্মজীবনে বিপুলের এই অকল্পিত পরিণতি।

ডিটেকটিভের কর্ম্মময় জীবন বিপদসঙ্কুল, প্রতি পদে বিঘ্ন। অঞ্জলী প্রথম প্রথম তার দাদাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি কিন্তু বিপুল অকুণ্ঠিতচিত্তে ভগ্নীর অনুরোধ এবং অনুযোগ হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে আর একজন তাকে C. I. D.র কাজে ইস্তফা দিতে বলেছিল—সে সৌমেন। সৌমেনের একটু ইতিহাস আছে।

সে প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। সৌমেনের বাড়ী ছিল বিপুলের বাড়ীর পাশে। মহামারীর প্রকোপে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন সৌমেনের মা, বাবা আর পিসীমা। দেশে তাদের জ্ঞাতি-গুষ্ঠি হয়তো ছিল অথবা ছিল না, মোট কথা সৌমেনের খোঁজ খবর নিতে কেউ এলো না ; শুধু পাওনাদাররা ওদের বাড়ীখানা দেনার দায়ে কিনে নিলে। পাড়ার অনেকেই মৌখিক সহানুভূতি দেখাতে এলেন, কিন্তু সৌমেনের ভার নেবার মত একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। বিনা স্বার্থে পরের ছেলে মানুষ করতে স্বেচ্ছায় ক'টা লোক রাজি হয়? সৌমেনের না ছিল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা আর না ছিল ক'লকাতার সহরে খানকয়েক বাড়ী, তাই মন্তব্য শোনা গেল—ছেলেটা নিতান্তই অভাগা!

অভাগা ছেলে সৌমেনের শেষ পর্য্যন্ত স্থান হ'লো বিপুলদের সংসারে। বিপুল সৌমেনের চেয়ে বছর দুয়েকের মাত্র বড় ; ঠিক সমবয়সী না হ'লেও বন্ধুত্বটা এদের খুবই গাঢ়। এক জায়গায় মানুষ হ'লে ভাব, ভালবাসা, বন্ধুত্ব হ'য়েই থাকে। এক-আধ বৎসর হ'লেও নয় কথা ছিল, এ একেবারে বিশ বিশ বৎসর।

তিনটি প্রাণীকে নিয়ে বিপুলের সত্যিকারের সংসার, সৌমেন অঞ্জলী আর বিপুল নিজে। তিনজনেই অবিবাহিত ; বড়লোকের সংসারে যা

হয়, দাস-দাসীরাই চালায় সংসার। সংসার অনভিজ্ঞা অঞ্জলী যথাসম্ভব সব দিকে নজর রাখতে চেষ্টা করে। অবিবাহিতা হ'লেও অঞ্জলীর বয়স নেহাত কম নয়, প্রায় কুড়ির কাছাকাছি। এত বড় আইবুড়ো মেয়েকে আমরা সাধারণতঃ স্বাধীনা, প্রগতিশীলা, up-to date মেয়ে ব'লে অভিহিত করি। অঞ্জলীর গায়ে কিন্তু নারী-প্রগতির হাওয়া লাগেনি, বর তার ঠিকই হ'য়ে আছে।' ইচ্ছা করলে অঞ্জলীকে আমরা স্বয়ম্বরা বলিতে পারি।

বিপুলের পিতা বিশ্বেশ্বর বাবুর ইচ্ছা থাকলে কি হবে—জীবদ্দশায় তিনি কন্যাটিকে পাত্রস্থ ক'রে যেতে পারলেন না। কন্যার মনোনীত পাত্র সৌমেনই যে তাঁর ভাবী জামাতা একথা তিনি জানতেন এবং সমর্থনও করেছিলেন। ভগ্নীর বিয়ের যোগ্যপাত্র স্বগৃহে থাকায় খামখেয়ালী বিপুল ওদের বিয়ের সম্বন্ধে খুব বেশী তৎপর নয়। খোঁজা-খুঁজির হাঙ্গামা নেই, একদিন-না-একদিন বিয়ে দিলেই চলবে।

এই ভাবেই বছর কয়েক কেটে আসছে।

* * * * *

আরো মাস তিনেক কাটলো।

ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই বিপুলের দেখতে দেখতে তিন মাস সময় কেটে গেল। এই সময়টা সে নিজেকে নিয়ে অর্থাৎ গীতাকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে অন্য দিকে লক্ষ্য দেবার বা অন্য কথা ভাববার তার সময় একান্ত অল্প, নে-ই একরকম বলা যায়। বিংশ শতাব্দীর অনাঘ্রাতা নৃত্যপটিয়শী কুমারী তন্বী, তায় আবার সুন্দরী, বিপুলকে দোষ দেওয়া যায় না; বয়সের দোষে গীতাকে নিয়ে সে যে আত্মভোলা হ'য়ে মাতামাতি স্বুরু করবে—এ আর এমন বিচিত্র কথা কি? নূতন নূতন যা হয়, আজ বোটানিকেল গার্ডেন—কাল লেক্—পরশু দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী; নিত্য নব অভিযান।

পেটের কথা চেপে রাখতে C.I.D.রা নাকি অদ্বিতীয়। তার প্রমাণ স্বয়ং বিপুল। অতি বড় বন্ধু সৌমেনের কাছেও সে নিজেকে ধরা দেয়নি। প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত নবীন-নবীনারা বন্ধু-বান্ধবীর কাছে নিজেদের মনের কথা খুলে না বললে স্বস্তি পায়না, বিপুলকে কিন্তু ওবিষয়ে একম্-অদ্বিতীয়ম্-কেবলম্ বলা যেতে পারে ; পরে কি হয় বলা যায় না, আজ পর্য্যন্ত তার পদস্খলন হয়নি। আপনাতে সে আপনি বিভোর।

সেদিন দুপুরে বিপুল বাড়ী ফিরলো ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে।

অঞ্জলী বললে, দাদা! গীতা ব'লে কে একটি মেয়ে তোমায় টেলিফোনে খুঁজছিল?

—গীতা! বিপুলের মুখে কৃত্রিম চিন্তার ছায়া।

—তিনি বললেন, আমার নাম বললেই বিপুলবাবু চিনতে পারবেন।

—ও গীতা! গীতা!! হ্যাঁ তাদের একটা জরুরী কেস আমার হাতে।

—কি কেস—কলেরা না টাইফয়েড?

বিপুল পিছন ফিরে দেখলে—প্রশ্নকর্ত্তার মুখে মৃদুমন্দ হাসি।

ধরা পড়ার ভয়ে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় বিপুল।

—মেয়েছেলের কেস করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজে যেন কেসে পড়ো না, বন্ধু!

—দ্যাখো সৌমেন! সিরিয়াস্ জিনিষ নিয়ে সব সময় ইয়ারকি করতে চেষ্টা করো না।

উত্তরে কি যেন সৌমেন বলতে যাচ্ছিল, দূর থেকে অঞ্জলী তাকে ইসারায় নিষেধ করলে ঠোঁটের ওপর একটা অঙ্গুলী চেপে।

সৌমেনের স্নান আগেই সারা হ'য়ে গেছে। বিপুল তাড়াতাড়ি

স্নান ক'রে এসে সৌমেনের সঙ্গে খেতে বসলো। ঠাকুর পরিবেশন ক'চ্ছে,অঞ্জলী ক'রছে তদারক।

—বাঃ মাছের কালিয়াটা তো সুন্দর হ'য়েছে হে, সৌমেন। ঠাকুর দেখছি অঞ্জুর চেষ্টায় মানুষ হ'য়ে গেল !

—ঠাকুর রাঁধেনি, রেঁধেছে তোমার···অঞ্জলীর সঙ্গে চোখো-চোখি হ'য়ে যেতেই সৌমেন হেসে ফেললে।

—ও অঞ্জু রেঁধেছে ! তাই তো বলি—এত সুন্দর রান্না—তুইও আমাদের সঙ্গে বসলি না কেন, অঞ্জু !

—আমি কি কোনদিন তোমাদের সঙ্গে—

অঞ্জলীকে শেষ করতে না দিয়ে বিপুল বললে,—না, আজ বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে কিনা তাই বলছি। পতি যে তোদের পরমগুরু—পতিসেবা না ক'রে যে তোদের—না কি বল হে, সৌমেন !

দাদার কথা শেষ হবার পুর্ব্বেই অঞ্জলী স্মিত হাস্যে স্থান ত্যাগ করে।

সেদিন দুপুরে বিশ্রাম না ক'রেই বিপুল তার জরুরী কাজে বেরিয়ে গেল।

—অঞ্জু !

সৌমেনের ডাকে অঞ্জলী হুজুরে হাজির হয়।

—কি ? এত ডাকাডাকি কিসের ?

—কি রকম বুঝছো ?

—কি বুঝবো ?

—তোমার দাদা আর তার জরুরী কাজ ?

নীরবে মৃদুহাসি হাসতে লাগলো অঞ্জলী।

—বিশ্বাস তুমি কর আর নাই করো, তোমার দাদাটি নিশ্চয়ই গোপন প্রেম সুরু করেছে।

লজ্জামাখা হাসি হেসে অঞ্জলী বললে, হ্যাঁ আপনার এক্ কথা! নিজের চোখ দিয়ে সব সময় জগৎটাকে দেখলে চলে না।

—কেন, বোন গোপন প্রেম করতে পারে আর ভাইয়ের বেলায় যত দোষ!

—এই কথা বলবার জন্যেই বুঝি জরুরী তলব! চল্লুম আমি!

পথ রোধ ক'রে সৌমেন বললে,—আহা-হা, চটো কেন? খাওয়ার পর একটু গল্প-গুজব করা ভালো। নাও—বসো! তুমি দেখছি সেই সেকেলে পাঁড়া-গেঁয়ে মেয়ের মত ক্রমশঃ লাজনম্রা হ'য়ে উঠছো!

আসন গ্রহণ করতে করতে অঞ্জলী বললে,—হঠাৎ আজ দুপুরে আপনি এমন দার্শনিক হ'য়ে উঠলেন কেন

—কি বলছো তুমি! দার্শনিক আবার কোথায় হ'লাম? তার চেয়ে বরং আমার তুলনা করতে পারতে ফ্রয়েড বা হ্যাভলোকেলিসের সঙ্গে। লজ্জায় বাধলে—আমাদেব স্বদেশী শাস্ত্রবিদ ঋষি বাৎসায়নের নাম করতে পারতে! বটে, মুখ টিপে টিপে হাসা হচ্ছে। তবে যে বলতে—আদিরস সংক্রান্ত বা সেক্‌স-ফেক্‌স তুমি পড়া পছন্দ কর না?

—আজ কি আমি বলছি যে ওসব বই পড়া আমি পছন্দ করি?

সিগারেট ধরাতে ধরাতে সৌমেন চাপা হাসি হাসে, বলে—সাপের হাসি বেদেয় চেনে!

—কেন—আপনি কি বেদে?

—কারণ তুমি সাপ। কি, রাগ করলে?

অঞ্জলী মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো। সৌমেনের কোন কথার জবাব দিলে না। ব'সে ব'সে কথা বলার কোন ফল হ'লোনা দেখে সৌমেন ওর সামনে উঠে এলো! এক লহমা ওর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অঞ্জলীর কাঁধে দুম্ ঝাঁকানি দিয়ে বললে সৌমেন,—বাঃরে মেয়ে,

উনি আমায় বেদে বললেন আর আমি ওঁকে সাপ বলাতেই যত মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেল।

—যান, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইনা! ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো অঞ্জলী।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো সৌমেন। বললে, বাঙালীর মেয়েরা যে ভয়ানক সেন্টিমেণ্টাল—তার প্রমাণ তুমি! আচ্ছা তুমিই বল, সত্যি সত্যি রাগ করবার মত আমি কি কিছু বলেছি?

অঞ্জলী নীরব।

—কি, উত্তর দিচ্ছ না যে? বলতে বলতে সৌমেন অঞ্জলীর পাশে বসলো।

—আমার আজ একটুও ভাল লাগছে না, আপনি আজ আমায় ভয়ানক অপমান করেছেন।

—অপমান!

—হ্যাঁ, ঐ যে বললেন, বোন গোপনে—

কথা শেষ না করেই অঞ্জলী মুখে আঁচলের খুঁট চাপা দিয়ে চাপা হাসি হাসে।

—Beg your pardon! ওটা গোপন প্রেম না ব'লে—প্রকাশ্য প্রেম বলাই আমার উচিত ছিল।

নীচ থেকে দিদিমণির উদ্দেশে ঝিয়ের ডাক শোনা গেল। অল্প দু'চার কথার পর অঞ্জলী নীচে নেমে গেল। সৌমেন সেই সোফার ওপরেই দেহরক্ষা ক'রে হলো তন্দ্রাচ্ছন্ন।

* * * * *

ওদিকে তখন আর এক দৃশ্য।

ডায়মণ্ড হারবার। প্রায় নদীর কিনারায় ঝাউগাছের তলায় একখানি আধুনিক ফ্যাসানের মোটার এসে থামলো। ষ্টিয়ারিঙ

ছেড়ে নেমে এলো বিপুল, নামলো গীতা। গীতা নৃত্যছন্দে ছুটে গেল জলের ধারে, খুসীতে সে যেন উপচে পড়ছে।

—ধারে যেয়োনা, পড়ে যাবে! বলতে বলতে বিপুল এগিয়ে এলো।

—কি যে বলেন তার ঠিক নাই! Am I a baby!

গীতার কাঁধে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বিপুল বললে, Not a baby but a living beauty!

রঙ্গ করে গীতা বললে,—Naughty boy!

—What! বলেই বিপুল গীতার পথ আটকে দাঁড়াল সামনে এসে।

গীতা চকিতে পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে লুকোলো একটা ঝাউ গাছের পিছনে। বিপুল হাসতে হাসতে ছুটে এলো ওকে ধরবার জন্য। এক গাছ থেকে আর এক গাছ, সে গাছ থেকে অন্য গাছ—আরম্ভ হ'লো লুকোচুরি খেলা। খেলার আনন্দ উপভোগ করার জন্যই বিপুল ওকে ইচ্ছা ক'রে ধরে না। হু হু ক'রে বাতাস দিচ্ছে, অতি সন্তর্পণে বিপুল সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে একটু থেমে। যে গাছের পিছনে গীতাকে লুকোতে দেখেছিল সেখানে গীতা নেই। পা টিপে টিপে বিপুল একটার পর একটা গাছের অনুসন্ধান করে ওকে আচম্‌কা ধ'রে তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য। মিনিট পোনের কাটে খুঁজতে খুঁজতে—জিদও বাড়ে উত্তরোত্তর—গাছের সংখ্যাও আসে কমে।

গীতাকে খুঁজতে খুঁজতে জলের ধারে নেমে এলো বিপুল। কৈ কোথাও তো নেই! বিপুলের উৎসাহ ক্রমশঃ উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়। সব চেয়ে উঁচু একটা জায়গায় উঠে দেখলে সে, কিন্তু গীতা ছাড়া আর সব কিছুই চোখে পড়লো। চিন্তিত হ'য়ে পড়ে বিপুল। তবে কি—তবে কি গীতা জলে পড়ে গেল নাকি! সহুরে মেয়ে—নিশ্চয়ই সাঁতার জানে না। আর জানলেই বা কি—ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি তার সাধ্য! ভয়ানক ভয় হ'লো বিপুলের। ইচ্ছা হলো—নাম ধ'রে

গীতাকে চীৎকার করে ডাকে, কিন্তু কেমন একটা লজ্জা যেন তার কণ্ঠ রোধ ক'রে বসলো, মুস্কিলে পড়লো বিপুল।

দড়ির দোলাটা দুটো গাছের ডালে খাটিয়ে একটা ছোকরা বললে, আর উঁচু করবো বাবু—না এই রকমই থাকবে?

বিপুল সে কথায় কান দিলে না।

—ও বাবু! দেখুন না একবার চেয়ে? বিপুলের উদ্দেশে বেশ জোরে জোরেই ছোকরাটি বললে।

ফিরে দাঁড়িয়ে বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই বিপুল বললে,—আমি কি তোকে দোলা খাটাতে বলেছি?

—দিদিমণি যে আপনাকে জিগ্গেস্‌তে বললে? ছোকরাটি ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে বললে।

দিদিমণি! আশ্চর্য্য হয় বিপুল। ছোকরাটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে বিপুলের মুখের দিকে।

—কে দিদিমণি—কোথা দিদিমণি?

অদূরে গীতাকে দেখিয়ে ছোকরাটি হাসিমুখে বললে ঐ যে—খেতে খেতে আসতেছেন।

—বাঃ বেশ তো! তোমার একটুও—

বড্ড পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন, শারীরিক এবং মানসিক! নিন্—লেবু খান্, মেজাজটা ঠাণ্ডা করুন! বলতে বলতে গীতা দুটো বড় বড় কমলা লেবু বিপুলের দিকে এগিয়ে ধরে।

—আমি লেবু খাইনা।

—আহা, তা তো আমি জানি। তবে কিনা—আজ না হয় আমার অনুরোধে একটা খেলেন? ··নিন—ধরুন!

লেবু দুটো হাতে নিতে নিতে বিপুল বললে, না-না, এসব আমার ভাল লাগছে না।

—মাটিতে দাঁড়িয়ে না খান, দোলায় চড়ে খেতেতো আর কোন আপত্তি নেই! গম্ভীরভাবে বিপুল বললে, তুমি জিনিষটাকে বড্ড হালকা ক'রে ফেলছো, গীতা!

দোলার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে গীতা বললে, মোটেই না! আসুন—?

—এই অবেলায় দোলায় চড়ে কি হাত পা ভাঙবে? বলতে বলতে বিপুল দোলার ধারে এগিয়ে এলো।

গীতা সোল্লাসে বললে, তাতে কি! আপনি রয়েছেন পাশে, মোটার আছে সচল অবস্থায় সঙ্গে। যদি তেমন কিছু অঘটন ঘটে—ভয় কি?

—সব জিনিষই তুমি কেমন lightly নাও!

Grave হবো ক'লকাতায় ফিরে। আপাততঃ আমায় দোলায় তুলে দেবেন—না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বকথা শোনাবেন?

বিপুল গীতাকে দোলায় তুলে দিলে।

গীতা বললে, এইবার আপনি উঠুন!

—ধ্যেৎ, ছিঁড়ে যাবে।

ছোকরাটি অদূরে দাঁড়িয়েছিল। একগাল হেসে বললে, এক সাথে এক গণ্ডা লোক উঠলেও ছিঁড়বেনি বাবু, পাকা শোনের দড়ি দিয়ে তৈরী।

—তার চেয়ে তুমি চড়ে থাকো, আমি দোলা দিই? ব'লেই বিপুল অনভ্যস্ত হাতে সজোরে দোলাটা দুলিয়ে দেয়।

ভীত কণ্ঠে গীতা বলে, ওমা—আ-আ গেলুম!

আতঙ্ক কম্পিত গীতাকে গিয়ে দোলাশুদ্ধো জড়িয়ে ধরে বিপুল, দোদুল্যমান দোলা মাঝপথে থেমে যায়।

—আপনার প্রাণে কি একটুও মায়া-দয়া নেই। যদি পড়ে যেতুম—?

হাতটা কেমন ফসকে গেল, গীতা! I am sorry—!

অদূরে ছোকরাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়চোখে চেয়ে হাসছে।

সেদিকে চোখ পড়তেই গীতা ত্রস্তে গায়ের কাপড় ঠিক করে নিতে নিতে বললে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ আপনাব একটুও— !

বিপুল স্মিতহাস্তে বললে, ও একটা Idiot ! ওকি, নামছো কেন ? চল—আমিও তোমার সঙ্গে উঠছি।

—আর উঠে কাজ নেই। দেখছেন—ওপাশে কত লোক দাঁড়িয়েছে ?

হাসতে হাসতে চাপা গলায় বিপুল বললে,—সবদিক দিয়ে আমাদের দেশটা একবারে কালীঘাটের কাঙালীর দেশ। বেচারীদের না মেটে পেটের ক্ষুধা আর না মেটে বুকের! সত্যি গীতা, হ'য়তো ওদের দেখে তোমার হ'চ্ছে লজ্জা ; আর আমার কি হচ্ছে জানো ?—দুঃখ ! "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে—"।

—আঃ কবিত্ব রাখুন আপনার ! দেখছেন মেঘ করে আসছে, চলুন তাড়াতাড়ি ফেরা যাক্।

—অদিনের জল আর অমানষের কথা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনা, গীতা !

—আপনার কোন কিছু বরদাস্ত করা বা না-করায় প্রকৃতি বিন্দুমাত্র চঞ্চল হ'য়ে উঠবে না বিপুলবাবু !

বিপুল বললে, We must control the nature.

—First we must control ourselves ! বলতে বলতে বিপুলের হাত ধ'রে হাস্যময়ী গীতা মোটরে উঠে।

গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোকরাটি গীতার পাশে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ সেলাম করে।

—ওঃ ! ব'লে গীতা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলতে যায়। গীতার হাত চেপে ধ'রে বিপুল বললে, ও কি— !

—ধার দিচ্ছি, পরে দিবেন।

দোলার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ফুল-স্পীডে ফিরলো ওরা ক'লকাতাভিমুখে।

দুই

আজকাল প্রায়ই দুপুরে বিপুল বাড়ী থাকে না, বেরিয়ে যায় কাজের অছিলায়। সৌমেন ঠাট্টা করে কোন কিছু বললে বিপুল সে কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়।

সেদিন দুপুরে নাছোড়বান্দা হ'য়ে সৌমেন ওকে চেপে ধরে। বিপুলের গোপন কথা না জেনে সে কিছুতেই ছাড়বে না। ভারী মুস্কিলে পড়ে বিপুল।

সৌমেন বলে, এটা তোমার নিছক স্বার্থপরতা। প্রেম কচ্ছো—প্রেম কর; খুলে বলতে দোষটা কি? আমি তো আর ভাগ বসাতে যাচ্ছিনা, আর বন্ধু যদি বন্ধুর কাছে পেটের কথা খুলে না বলে তো কার কাছে বলবে?

নিরুপায় হ'য়ে বিপুল বললে, না শুনে কিছুতেই ছাড়বি না?

—অদম্য উৎসাহে সৌমেন চেঁচিয়ে উঠলো, No—Never।

—হ্যাঁ, তুই যা ভেবেছিস তাই সত্যি!

—Cheer you! চল্—দেখাবি চল্।

—আজ নয় ভাই, আগে engagement ক'রে আসি।

—এঃ আবার engagement! না আজই যাবো।

বিপুল জোরের সঙ্গে বললে, না—তা কিছুতেই সম্ভব নয়। Her Highness তাতে চটে যেতে পারেন। সাবধান, লোভটোভ দিওনা কিন্তু?

—কি নাম ?

—গীতা।

—বটে। হিন্দুর সত্য-সনাতন আদি-অকৃত্রিম শাস্ত্র। All-right.

—দেখতে শুনতে কেমন ? গান গাইতে পারে ? বেশ up-to-date তো ?

– তোর চক্ষুকর্ণের বিবাদ শীগগির ভঞ্জন করার চেষ্টা করবো।

আগ্রহ সহকারে সৌমেন জিজ্ঞাসা করে, গান শোনাবে তো ?

—শুধু গান কি বলছিস, মেজাজ যদি ভাল থাকে তবে তোকে নাচ পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিতে পারে।

—নাচতেও পারে নাকি ?

—নিখিল-ভারত-নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

রহস্য করে সৌমেন বলে, বটে ! না দেখেই তো তার সঙ্গে আমার প্রেম করতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

—খবরদার, খুন করেঙ্গা ?

—চুপ্ চুপ্—আস্তে। তোমার বোন শুনতে পেলে এখুনি ছুটে আসবে।

—ঠিক বলেছিস্, পালাই তবে। বলতে বলতে বিপুল ঘর থেকে বেরিয়ে যায় হাসি মুখে।

* * * * *

পরের দিন।

অপরাহ্নে ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সৌমেন কি একখানা বিলাতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল, চায়ের পিয়ালা হাতে অঞ্জলী চুপি চুপি পিছনে এসে দাঁড়াল—মুখে তার দুষ্টুমির মৃদু হাসি।

সে দিকে না চেয়ে সৌমেন গায়,—"সামনে এসো—সামনে এসো—"

টিপয়ের ওপর চায়ের পিয়ালা রাখতে রাখতে অঞ্জলী বললে, চুপ্—আস্তে!

চেয়ারের ওপর উঠে ব'সে সৌমেন বললে, কারণ?

—আবার! কৃত্রিম তিরস্কারের স্বরে ব'লে অঞ্জলী ওঠে তর্জ্জনী স্পর্শ করে।

অঞ্জলী চলে যাবার উপক্রম করতেই সৌমেন তার পথ আগলিয়ে গেয়ে ওঠে, "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে--"

—আঃ কি করেন, দাদা এসে পড়বে যে!

—তা এলেই বা!

—বাঃ রে—!

সৌমেন জোর ক'রে অঞ্জলীকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। বলে, আচ্ছা তুমি আজকাল আমাকে সৌমেনদা না ব'লে মাঝে মাঝে সৌমেনবাবু বল কেন?

—বেশ তো! দাদার সামনে লজ্জা করেনা বুঝি?

—কিসের লজ্জা?

—জানি না! চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল?

—তোমার চা?

—আমি পরে খাবো।

সৌমেন ওর হাতখানা নেড়ে দিয়ে বললে, লক্ষ্মিটি! এঘরে নিয়ে এসো, এক সঙ্গে খাবো।

স্নিগ্ধ হাস্যে অঞ্জলী ঈষৎ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দরজার কাছে গিয়ে বললে, আনলে তো!

—না আনো—তোমার পিয়ালার চা পিয়ালাতেই ঠাণ্ডা হবে।

—ওঃ কাল হেরে গিয়েছো ব'লে তাই এত উৎসাহ! বেশ—আমি রাজি, কিন্তু—!

বিপুল উদ্যমে অঞ্জলী বললে, কিন্তু কি—আজ জিতবো নিশ্চয়ই!

হাঃ হাঃ হাঃ হেসে উঠলো সৌমেন।

সামনের মাঠে সৌমেন আর অঞ্জলী ব্যাডমিন্‌টন খেলায় মত্ত। বিপুল বারাণ্ডা থেকে কি যেন বললে সৌমেনের উদ্দেশে। ওদের মিলিত হাসি-কথার উত্তাল তরঙ্গে ডুবে গেল বিপুলের কণ্ঠস্বর।

আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে জোর গলায় বিপুল ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, ওহে সৌমেন, আজকের engagementএর কথা ভুলে গেলে? —My God! এক্ষুনি যাচ্ছি ভাই! অঞ্জু, আজ আর থাক্? আমাদের বেরুতে হবে, জরুরী engagement.

—কোথা যাবেন, বেড়াতে—না বায়স্কোপে?

সৌমেন যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললে, যাবো—যাবো তোমার ভাবী বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে।

আদর মাখা স্বরে অঞ্জলী বললে, আমিও যাবো!

—তুমিও যাবে! All-right—come along!

* * * * *

গীতার বাড়ী।

মোটারের হর্ণ শুনেই গীতা ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, বিপুলের সঙ্গে হলো তার দৃষ্টি বিনিময়। ওরা গাড়ী থেকে নামবার আগেই গীতা ওপর থেকে নেমে এসে হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বললে, স্বাগতম্!

গাড়ী থেকে নেমে বিপুল, বন্ধু আর ভগ্নীর সঙ্গে গীতার পরিচয় করিয়ে দেয়। নমস্কার বিনিময় করতে করতে গীতা নিজেই নিজের পরিচয় দেয়—বিপুলকে কোনকিছু বলবার অবসর না দিয়ে।

—আর আমি—গীতা!

গীতার সারল্যে সবার মুখেই হাসি ফুটে ওঠে।

—আসুন! ব'লে গীতা অঞ্জলীর হাত ধ'রে ওপরে নিয়ে যায়।

চায়ের টেবিল আগে থাকতেই সজ্জিত ছিল।

আগন্তুকদের চায়ের টেবিলে বসিয়ে গীতা পিসীমাকে ডেকে নিয়ে এলো ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। দু'পক্ষের পরিচয় বিনিময়ের পর প্রথম পক্ষীয় সকলে উঠে পিসীমাকে প্রণাম করে।

পিসীমা বললেন আস্ত-ব্যস্ত হ'য়ে, থাক্-থাক্, তোমরা সব আমার ঘরের ছেলেমেয়ে; প্রণাম করতে নেই!

খিলখিল করে হেসে উঠলো গীতা, বললে, প্রণামটা কি পরের ছেলেমেয়েদের একচেটে, পিসীমা?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে পিসীমা বললেন, দূর পাগলি! হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাদের আজ শুধু চা খেয়ে গেলে ছাড়ছি না—রাত্রে সকলকে এখানে খেয়ে যেতে হবে; বুঝেছো বিপুল? নম্রকণ্ঠে মৃদুহাস্যে বিপুল বললে, তাই হবে পিসীমা! ওমা, বেয়ারাটা তোমাদের এখনো চা দিতে দেরি ক'চ্ছে কেন!

গীতা পিসীমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, পাছে মুরগীর ডিম নিয়ে তোমায় ছুঁয়ে ফেলে সেই ভয়ে আসছে না।

—তাতে কি হ'য়েছে, আমি তো এখনও স্নান করিনি!

অঞ্জলী বললে, পিসীমা এই অবেলায় স্নান করবেন?

পিসীমার মুখে ফুটলো স্নিগ্ধ হাসির রেখা।

গীতা বললে, বেলায় উনি তো কোন দিনও স্নান করেন না। ওদিকে সূর্য্য ওঠার আগে—যাকে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আর এদিকে সূর্য্য অস্তে, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা!

— আর দেরী ক'রোনা মা, তোমাদের চা খাওয়ার সময় হলো—চা দিতে বল।

পিসীমা চলে গেলেন।

চা খেতে খেতে গীতা বললে, অঞ্জলী একটু লাজুক—নয় বিপুলবাবু?

কোন উত্তর না দিয়ে সৌমেনের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বিপুল অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। মুচকি হেসে গীতা বললে অঞ্জলীর দিকে চেয়ে, ও বুঝেছি!

সৌমেন বললে, কি বুঝলেন?

—অঞ্জলীর লজ্জার কারণ বা উৎস।

—বিপুল যেমন আপনার লজ্জার কারণ বা উৎস?

হো হো করে হেসে উঠলো গীতা। নির্ব্বিকার অঞ্জলীর কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নেই, চায়ের পিয়ালায় সে গভীর ভাবে মনোনিবেশ ক'রেছে।

গীতা বললে, কি ভাই অঞ্জলী—কথা বলছো না কেন?

অঞ্জলী বললে, খেতে খেতে কথা বলা ডাক্তারি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

গীতা বিপুলের দিকে চেয়ে বললে, বিপুলবাবুর উচিত—তোমাকে ভাই ডাক্তারি পড়ানো!

—তা বুঝি জানেন না, ওঁরা ভাই বোন দু'জনেই ডাক্তার—হোমিও-প্যাথি ডাক্তার? মনে করুন—কেউ এলো পেটব্যথার ওষুধ নিতে, ভাই বললেন—এই ওষুধটাই খাটবে, বোন ব'ললেন, উঁহু ওটা নয়; আমি যেটা দিচ্ছি এটাই এক্ষেত্রে খাটবে। ব্যস্, ওদিকে রোগী রইলো ব'সে, এদিকে ওঁরা আরম্ভ ক'রলেন তুমুল তর্ক। শেষ পর্য্যন্ত আমার মত হাতুড়ে গোবদ্যিকে অযাচিতভাবে মধ্যস্থ হ'য়ে মীমাংসার ভার গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'তে হয়। বললে না বিশ্বাস করবেন—রোগীর ততক্ষণে পেটব্যথা সেরে মাথাব্যথা স্থরু হ'য়েছে।

সৌমেনের কথা শুনে গীতা হেসে যেন লুটিয়ে পড়তে চায়। অঞ্জলী আর বিপুলও না হেসে থাকতে পারে না।

—বাইরে যা তা ব'লে তুমি কি আমাদের পসার নষ্ট করতে চাও, সৌমেন! ওঁর কথা বিশ্বাস করো না গীতা, বিনা পয়সায় উনি আমাদের ওষুধ খান। যারা যত 'ফি' না দেয় তারাই তত করে ডাক্তারের নিন্দা। অঞ্জু, বল্‌তো কত দিন তুই বিনা পয়সায় সৌমেনের মাথাধরা, পেটকামড়ানি—আরো কত কি সারিয়েছিস?

অঞ্জলী নিঃশব্দে মুচকে মুচকে হাসে।

সকলের চা খাওয়া ততক্ষণে শেষ হলো। টাওয়েল দিয়ে মুখ হাত মুছতে মুছতে সৌমেন বললে, খাওয়ার পালা তো শেষ হলো—এবার?

সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে পড়লো গীতার ওপর।

বিপুল বললে, এবার তোমাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য গীতা দেবী একখানি নৃত্য ক'রতে পারেন।

লজ্জামাখা স্বরে গীতা বললে, ঠাট্টা হ'চ্ছে বুঝি!

হঠাৎ সৌমেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, অতিথি সৎকারে কার্পণ্য করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, গীতা দেবী!

—এঁরা দু'জনেই দেখি মহা শাস্ত্রভক্ত। আপনি (বিপুলের উদ্দেশে) এমন দলছাড়া গোত্রছাড়া হ'তে গেলেন কেন?

সৌমেন বললে, কারণ উনি আপনার ভক্ত!

—আঃ সৌমেন! আসল কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে!

গীতা মুখর হ'য়ে উঠে বলে, বেশ—আমি নাচতে রাজি আছি কিন্তু অঞ্জলীকে গাইতে হবে।

লাজবিজড়িত কণ্ঠে অঞ্জলী বললে, আমি গানটান জানিনা ভাই।

সকলে পারে না, এক একটা লোকের এবিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা—অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিবিড়ভাবে ভাব জমিয়ে মানুষকে আপনার ক'রে নেয়; সে ক্ষমতাটুকু গীতার মধ্যে আছে। সে এমনিভাবে হুবহু অঞ্জলীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ ক'রলে—যেন তার সঙ্গে গীতার কতদিনের ভাব।

একথা নিশ্চিত—, সদ্য পরিচিতা অন্য কেউ এভাবে তার কণ্ঠস্বর অনুকরণ ক'রে ঠাট্টা ক'রলে অঞ্জলী অসন্তুষ্ট এবং নিজেকে অপমানিত বোধ ক'রতো। এক্ষেত্রে উলটো ফল ফললো, সদ্য পরিচিতা বান্ধবী এবং ভাবী ভ্রাতৃবধূর ওপর তার শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ বেড়ে গেল। গীতার আন্তরিকতায় সত্যই মুগ্ধ হয় অঞ্জলী, আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সে স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজেই অরগ্যানের সামনে গিয়ে বসে।

নৃত্য আরম্ভ করার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সৌমেনের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে গীতা বললে, হাসবেন না কিন্তু!

সৌমেন বললে, চেষ্টা করবো।

বিপুলের দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে গীতা নৃত্য সুরু করে।

তিন

আজ ক'দিন হলো সৌমেন ক্রমশঃই যেন একটি নূতন মানুষে পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠছে। কি যে তার হ'য়েছে তা সে নিজেই জানে না স্পষ্টভাবে। একটা মানুষ এত শীগ্‌গীর বদলায় কেমন করে। যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর জেগেছে তার বিতৃষ্ণা, বিরক্তি। সদাই চিন্তিত, অন্যমনস্ক। কেমন একটা দারুণ মানসিক অশান্তিতে সে দিবারাত্র অস্থির হ'য়ে উঠছে। ধীর স্থির হাস্যময় সৌমেনের যেন মৃত্যু হ'য়েছে—এ তার আর এক অকল্পিত মূর্ত্তি। মসৃণ পথে চলতে চলতে হঠাৎ হোঁচট লাগলে মানুষ যেমন আঁতকে উঠে আশপাশ চারিদিকে চেয়ে দেখে—সৌমেনের অবস্থাও ঠিক তাই।

সৌমেনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কারুর দৃষ্টিই এড়ায় না, কিন্তু কারণটা কেউ-ই আবিষ্কার করতে পারেনা। সে নিজের মুখে কাকেও কিছু বলেনা, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়। এতটা

নির্ব্বিকার, এতটা উদাসীন—এ যেন সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের পূর্ব্ব অবস্থা। বাড়ীর কারুর সঙ্গে কথা বলা সে এক রকম ছেড়েই দিয়েছে।

সেদিন সকালে গীতার ওখানে ওদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।

সৌমেন তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চিন্তামগ্ন। সুসজ্জিত বিপুল ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, তুইকি একান্তই যাবি না, সৌমেন?

মুখ না ফিরিয়েই সৌমেন বললে, বললুম তো—শরীরটা আজ আমার ভাল নেই।

—গীতা কিন্তু রাগ ক'রতে পারে?

নিতান্ত উদাসীনের মত সৌমেন নিরস কণ্ঠে ব'ললে, করে—ক'রবে।

—তবে আমি একাই যাই, তোর শরীর খারাপ—অঞ্জুর গিয়ে কাজ নেই।

—না-না-না সেটা ভালো দেখায় না, ওকে সঙ্গে নাও!

মনমরা হ'য়ে বিপুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌমেন যেমন শুয়ে ছিল তেমনি শুয়েই রইলো। তন্দ্রাচ্ছন্ন সৌমেনের চোখের সামনে ভেসে এলো নৃত্যপরায়ণা গীতা, বায়স্কোপের পর্দ্দায় প্রতিফলিত চঞ্চল গতিশীল ছবির মত আধো-জাগ্রত আধো-নিদ্রিত সৌমেনের মানস চক্ষুর সামনে দিয়ে ভেসে যায় অবলীলাক্রমে ......তারাভরা কালো আকাশ......প্রতিটি তারায় ফুটে ওঠে গীতার মুখচ্ছবি। আকাশের বুকে জাগে পূর্ণচন্দ্র......পুরন্ত চাঁদের বুকে জাগে সে-ই মুখখানি।

ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ করে আটটা বাজলো।

ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো সে। দৃষ্টি তার উদাস, বিহ্বল, উদভ্রান্ত। চোখ বুজিয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ, মনে মনে সে চাইলে নিজের সঙ্গে নিজের মানসিক অবস্থার একটা বোঝাপড়া

করতে। গীতা! গীতা!! গীতা!!! শয়নে স্বপনে জাগরণে গীতা! গীতা কি তাকে পাগল ক'রে দেবে? দুর্বোধ্য মন কিছুতেই বোধ মানতে চায় না যে, গীতা তারই আবাল্য বন্ধুর বাকদত্তা পত্নী। ক'দিন ধ'রে সে মনের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ ক'রেছে কিন্তু পারেনি—কিছুতেই জয়লাভ ক'রতে পারেনি।

চায়ের পেয়ালা হাতে অঞ্জলী এসে মৃদুস্বরে ডাকলে, সৌমেনদা! সৌমেনদা!!

অঞ্জলীকে দেখে সৌমেনের অহেতুক ক্রোধবহ্নি প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠলো, ঘৃণায় যেন তার সারা গা রী রী করে উঠলো; সে পারলেনা নিজেকে সামলাতে, বিকৃত কণ্ঠে সৌমেন বললে, সময় নেই—অসময় নেই যখন তখন বিরক্ত ক'রতে এসো কেন?

সৌমেনের অন্তরাত্মা ধীক্কার দিয়ে ব'লে উঠলো, গীতা আর অঞ্জলী—স্বর্গ আর নরক!

—কি চুপ ক'রে আছো যে? তুমি তোমার দাদার সঙ্গে গেলে না কেন?

নম্রকণ্ঠে অঞ্জলী ব'ললে, আপনার অসুখ, তাই—

—ওঃ খুব যে দরদ দেখছি! যাও এখন এখান থেকে!

—আপনার চা যে জুড়িয়ে যাবে?

—Nonsense! ব'লে দিলে অঞ্জলীর হাত থেকে চায়ের পিয়ালা হাত ঝটকানি দিয়ে ফেলে। তারপর কোন দিকে না চেয়ে মাতালের মত টলতে টলতে নীচে নেমে গেল।

মহা অপরাধীর মত সজল চোখে দাঁড়িয়ে রইলো অঞ্জলী।

গত ক'দিনের আব্‌ছা অবহেলা আজকের তুলনায় কিছুই নয়। কঠোর উপেক্ষার তীব্র দহন—বিনা দোষে অর্থহীন সুকঠিন তিরস্কার—তাকে নিদারুণভাবে মুষড়ে দিল।

অতি বড় মূল্যবান বা আদরের হারানো জিনিষ খুঁজে পাবার প্রলোভনে মানুষ যেমন আকুল অন্তরে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, সৌমেনও তেমনি আকুল অন্তরে উন্মাদের মত সারাটা দিন সহরময় ঘুরে বেড়ালো। মনে পড়ে অথচ পড়ে না। প্রাণশক্তি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাওয়া ক্ষীণাদপি ক্ষীণ স্মৃতির উদ্ধার সাধনে একান্ত তৎপর।

অস্পষ্ট অন্ধকারে গীতার সঙ্গে হ'য়েছিল তার দৃষ্টি বিনিময়—সে এক কাল বৈশাখীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ গোধূলির বিদায় বেলায়। সে কি আজকের কথা! পাঁচ-সাত বছর তো নিশ্চয়ই কেটে গেছে। আর কতক্ষণেরই বা পরিচয়, বড় জোর ঘণ্টাখানেক্।

সেদিন অপরাহ্নের কিছু আগে সৌমেন একা গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিল সোজা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে। সৌমেনের মনে পড়ে,—সেদিনটা ছিল আজকেরই মত মেঘলা। খেয়ালের বশে কতদূর গিয়ে পড়েছিল—আজ আর তা সঠিক মনে নেই, তবে অনেক দূর– একবারে ফুল্-স্পীডে। সন্ধ্যার কিছু আগে জল এলো—প্রবল জল, জলের সঙ্গে সুরু হলো ঝড়ের দাপাদাপি। উৎকট উল্লাসে প্রাণটা নেচে উঠলো সৌমেনের। গাড়ীর স্পীড সে কমালে না মোটেই, হেড লাইট জেলে দিয়ে ষ্টেয়ারীঙ্ ধ'রে উদ্দাম ঝড়ের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চললো সৌমেন।

বাঁকের মুখে কোলকাতাভিমুখে আর একখানি চলন্ত মোটার। নিমেষের মধ্যে সৌমেন গাড়ীর গতি সংযত ক'রে প্রবল সংঘর্ষের হাত থেকে দু'খানি গাড়ীকেই বাঁচিয়ে দিলে। সুদক্ষ ড্রাইভার হিসাবে বন্ধু-বান্ধব মহলে সৌমেনের নাম ছিল। অপর মোটারটি কিন্তু পাশ কাটাতে গিয়ে ঠিক সামলাতে না পেরে উলটে পড়তে পড়তে র'য়ে গেল পথ পার্শ্বস্থিত একটা গাছে সশব্দে ধাক্কা লেগে। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা করুণ অস্ফুট আর্ত্তনাদ।

কাছে গিয়ে সৌমেন যা দেখলে তাতে নাটকীয় বিষয় বস্তুর উপাদান এতই অল্প যে, তা দিয়ে আধুনিক নাটকের মাত্র একটি দৃশ্যেরও খোরাক নেই। অক্ষত শরীরে একটি আধুনিকা স্টেয়ারিঙের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে থর থর ক'রে কাঁপছে, গাড়ীতে আর কেউ নেই—তরুণীটি একা। এরকম ভয়াবহ অবস্থায় তরুণীটির মূর্চ্ছা যাওয়া বা ঐরকমের একটা কিছু হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু সে রকমের কিছুই হয়নি।

সৌমেনের আশ্বাস বাণীই বিশল্যকরণীর কাজ করে, তার শারীরিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; তরুণী নিজেই গাড়ী থেকে নেমে আসে।

সামান্য দু'একটা কথার পর তরুণী নিজেই গাড়ীর ইন্‌জিন পরীক্ষা ক'রে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। নাঃ গাড়ীটা নিজের সামর্থ্যে বর্ত্তমানে চলতে একেবারে অক্ষম। বিরাট ধাক্কায় ধাক্কায় তার চলচ্ছক্তি লুপ্ত হ'য়েছে। আধুনিকা শুধু মোটার চালিয়েই হাওয়া খেয়ে বেড়ান না, মোটারের প্রাণশক্তি অর্থাৎ কলকব্জার সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর জ্ঞানের অধিকারিণী।

এখন উপায়?

সৌমেনের গাড়ীর পিছনে ওঁর গাড়ীখানাকে বেঁধে নেওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় যুক্তিসংগত উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না, তরুণীকে সসম্মানে ওঁর বাড়ীতে পৌঁছে দেবার মত সৎসাহস সৌমেনের আছে কিন্তু গাড়ীটার অবস্থা? ওটাকে তো আর ঐ নির্ব্বান্ধব তেপান্তরের ধারে রক্ষকহীন অবস্থায় ফেলে আসা যায় না, আর উনিই বা এমন যুক্তিহীন কথা মনে প্রাণে সমর্থন করেন কেন? কিন্তু মুস্কিল বাধলো বাঁধার উপকরণ নিয়ে। দড়ি বা ঐ জাতীয় একটা কিছু তো চাই? সৌমেনের পরণে পাজামা, তরুণীর পরণে দামী মিহি শাড়ী; উত্তরীয় থাকলেও নয় সঙ্কটকালে দড়ির পরিবর্ত্তে কাজে লাগান যেতো।

দড়ির অভাব মিটতে খুব বেশী দেরী হলো না। খান কয়েক মাল-

বোঝাই মোষের গাড়ীর সঙ্গে নাটকীয়ভাবে হঠাৎ সাক্ষাত, তারাই ক'রলে মুস্কিল আসান।

তরুণীর গাড়ীখানা নিজের গাড়ীর পিছনে বাঁধলো সৌমেন। তরুণী তাঁর নিজের গাড়ীতেই র'ইলেন স্টেয়ারিঙ্ ধ'রে। সঠিক ঠিকানায় পৌছে দেবার জন্য সৌমেন সামান্য দু'একটা কথাবার্ত্তার পর গাড়ীতে স্টার্ট দিলে।

বলা বাহুল্য—এই সামান্য কাজটুকু সারতে তাদের উভয়ের বস্ত্রই বৃষ্টির প্রকোপে অত্যন্ত সিক্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু নিরুপায়। তেপান্তরের মাঠের ধারে কোথায় মিলবে শুষ্ক বস্ত্র!

বাড়ী পৌছাতে একটু রাতই হয়।

তরুণীর একান্ত অনুরোধেও সৌমেন সেদিন তাঁর বাড়ীতে নেমে চা পানের নিমন্ত্রণ রাখতে স্বীকৃত হলো না। অন্যদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিক্ত বস্ত্রেই সে মোটারে স্টার্ট দিলে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরুণী তাকে বিদায় দিলে, বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণই হলো; তথাপি আন্তরিক অজস্র ধন্যবাদ দিতে ধনীর দুলালি কার্পণ্য ক'রলেন না।

আকস্মিক পরোপকারে স্ফীত সৌমেন পুলকিত অন্তরে বাড়ী ফিরে গেল।

সেই ঝড়ের রাতের সিক্তবসনা তরুণীই—গীতা।

হঠাৎ কার্জ্জন পার্কের আবহাওয়া তার কাছে তিক্ত হ'য়ে উঠলো। গত দিনের কথা ভাবতে ভাবতে সৌমেনের মনটা গেল বিষিয়ে। কি অকৃতজ্ঞ এই আধুনিকার দল! না হয় দীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ কাকেও দেখেনি, তাব'লে কি এমনি নিদারুণ ভাবেই ভুলে যেতে হয়! তার অপরাধ কি—সে তো দিন কয়েক পরে গিয়েছিল দেখা করতে? হঠাৎ তাঁদের বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হবে জানা থাকলে সৌমেন নিশ্চয়ই যেতো দুর্ঘটনার পরের দিন। ভদ্রতার খাতিরে যাবার আগে

গীতা নিজেই তো আসতে পারতো সৌমেনের সঙ্গে দেখা করতে! তা যদি আসতো—তাহ'লে—তাহ'লে—

কেমন একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর পিছন থেকে যেন কানে এলো।

সৌমেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—অদূরে ঘাসের বিছানার ওপর মুখোমুখি ব'সে গীতা আর বিপুল। গ্যাসের এক ফালি আলো এসে পড়েছে গীতার এক পাশের গালে, বিপুলের মুখখানি গ্যাসালোকে ঠিক স্পষ্ট করে দেখা না গেলেও কণ্ঠস্বরে সৌমেন তাকে আগেই চিনেছিল।

তাকে ওরা চিনতে না পারে এমনি সন্তর্পণে ও সাবধানে সৌমেন পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে একবার চোখ তুলে চাইলে। অজান্তে বেরিয়ে এলো তার বুকখানা কাঁপিয়ে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

চার

ঘূর্ণায়মান গোধূলির কালো ছায়া ছড়িয়ে প'ড়েছে লেকের কালো জলে। ছেলে মেয়ে অনেকেই বিপুল উল্লাসে নৌ-বিহারে পাড়ি জমিয়ে পাল্লা দিয়ে উদ্দাম গতিতে লেকের কালো জল তোলপাড় ক'রে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে চলেছে। এদের মাঝে একখানি নৌকায় গীতা আর বিপুলকেও সেদিন দেখা গেল। অন্য দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুক্ষণ বাচ্ খেলার পর ইচ্ছা ক'রেই এরা অন্য দলকে এড়িয়ে গেল। ঢিমে তালে দাঁড় ফেলে বিপুল নির্জ্জনতার খোঁজে এগিয়ে ওদের দৃষ্টির না হ'লেও নাগালের বাইরে চলে গেল।

হাস্যমুখরা কৌতুকপ্রিয়া গীতা দাঁড় টানতে টানতে সত্যই এবার পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। তার এলো খোঁপা খুলে চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়ে সারা পিঠে, সামনের কুঞ্চিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশদাম উড়ে পড়ে চোখে

মুখে। মুক্তাবিন্দুর মত শ্বেতবিন্দু কপাল দিয়ে নেমে আসে গণ্ডের ওপর একটির পর একটি। ক্লান্ত চঞ্চলা তরুণীকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগে বিপুলের। প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে সুন্দরী তন্বীর নিটোল উন্নত বক্ষ ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হ'য়ে তাকে ক'রে তোলে মুনিজন-মনোহারিণী।

—তুমি একটু জিরিয়ে নাও, গীতা!

গীতা সামনের দিকে চেয়ে চোখের কসরতে তাদের গন্তব্যস্থানের দূরত্ব নির্দ্দেশ ক'রে বললে, ঐ ওখানে—সামনের ঐ ঝোপের ধারে?

—তুমি দাঁড় তুলে নাও, আমি একাই নিয়ে যেতে পারবো। বললে বিপুল।

দাঁড় ফেলতে ফেলতেই গীতা বললে, No need!

—তুমি হাঁপাচ্ছো যে?

—ওটা আমাদের স্বধর্ম্ম!

হো হো ক'রে হেসে উঠলো বিপুল।

—আর আপনাদের স্বধর্ম্ম কি জানেন তো?

বিপুল স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরবে চেয়ে থাকে গীতার মুখের দিকে।

—আপনাদের স্বধর্ম্ম হ'চ্ছে মেয়েদের সৎ ও স্বাধীন ইচ্ছার ওপর অর্থহীন কর্ত্তৃত্ব ফলান! বলতে বলতে গীতা হঠাৎ দাঁড় ছেড়ে খোঁপা নিয়ে পড়লো।

—আহা-হা নৌকার মুখ ঘুরে গেল যে? বলতে বলতে বিপুল কোন রকমে নৌকার মুখ রক্ষা করে।

—হঠাৎ তুমি ছেড়ে দিতেই—

বিপুলের কথার ওপর কথা দিয়ে গীতা বললে, তবে আপনি

আছেন কি করতে? মুখ রক্ষা করাই তো আপনার কাজ, তা সে নৌকাই হোক আর—

—আর থাক্, বুঝেছি। কপালের ঘামটামগুলো মুছবে—না আমিই মুছিয়ে দেবো?

—আপনারা ভয়ানক লোভী!

—অর্থাৎ?

কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো গীতা। বাদানুবাদ ক'রতে গিয়ে কখন যে দাঁড় থেমে গেছে তা মোটেই লক্ষ্য করেনি বিপুল। সে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছে গীতার কৌতুকমাখা মুখের দিকে।

—ওমা, ও কি! দাঁড় টানা থামিয়েছেন কেন? ঝোপের কাছ থেকে আমরা যে এখনো অনেক দূরে। আমার দেখাদেখি আপনিও থেমে গেছেন? টানুন—টানুন—

—ভুল হ'লো। তোমার দেখাদেখি নয়—তোমায় দেখে বা দেখতে দেখতে। ব'লে বিপুল নিজের কাজে মনোনিবেশ করে।

খোঁপাটা দু'হাত দিয়ে টিপে অর্থাৎ শীগ্‌গীর খুলে পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে গীতা কৃত্রিম ঝঙ্কার দিয়ে বললে, নাঃ যেদিকটা না দেখবো সেদিকটাই—দেখুন দেখি—এখনো আমরা কত দূরে?

—দোহাই তোমার, আর দাঁড়ে হাত দিও না! চোখের পলকে এবার তোমায় তোমার গন্তব্যস্থানে পৌছে দেবো!

দুষ্টুমির হাসি হেসে গীতা বললে, পলক তো একবার ছেড়ে তিনবার পড়লো, কৈ—এখনো তো—

কটাক্ষ ক'রে বিপুল বললে, Miss! জীবনটা আমাদের জিওমেট্রিও নয়—আর জিমন্যাস্টিকও নয় যে, চুলচেরা কোন সময়ের মাপকাটি দিয়ে

মাপ্‌তে হবে! দর্শন তত্ত্বই বল, আর কাব্য দিয়েই বিচার কর; জীবনটা আমাদের স্রেফ্ একটা স্বপ্ন—তা সু-ই হোক আর কু-ই হোক!

গীতার কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো সম্মোহন সুরে,—

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোমটা পরা ঐ ছায়া—
ভুলালোরে ভুলালো মোর মন!"

রহস্য করে বিপুল বললে, নাঃ আবহাওয়া দেখছি বেজায় গুরু-গম্ভীর হ'য়ে উঠলো!

তবু গীতার গান থামে না।

বিপুল বাধ্য হ'য়ে সুর ধরে,—

"মাগো আমার মন্ বসে না
কাট্‌না নিয়ে থাকতে ঘরে,
কালকে যারে দেখেছিলাম
তারেই নয়ন খুঁজে মরে!"

উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে গীতা বললে, From Rabindranath to Satyen Dutt! গান ছেড়ে বিপুল আবৃত্তি সুরু করে,—

"তাজমহলের পাষাণ দেখেছো
দেখেছো কি তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী
বাহিরেতে সাজাহান!"

হাই তুলতে তুলতে দু'হাত ওপরে তুলে আলস্য ভেঙে গীতা ঈষৎ অনুনাসিক সুরে বললে, ইচ্ছে হ'চ্ছে—

—কি ইচ্ছে হ'চ্ছে darling? বল—I am always at your service!

নৌকা তখন প্রায় তাদের গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি।

—লজ্জা ক'চ্ছে!

—লজ্জা! লজ্জাই তো তোমার ভূষণ!

নারীসুলভ মুখখানা ঈষৎ ঘুরিয়ে নিয়ে কথার সুরে দমক দিয়ে বললে গীতা, যাও—ঠাট্টা হচ্ছে!

দাঁড় টানা বন্ধ রেখে বিপুল বললে, upon your honour, I say. মোটেই ঠাট্টা নয়।

—ইচ্ছে হ'চ্ছে তোমার কোলে মাথা রেখে—

গীতাকে কথা শেষ ক'রতে না দিয়ে দাঁড় ছেড়ে একরকম লাফিয়ে উঠলো বিপুল! আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বললে, always!

—কিন্তু আমরা যে পেছিয়ে যাবো?

রহস্যভরা কণ্ঠে বিপুল বললে, নৌকা পেছোতে পারে—আমরা নয়!

* * * * *

—গীতা দেবী—গীতা!

জড়িত কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে সৌমেন টলটলায়মান অবস্থায় ড্রইং রুমে প্রবেশ ক'রে ধপাস করে সোফার ওপর বসে পড়লো—ঠিক বসে পড়লো নয়, ঢলে পড়লো। টেবিল-ল্যাম্পের ঈষৎ উজ্জ্বল আলোয় গীতা ব'সে ব'সে তখন কি একখানা বই পড়ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে এগিয়ে এলো গীতা।

—একি, আপনি অমন ক'চ্ছেন কেন, সৌমেনবাবু? উঁ—কি বিশ্রী-গন্ধ!

—মদ ছাড়া এমন বিশ্রী গন্ধ আর কিসের হ'তে পারে বলুন?

বিরক্তিভরা কণ্ঠে গীতা ব'ললে, আপনি মদ খান?

—খেতাম না—আজ খেয়েছি।

কি যে ব'লবে আর কি যে ক'রবে—কিছুই সে ঠিক ক'রতে পারে না। ঘৃণায় তার অন্তরাত্মা রী রী ক'রে ওঠে। ইচ্ছে হয়, বেয়ারাটাকে ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে সৌমেনকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেয়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি কেলেঙ্কারী!

মতলব এর মোটেই ভালো নয়। প্রথম দিনে পরিচয়ের সূত্রপাত থেকেই এর কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে যাতায়াত সুরু হ'য়েছে। অথচ লোকটা এত polished যে ধরাছোঁয়ার ধার দিয়েও যায় না। পিসীমা মোটেই এর ওপর সন্তুষ্ট নন। সে-ই প্রথম দিন ছাড়া বিপুলের সঙ্গে কোনদিনও সৌমেন আসে না, সব সময়েই এসেছে একা। শুধু তাই নয়, বিপুলকে এখানে উপস্থিত দেখলে অথবা হঠাৎ বিপুলের আগমনে সে এতই অস্বস্তি বোধ করে যে, আর একলহমাও অপেক্ষা না ক'রে কোন-না-কোন কাজের অজুহাত দেখিয়ে স্থান ত্যাগ করে। বিপুলকে সৌমেন সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গীতা নিজেই লজ্জিত হয়, শুধু লজ্জা নয়—কেমন একটা ভয়ও হয়।

সৌমেনের যখন-তখন আগমন গীতার সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রেছিল, তার ওপর আজকের এই অকল্পিত অবস্থায় সৌমেনের অতর্কিত আগমনে সে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে গেল। কোন ভদ্রসন্তান যে, মত্ত অবস্থায় কোন ভদ্র পরিবারের অনূঢ়া তরুণীর সঙ্গে ছলভরা বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে রাতের আঁধারে বিনা কারণে সাক্ষাৎ ক'রতে আসতে পারে—একথা ভাবতেও তার শরীর শিউরে ওঠে।

গীতা নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকে সৌমেনের দিকে।

যথাসম্ভব সংযতভাবে ও ভাষায় সৌমেন গীতার দিকে মুদে-আসা চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বললে, কথা বলছেন না যে—রাগ ক'রলেন?

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে গীতা বললে, আপনি বাড়ী যান।

গীতার দিকে চেয়ে কেমন যেন পাগলের হাসি হাসলো সৌমেন, সে হাসির মধ্যে তার অন্তরনিহিত বেদনা যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো। মাথাটা সোফার গায়ে এলিয়ে দিয়ে উদাস চোখে জুল জুল ক'রে চেয়ে রইলো জানালার বাইরে গভীর অন্ধকারের দিকে। মদ খাবার আগে যে সব কথা তার মনে জেগেছিল তার এক বর্ণও সে বলতে পারলে না গীতার কাছে। ক্রমেই তার শরীর অসুস্থ হ'য়ে তার এখ্‌তারের বাইরে এসে পড়ে।

—আপনি ক্রমশঃ অসুস্থ হ'য়ে পড়ছেন?

—কতকটা, তবে শরীরের চেয়ে মনের অসুস্থতাই বেশী, গীতা দেবী!

—এমন অসুস্থ শরীরে এখানে আসা আজ আপনার মোটেই উচিত হয়নি, সৌমেনবাবু।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সৌমেন বললে, সে আপনি বুঝবেন না, গীতা দেবী! আপনার এখানে না এসে আমি কিছুতেই থাকতে পারি না। তাই যখন-তখন এসে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করি, কিন্তু কি ক'রবো—আমি নিরুপায়। আমায় ক্ষমা ক'রবেন। উঃ এক গ্লাস জল- না থাক্। আমি যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সৌমেন টলে সোফার ওপর প'ড়ে গেল। মিনিট দুই একেবারে চুপচাপ। সৌমেন নড়ে চড়ে না পর্য্যন্ত—নীরব, নিথর, নিস্পন্দ।

মহা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো গীতা। এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে জীবনে কোন দিন পড়েনি। আতঙ্কে মুখখানি তার ফ্যাকাসে এতটুকু হ'য়ে গেল। সারা দেহখানায় বয়ে গেল আতঙ্কের শিহরণ। পা দুটো বশে রাখা তার যেন সাধ্যের বাইরে। কম্পিত পায়ের তলা থেকে পৃথিবী যেন স'রে যাচ্ছে। ইচ্ছা হয়—গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে কাকেও ডাকে, কিন্তু .....। তাইতো লোকটা কি মারা গেল! মদ খেলে কি

লোক মরে ?

সোফার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে গীতা কম্পিত কণ্ঠে ডাকে, সৌমেনবাবু! সৌমেনবাবু!!

কোন উত্তর না পেয়ে যেন আরো দিশেহারা হ'য়ে গেল। আর্ত্ত-কণ্ঠে গীতা ডাকলে, বেয়ারা! বেয়ারা।

ত্রস্তে বেয়ারা পর্দা সরিয়ে ঘরে এলো।

বেয়ারার দিকে না চেয়েই গীতা বললে, না থাক্। আমি—আমিই ফোন ক'রে দিচ্ছি!

তাড়াতাড়ি receiverটা তুলে নিয়ে গীতা ডাকলে, Hallo. বড় বাজার ডবল ফোর থ্রি ও, please! what—engaged ?

আঃ—অস্ফুট আর্ত্তনাদে মুখখানা বিকৃত ক'রে সশব্দে গীতা receiverটা রেখে দিলে।

সামনে পড়েছিল প্যাড, খস্‌খস্ ক'রে লিখে চললো কম্পিত হস্তে। লিখতে লিখতে calling bellটা টিপে দিলে। বেয়ারা পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরে এলো, ঘাড় না ফিরিয়েই চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরতে পুরতে গীতা বললে, বোস্ সাবকা কুঠীমে জলদি ইএ চিঠি ভেজো! বহুত—, গীতার মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই টেলিফোন বেজে উঠলো।

—Hallo. কে—ও বিপুল বাবু! My good luck. ও সব কথা থাক্, ভারী বিপদ—শুনুন ?

* * * *

টেলিফোনে খবর পেয়ে বিপুল তাড়াতাড়ি ডাক্তার সেনকে নিয়ে গীতার ওখানে এসে পড়লো। বেয়ারার নির্দ্দেশে গীতা তখন অচৈতন্য সৌমেনের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। সৌমেনের অসুস্থতার সংবাদে অঞ্জলীও দাদার সঙ্গে ছুটে এসেছে।

যথারীতি ডাক্তার সেন সৌমেনকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, ভয়ের

কোন কারণ নেই। ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস না থাকায় হঠাৎ .....মত্ততাই একটু বেশী কাহিল ক'রেছে। মানসিক উত্তেজনাই অসুস্থতার অন্যতম কারণ। ইত্যাদি—

সেই রাত্রেই অসুস্থ সৌমেনকে স্থানান্তরিত করবার ইচ্ছা গীতার ছিল না, কিন্তু অঞ্জলী রাজি হ'লো না, সে একরকম জোর ক'রেই সৌমেনকে বাড়ী নিয়ে গেল।

কেমন ক'রে কথাটা পিসিমার কানে গেল। ঢাকা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও গীতা পেরে উঠলো না। মুখে তিনি বিশেষ কিছু ব'ললেন না বটে তবে আকারে ইঙ্গিতে তাঁর মনোভাব স্পষ্টই বোঝা গেল—মাতাল সৌমেনের এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া ভবিষ্যতে তিনি মোটেই প্রীতির চোখে দেখবেন না।

যতটা সহজে সেরে উঠবে ভাবা গেছলো ততটা সহজে কিন্তু সৌমেন সারলো না। ঔষধ এবং শুশ্রূষা কোনটারই কার্পণ্য নেই। জলের মত অর্থ ব্যয় ক'রতে কুণ্ঠিত নয় বিপুল। রোগীর দিকে চেয়ে যতটা না হোক, অঞ্জলীর দিকে চেয়ে সে আর কিছুতেই চোখের জল রাখতে পারে না। বাপ-মা-মরা ঐ একটি মাত্র বোন—বড় আদরের সংসারের একমাত্র অবলম্বন! সৌমেনের জীবন-মরণের ওপর নির্ভর ক'চ্ছে ওর বাঁচা এবং মরা। অঞ্জলীর মুখের দিকে আর যেন চাওয়া যায় না। মুখে তার না আছে হাসি আর না আছে কথা, যেন একটি কলের পুতুল। এমন আত্ম সমর্পণ ক'রে মানুষ যে মানুষের সেবা ক'রতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সৌমেনের চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ এখন আর সম্পূর্ণরূপে বিপুলের অবিদিত নেই, মনক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু করবার মত কিছু

নেই। নিয়তির চক্রান্তে যুগে যুগে বিনা দোষে বহু জীবন ব্যর্থ হ'য়েছে আর আজও হ'চ্ছে। বিপর্য্যয়ের ঘূর্ণিপাকে অঞ্জলীর জীবনও যদি ব্যর্থ হ'য়ে যায় তবে অসহনীয় তীব্র ব্যথায় তার একান্ত অন্তরঙ্গদের মুহ্যমান হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অভিযোগ করা স্বাভাবিক নয়।

গীতা রোজই এ বাড়ীতে আসে, সারা দিন রোগীর সেবায় অতিবাহিত ক'রে, সন্ধ্যার পর বাড়ী যায়। রুগ্ন এবং আর্ত্ত সবারই সহানুভূতির পাত্র, গীতা আর্ত্তের সেবা করে সহানুভূতির পাত্র হিসাবে নয়— অঞ্জলীর প্রেমাস্পদ এবং একান্ত প্রিয় ব'লেই। যে-কোন কারণেই হোক—সৌমেনের বিরুদ্ধে তার মনের কোনে কেমন একটা অশ্রদ্ধা জেগেছে, যেটাকে মন থেকে মুছে ফেলে সে কিছুতেই সহজ হ'তে পারে না। সৌমেন অবশ্য তার মনের গূঢ় উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় গীতার কাছে ব্যক্ত করে নি, কিন্তু মুখের কথাই কি সব? মনের ভাব কি ভাষা ছাড়া আর কোন ভাবে প্রকাশ করা যায় না! চোখের কি কোন ভাষা নেই? হাব-ভাব অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালনে মানব মনের অন্তর নিগূঢ় ভাব অভিব্যক্তির আকার ধারণ করে না? ভাষায় কোন কিছু প্রকাশ করে নি বটে সৌমেন, কিন্তু ভাবে প্রকাশ ক'রেছে তার বক্তব্য। মেয়েদের কাছে এর চেয়ে আর বেশী কিছু ভাষায় ব'লে নিজেকে জাহির ক'রতে হয় না। তাতেই বোঝা গেছে—কত বড় নিষ্ঠুর, কত বড় হৃদয়হীন সৌমেন।

তবু গীতা চায়—মনেপ্রাণে কামনা করে সৌমেনের সুস্থতা, তার নিরাময়তা।

সৌমেনের যখন জ্বর না থাকে তখন সে নির্ব্বিকার। কোন কথা দিয়েই সে নিজেকে ব্যক্ত করে না। এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় অন্য মানুষের চাঞ্চল্য বাড়ে বই কমে না। ডাক্তারের মতে—রোগীর মানসিক বিকার দূর না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরের সুস্থতা ফিরে আসবে না।

ঔষধের কার্য্যকরী শক্তি এমত অবস্থায় খুবই কম। শুশ্রূষাই এবং চিত্তের প্রসন্নতা সাধনই এ রোগের অন্যতম ঔষধ!

বিকারের ঘোরে রোগীর আর এক মূর্ত্তি! নিতান্ত নির্লজ্জের মত গীতাকে কেন্দ্র ক'রে এমন সব কথাই সে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে যা শুনে অঞ্জলীর চোখে আসে জল, লজ্জায় সে আর মাথা তুলতে পারে না; হাজার হ'লেও মানুষ তো—ক্ষোভে ও দুঃখে বিপুলের মাথার রক্ত গরম হ'য়ে উঠে, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায়ের মত নিস্ফল আক্রোশ কঠোর-ভাবে দমন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকে না। নিজের স্বার্থের চেয়ে অঞ্জলীর দারুণতম ভবিষ্যৎটাই তার চোখের সামনে ভয়াবহ হ'য়ে ফুটে ওঠে। সংসারের একমাত্র অবলম্বন—মার পেটের বোন অভাগিনী অঞ্জলী—জীবন-প্রভাতে তার এই দুর্দৈব ভাগ্য-বিপর্য্যয়,—বিধাতার নির্মম নিলজ্জ পরিহাসে বিপুলের বুক ঠেলে কান্না আসে। কিন্তু সে পুরুষ—অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী, তার ক্রন্দনের বেগ রুদ্ধ করে কণ্ঠে; শুষ্ক কঠোর চোখের কোন শুষ্কই থেকে যায়, চোখের জলে বুকের ব্যথা লাঘব হয় না।

সৌমেনের প্রলাপে মনমরা অঞ্জলী আর বিপুলের দিকে চেয়ে গীতা সঙ্কুচিত হয়, সে নিজের মনে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে। গীতা—চঞ্চলা চপলা সদাহাস্যময়ী গীতা এ বাড়ীতে আসে আজকাল অতি সন্তর্পণে, যেন অতি-বড় দুর্ঘটনার প্রধান আসামী সে। এ বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবে যায় তার মুখের হাসি, বাধাহীন চঞ্চলতা, সহজ সরল প্রাণবন্ত বাকপটুতা; এদের শান্তির নীড়ে সে-ই যেন এনেছে তীব্র দাবানল।

এমনিভাবে আরো ক'দিন কাটে।

সেদিন সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে গীতা বিপুলকে একলা পেয়ে ব'ললে, আপনাদের এখানে আমার আর না আসাই ভালো, বিপুলবাবু!

বিপুল জিজ্ঞাসু নেত্রে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—সৌমেনবাবু তো প্রায় সেরে এলেন—তাই ব'লছি, রোজ না এসে মাঝে মাঝে এক-আধ দিন এলেই চলবে।

—কি যে তুমি ব'লতে চাও আর কেনই বা তুমি এখন থেকে রোজ এ বাড়ীতে আসতে চাও না, তা তুমি মুখ ফুটে না ব'ললেও আমি বুঝি।

ক্ষণেক নীরবতার পর একটা সিগারেট ধরালে বিপুল।

—তোমার তুলনায় আমার অশান্তি কিছু কম নয় বরং বেশী!

গীতা নীরবে চেয়ে রইলো ফুলদানির উপরিস্থিত পুষ্পসম্ভারের দিকে।

—পদ্মিনীকে উপলক্ষ্য ক'রে চিতোর ধ্বংস হ'য়েছিল সত্য, কিন্তু তার জন্য দায়ী পদ্মিনী নয়—আলাউদ্দিন!

গম্ভীর হ'য়েই গীতা কথা আরম্ভ ক'রেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে-ই পারলে না গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে। একটা চন্দ্রমল্লিকার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সরসকণ্ঠে স্মিতহাস্যে ব'ললে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমাদের স্থান হবে তো?

—অতি-সাধারণ না হ'য়ে আমরা যদি অসাধারণ হ'তাম তা'হলে নিশ্চয়ই পেতো!

অঞ্জলীকে ঢুকতে দেখে গীতা ছুটে গিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে নিজের পাশে বসিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। ওকে সাধ্য সাধনা ক'রেও গত ক'দিনের মধ্যে একটি দিনও চায়ের টেবিলে আনা যায়নি, আজ তাকে স্বেচ্ছায় আসতে দেখে ওরা উভয়েই আনন্দিত হলো।

বিপুল জিজ্ঞাসা ক'রলে, সৌমেন এখন কেমন আছে?

অঞ্জলী ব'ললে, ঘুমিয়েছেন।

গীতা সসব্যস্তে নিজের হাতে অঞ্জলীকে চা তৈরী ক'রে দিতে দিতে ব'ললে, আপনি দেখবেন বিপুলবাবু, আর দু-একদিনের মধ্যেই ডাক্তারবাবু সৌমেনদার পথ্যের ব্যবস্থা ক'রবেন, নয় অঞ্জু ?

মস্তক সঞ্চালনে গীতাকে সমর্থন ক'রে চায়ের পিয়ালা নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে ব'ললে অঞ্জলী, আমি নিজে বুঝি চা-টা তৈরী ক'রে নিতে পার্তাম না ?

—ছোট বোনকে এমনি ভাবেই মাঝে মাঝে খাতির ক'রতে হয়।

তুমি--, ব'লেই নিজেকে নিজে সামলে নিলে অঞ্জলী। দাদার সামনে গীতাকে 'বৌদি' ব'লতে তার কেমন লজ্জা হ'লো। দাদার অসাক্ষাতে বৌদি ব'লে গীতাকে সে সম্বোধন করে কিন্তু সামনাসামনি বলতে তার বাধলো। অত্যধিক ঘনিষ্ঠতার ফলে 'আপনি' এখন 'তুমি'তে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে নারীসুলভ লজ্জা কোন রকম বাধার সৃষ্টি করেনা। অঞ্জলী হয়তো ব'লতে যাচ্ছিল, 'তুমি বৌদি বড় দুষ্টু' বা ঐ ধরণের একটা কিছু। কিন্তু বড় জোর কথার মুখে লাগাম ক'রে সে নিজেকে সামলে নিলে। বেফাঁসভাবে কথাটা বেরিয়ে গেলে গীতা এবং বিপুল দু'জনেই লজ্জা পেতো আর অঞ্জলীরও লজ্জার অন্ত থাকতো না।

নীচেকার বাঁদিকের ঠোঁটটা দাঁতে চেপে ঈষৎ বঙ্কিমনয়নে জিজ্ঞেস ক'রলে, কি—'তুমি' ব'লে থামলে যে ?

গীতার চোখদুটি দুষ্টুমিমাখা হাসিতে ভরা। সেদিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে অঞ্জলী চোখ নত ক'রলে।

অঞ্জলীর হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে গীতা ব'ললে, কি, উত্তর দিচ্ছোনা যে, অঞ্জু !

—ব'লছিলুম, বয়সে এবং মানে 'ছোট' উপস্থিত থাকতে কি বড়কে কোন কাজ ক'রতে আছে ?

ঘুরিয়ে আসল কথা চাপ দিয়ে জবাব দেয় অঞ্জলী।

হঠাৎ বিপুল ঈষৎ জোর গলায় ব'লে উঠলো, বাগদী, খাদাল আর পোদ্ ব'লে নিম্নস্তরের কয়েক শ্রেণীর জাত আছে। তাদের মধ্যে দু একটা প্রথা বড় অদ্ভুত। বয়সে 'বড়রা' উপস্থিত থাকতে 'ছোটরা' কোন কাজ ক'রবেনা। ঠিক আমাদের সমাজের উল্টো। যেমন ধর, বাপ এবং ছেলে দু'জনেই উপস্থিত থাকতে—ওদের সমাজের প্রথা অনুসারে তামাক সাজার ভার পড়বে বাপের ওপর; বাবার সাজা তামাক ছেলে নলচে আড়াল দিয়ে খেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ ক'রবে না।

গীতা ব'ললে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে, সত্যি!

—একটুও বাড়িয়ে বলিনি। ব'লে বিপুল হাসতে লাগলো।

সে হাসিতে যোগ দিল গীতা আর অঞ্জলী দুজনেই।

কথায় কথায় এক প্রসঙ্গ থেকে তারা আর এক প্রসঙ্গে এসে পড়লো।

—পথ্য পাওয়ার পর সৌমেনদাকে কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া দরকার।

ঈষৎ উদাসীনভাবে গীতার মুখের দিকে চেয়ে বিপুল ব'ললে, দরকার তো বুঝলাম, কিন্তু কে-ই বা নিয়ে যায় আর সেখানে দেখা-শোনাই বা করে কে?

—নিয়ে যাবেন আপনি আর দেখাশোনা ক'রবে অঞ্জু! তা ছাড়া ঝি, চাকর আছে, সরকার, গোমস্তা আছে। একমাত্র ইচ্ছার অভাব ছাড়া আর কোন কিছুর অভাব তো আমার চোখে পড়ছে না?

স্মিতহাস্যে বিপুল বললে টাকা?

—লাগে টাকা—দেবে Imperial Bank অর্থাৎ অঞ্জু! ব'লে গীতা অঞ্জুর চোখে হানলে একটা কটাক্ষ।

পাইপ টানতে টানতে ক্ষণেক নীরবতার পর কতকটা আপন মনেই বিপুল বললে, সৌমেনের শরীরটা সারতে দিন কয়েকের জন্য বাইরে কোথাও যাওয়াই দরকার, কিন্তু……

অঞ্জুর দিকে দৃষ্টি পড়ায় নিজেকে সামলে নিলে বিপুল।

—যাঃ সৌমেনদার যে ওষুধ খাওয়ার সময় হলো! ব'লতে ব'লতে অঞ্জলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গীতা ব'ললে, কিন্তু—কি?

—এ তো ওর দেহের অসুখ নয়, গীতা? মানসিক অসুস্থতা কি স্থান পরিবর্ত্তনে সারে—না সারা সম্ভব! তবে তুমি সঙ্গে থাকলে—

চেয়ার থেকে একরকম লাফ দিয়ে উঠলো গীতা। কিন্তু কি যে ব'লবে আর কি যে ক'রবে তা তার মাথায় এলো না। দরজার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল আবার কি ভেবে ফিরে দাঁড়াল। এক লহমায় তার মুখ, চোখের সে কি অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন! রাগে, দুঃখে, আত্মগ্লানিতে ঠিক যেন তার কাঁদবার পূর্ব্ব-অবস্থা।

অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে কোন কিছু বলবার আগেই গীতা বিপুলের দিকে ফিরে ধরা গলায় ব'ললে, আপনি আমায় কি ভাবেন, বলুন তো?

থতিয়ে যায় বিপুল, আমি তো—আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি, গীতা? আমি শুধু—

কে কার কথা শোনে, ভাবপ্রবণা গীতা বিপুলের কথা চাপা দিয়ে বলে, মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলারও একটা সীমা থাকা উচিত। আমি জানি—আমিই সব কিছু অনর্থের মূল, I am the root of all evils. আপনাদের ভাই-বোন দু'জনের কাছেই আমি পরোক্ষ ভাবে দোষী—এ কথা আমি জানি, কিন্তু আমার দোষটা কোন্‌খানটায় ব'লতে পারেন, বিপুলবাবু?

গীতার চোখের কোণে জল দেখা দেয়।

এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বিপুল বিস্ময়-বিহ্বল নয়নে চেয়েছিল ওর মুখের দিকে।

বিপুল উঠে গিয়ে গীতার হাত ধ'রে এনে সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলে। কোঁচার খুঁট দিয়ে দিলে ওর মুখ চোখ মুছিয়ে। গীতা তখনও ফুলছে, সে যেন আরো কিছু ব'লতে চায়। তার বলা তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু মনের ভাবটা মানসিক চাঞ্চল্যে ভাষায় ঠিক মত রূপান্তরিত ক'রতে পাচ্ছে না। গীতার হাতখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে বিপুল স্নিগ্ধ সরস কণ্ঠে ব'ললে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি একেবারে ছেলেমানুষ! কোথাও কিছু নেই—আর একেবারে Tempest in a tea pot. নাঃ তুমি ভয়ানক sentimental! আমি ব'ললুম এক আর তুমি বুঝলে উল্‌টো।

ক্রুশ-বিদ্ধ যিশুখৃষ্টের ছবিখানার দিকে অহেতুক দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে গীতা উদাসকণ্ঠে ব'ললে, আমি যা বুঝি—ঠিকই বুঝি!

বিপুল ওর হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে ব'ললে, তুমি কিস্‌ছুই বোঝ না! সত্যি যদি বুঝতে তবে এমন একটা হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা ক'রতে না! শোন, গীতা! আমি তোমাকে আগেও ব'লেছি আর আজও ব'লছি, তুমি জোর ক'রে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করতে যেয়ো না। ওতে তুমি শুধু একা নয়—তোমার সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'একজন দারুণ অশান্তি ভোগ করে!

গীতার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিপুল ব'ললে, যতই লেখাপড়া শিখুক আর up-to-date হোক, মোট কথা মেয়েছেলে—মেয়েছেলে!

উত্তরে গীতা ব'ললে, আপনিই তো চায়ের কাপে তুফান তুললেন?

বিপুল কোন প্রতিবাদ না ক'রে ব'ললে, আপাততঃ আলোচনায়

'ইতি' ক'রে দু'কাপ চা তৈরী কর। চা খেয়ে চল দুজনে বেরিয়ে পড়ি, ফেরবার মুখে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেবো।

ছয়

পিসিমার মনে মনে হয়তো একটু আপত্তি ছিল কিন্তু বিপুলের সামনে সে কথা তিনি মুখফুটে ব'লতে পারলেন না। তা ছাড়া গীতার ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করাও তাঁর সাধ্যাতীত। সৌমেন—মাতাল সৌমেন ওদের সঙ্গে থাকবে, এটাই বোধ হয় তিনি মনে মনে ঠিক বরদাস্ত ক'রে উঠতে পাচ্ছিলেন না; ওদের চার হাত এক না হওয়া পর্য্যন্তই যা তাঁর একটু অস্বস্তি, তারপর যার জিনিষ সে বুঝবে তার ভালমন্দ। পিসীমার অবস্থাটা সত্যই একটু সঙ্কটজনক। বিয়ে না হ'লেও বিয়ের কথা এতদূর পাকাপাকি যে, এ অবস্থায় অভিভাবকের উচিত ওদের মতে মত দেওয়া; নইলে অনভিপ্রেত বিপরীত ফলের সম্ভাবনা আছে।

পিসীমা মত দিলেন।

মাসখানেক পশ্চিমের দু-এক স্থানে ঘুরে ওরা মেদিনীপুরে হাজির হ'লো। স্থানটা বায়ু পরিবর্ত্তনের ঠিক উপযুক্ত না হ'লেও বিপুল তার বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারলে না। গোপ নামক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পাহাড়ের ধারে একটা সাময়িক বাসা বন্ধুবরই ওদের জন্য ঠিক ক'রে দিলেন। বাঙলো ধরণের বাসা— আধুনিক রুচিসম্পন্ন ধনী পরিবারে মন্দ লাগলো না। স্থানটি সহরতলী হ'লে কি হবে—সহুরে কৃত্রিমতার পরশ ঠিক এর সারা অঙ্গে বুলিয়ে দেওয়া হয়নি।

বাঙ্‌লোটি যেন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। আশেপাশে চতুর্দ্দিকে দুর্ব্বাদল বিছানো উঁচু-নীচু বিস্তীর্ণ মাঠ। অদূরে শালবন, পূর্বে এবং পশ্চিমে। সকালে শালবনের মাথার ওপর দিয়ে যে উদীয়মান তরুণ

অরুণ উঁকি দেয়—গোধূলী বেলায় কর্মক্লান্ত সেই রক্তরাঙা রবি ডুবে যায় শালবনের ওপারে দৃষ্টির অন্তরালে।

আধা সাঁওতালী আধা বাঙালী মেয়েরা সকালে সন্ধ্যায় জল নিতে আসে ছোট বড় মাটির কেঁড়ে কাঁকালে নিয়ে সামনের ঐ ইঁদারা থেকে। তারা হাসে প্রাণখোলা হাসি, কথা ব'লতে ব'লতে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে, নিজের খোঁপা থেকে বনফুলের গুচ্ছ তুলে নিয়ে গুঁজে দেয় অপরের খোঁপায়। ঠিক অবোধ্য না হ'লেও অস্পষ্ট ভাষায় অভিনব সুরে তারা গান গায়, ছড়া কাটে। তাদের হাসি-কথা-গানে ইঁদারার চারপাস সরগরম হ'য়ে ওঠে।

গীতা আর অঞ্জলী বাঙ্‌লোর বারাণ্ডায় ব'সে ওদের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। বাঙালী মেমদের দেখিয়ে ওরা পরস্পর হাসাহাসি করে, কি বলে তা ওরাই জানে। ওদের দেখতে ভারি ভালো লাগে গীতা আর অঞ্জলীর। এক-একদিন ওদের সঙ্গে আসে বাঁক ঘাড়ে নিয়ে দু' একজন সাঁওতাল তরুণ। কি নিটোল পাথরে-কোঁদা চেহারা ওজাতের পুরুষ ও মেয়েদের, দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। ওরা যেন দুনিয়ার বুকে ভগবানের দেওয়া আশীর্ব্বাদ। সভ্য জগতের মানুষ ওদের দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করে, অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষগুলোকে অহমিকাভরে রাখে দূরে সরিয়ে। এ কিন্তু তাদের লোক-দেখানো ছল মাত্র, অন্তরাত্মা তাদের কাজ সমর্থন করে না। প্রতি মানুষের অন্তরাত্মা চায়—কামনা করে প্রতিটি মানুষের সঙ্গ, সাহচর্য্য! এই অপরূপ, অপূর্ব্ব মিলনাকাঙ্ক্ষায় নেই তুচ্ছ ভেদাভেদের সীমা রেখার নির্দ্দেশ।

সেদিন দুপুরে।

দখিনের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতা অঞ্জলী নিজের মনে চুল শুকনো ক'চ্ছে। অদূরে গীতা একখানা ক্যাম্ব চেয়ারে ব'সে ডুবে গেছে কোন্ একখানা উপন্যাসের খোলা পাতায়।

—শালপাত্তা লিবে গা ?

এক বোঝা কাঁচা শালপাতা মাথায় নিয়ে বারাণ্ডার ধারে জিজ্ঞাসু-নেত্রে দাঁড়িয়ে এক সাঁওতাল যুবতী। দু'জনকেই আপনহারা তন্ময় অবস্থায় দেখে যুবতীর মুখে ফোটে মন্দ মধুর হাসি।

—ক'খানা ক'রে পয়সায় ? অঞ্জলী জিজ্ঞাসা করে।

—লিবে তো ? যুবতীর কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

অঞ্জলী তাকে আশ্বাস দেয়।

যুবতী মাথার বোঝা সিঁড়ির ওপর নামিয়ে বসলো।

বাঁকের দু'ধারে কাঁচা শালপাতা নিয়ে অদূরে রাস্তার ওপর এসে থমকে দাঁড়াল এক যুবক সাঁওতাল।

—তু আগু হাট্‌কে যাগা, হামি তুর পিছু লেব। যাগা যাগা—ঝট্‌পট্‌ যাগা !

হাসতে হাসতে যুবকটি কি যেন ব'লে চলতে সুরু ক'রলে।

যুবতী ওর গমন পথের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ব'ললে; উ হামার শানা। উয়ার সাথে মোর বিয়া হ'বে।

রহস্যপ্রিয়া গীতা বললে, ও তোর বন্ধু ?

চোখ দুটো বড় ক'রে যুবতীটি ব'ললে, ব-ন্‌-ধু !

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঐ যে কি বলে, মিতে-মিতে !

—অ—মিতা! দেব্—তা কেনে, উ হামার সানা; সোয়ামী হোবে—হোয়নি এখনো ? হুলা ! তুদের বিয়া হয়নি ?

চোখ ঠেরে গালে হাত দিয়ে সাঁওতাল যুবতী গভীর বিস্ময়ে ওদের মুখের দিকে, সিঁথের দিকে ফিরে চায়। যুবতী ওদের তুলনায় বয়সে অনেক ছোট, তাই তার এই বিস্ময়। এত বড় মেয়েদের অবিবাহিত দেখে সত্যসত্যই সে আশ্চর্য্য হয়।

—আমাদেরও সানি আছে। বিয়া হোবে—বুঝলি ? গীতাই উত্তর দেয়।

—হামারা সোব ভাজাভুজি পাবে তো? ব'লেই যুবতীটি রসিকতার হাসি হাসে।

উভয় পক্ষের হাসির বেগ প্রশমিত হ'লে যুবতীটি নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হঠাৎ সজাগ হ'য়ে ওঠে, বলে, পাত্তা লিবি তো লে—হাটকে যাবোগা? শেষ চাকী ডুব্‌বে যাবেগা!

ঘরের ভিতর থেকে খবরের কাগজ হাতে বেরিয়ে এলো বিপুল।

বিপুলকে দেখিয়ে যুবতীটি অম্লান বদনে ব'ললে, ই তুদের হু'নো জনার সানা?

রক্তিমাভ মুখে ক্ষিপ্র পদে অঞ্জলী ওপাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। অঞ্জলীর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় ব'সে বিপুল ব'ললে, কি বলে ও?

—বলছি। কাঁচা শালপাতায় ভাত খেতে ভারি ভালো লাগে, কেমন একটা বেশ সোঁদা সোঁদা গন্ধ। নেবো—? গীতা জিজ্ঞাসু নেত্রে বিপুলের মুখের দিকে চায়।

—বেশ তো, ইচ্ছা হয়—নাও।

—আপনিও খাবেন তো?

খবরের কাগজের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্মিতহাস্যে শির সঞ্চালনে বিপুল সম্মতি জানায়। নগদ চার পয়সার পাতা বিক্রী ক'রে যুবতী গীতার মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন অর্থপূর্ণ হাসি হেসে পাতার বোঝা মাথায় নিয়ে পথে নেমে আসে।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রেও বিপুলের দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ এলো না। পিছন থেকে গিয়ে নিলে গীতা খবরের কাগজখানা বিপুলের কোলের ওপর থেকে সরিয়ে।

—পড়া শোনায় খুব চাড় দেখছি যে—একেবারে তন্ময়!

—আঃ দাওনা, খবরটা বড় interesting মানে মর্ম্মান্তিক।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল গীতা, নাঃ দেবো না!

গীতার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে বিপুল, ব'ললে, এরি মধ্যে জুলুম সুরু হলো ?

যান্ আপনার সঙ্গে আর একটাও কথা বলবো না !

—আরে শোন—শোন, যান্ ব'ললেই কি আর যাওয়া যায় ! প্রাথমিক আলাপ আলোচনা তোমার সঙ্গে তো প্রায় আমার শেষই হ'য়ে এসেছে, এবার যা কিছু—সব ঘরোয়া ; কেমন—নয় কি ?

—হাত ছাড়ুন, অঞ্জু এদিকে আসতে পারে ! ব'লে গীতা ওপাশের বারাণ্ডার দিকে একবার চেয়ে দেখলে ।

—অঞ্জুর দাদাকে তোমার ভয় হয় না—হয় কিনা অঞ্জুকে ! তাজ্জব ব্যাপার !

অর্থহীন চাপা গলায় গীতা বলে, আপনি কিছু বোঝেন না ?

—হুঁ যত বোঝেন আপনি ! ব'লে বিপুল একরকম জোর ক'রেই গীতাকে তার ইজিচেয়ারে হাতলের ওপর বসিয়ে দেয় ।

মাঝের হ'ল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সৌমেন । ব'ললে সহাস্যে, দ্যাখ হে—তোমার বোন দিলে আমার নতুন জামাটা ছিঁড়ে ?

বলার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবীর একটা কোন তুলে ধ'রলে ।

গীতা হেসে লুটিয়ে পড়লো সৌমেনের অদ্ভুত কথা বলার ধরণে ।

সৌমেন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে ব'ললে, শুধু হেসে ব্যাপারটাকে হালকা ক'রে তুললে চলবে না, আমি এর বিচার চাই !

কল কণ্ঠে গীতা ব'ললে, বেশ তো—বিচারের ভার আপনার ওপরই দেওয়া গেল ।

চাকর এসে সৌমেনের উদ্দেশ্যে ব'ললে, আপনার ওষুধ খাবার সময় হ'য়েছে ।

—আবার ওষুধ ! নাঃ জ্বালালে । অসুখ সারলো, চেহারা ফিরলো, এখনো রোজ রোজ ওষুধ ! নাঃ শেষ পর্য্যন্ত ওষুধ খাবার

জ্বালায় আমায় না পালিয়ে যেতে হয়। ব'লে সৌমেন বারাণ্ডায় পায়চারি ক'রতে স্থরু করে।

চাকর ব'ললে, দিদিমণি ওষুধ নিয়ে ওপাশের বারাণ্ডায়—

গীতার দিকে চেয়ে সৌমেন ব'ললে, শুধু জামা ছিঁড়েই নিষ্কৃতি নেই, তেতো ওষুধ গিলিয়ে তবে ছাড়বে!

সৌমেন ওপাশের বারাণ্ডায় চ'লে গেল।

বিপুল গীতার হাতের ওপর ঈষৎ চাপ দিয়ে ব'ললে, শেষ পর্য্যন্ত দেখছি তোমার কথাই ফললো। স্থান পরিবর্ত্তনে কেবল মাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না--মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। তবে—তবে এটাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত নয়, হয়তো এটা ওর সাময়িক পরিবর্ত্তন মাত্র। ওকি, তুমি নিজেই যে আবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেলে?

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই গীতা ব'ললে, নাঃ আর ভয় নেই। দাঁড়ান—এক মিনিট!

--কি, স্থশীলার জীবন্ত সমাধি পড়ছো তো? দ্যাখো-দেখি কি লোমহর্ষ ভয়াবহ ব্যাপার! জীবন্ত মেয়েটাকে মাটির ভিতর পুতে ফেললে তার খুড়শ্বশুর আর দেওররা মিলে! উঃ কষাইরাও ওদের চেয়ে উন্নত স্তরের জীব।

পড়া শেষ ক'রে গীতা ব'ললে, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

—অথচ বেচারীর কোনই অপরাধ নেই। সে শুধু ভালবেসে বিয়ে ক'রেছিল। ওর স্বামীর এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। অসন্তোষের ভাব তো আর রাতারাতি গ'ড়ে ওঠেনি? স্থশীলার স্বামীর উচিত ছিল বাড়ী থেকে স্থশীলাকে সরিয়ে অন্যত্র রাখা।

গীতা বললে, ভালবাসা অবশ্য জাতের দোহাই মানে না, তবে নিজের সমাজ ছেড়ে যাওয়ায় আকস্মিক বিপদ অনেক রকমের আসতে

পারে। বাড়ীর বিপরীত মনোভাব বুঝেও স্থশীলাকে একলা রেখে অন্যত্র কয়েকদিনের জন্য চ'লে যাওয়া ওর স্বামীর উচিত হয়নি! ওকে সঙ্গে নিলেই—

বাধা দিয়ে বিপুল ব'ললে, তুমি ভুল কচ্ছো, গীতা! স্থশীলার প্রাণহানির সম্ভাবনা সে বেচারী কল্পনাতেও আনতে পারেনি! তা ছাড়া আমাদের মহামান্য সদাশয় সরকার বাহাদুরের স্থবিচারটা দেখ্‌ছো একবার? একটা আঠার উনিশ বছরের অপরূপ স্থন্দরী মেয়েকে হাত পা বেঁধে নদীর চরে নিয়ে গিয়ে মাটি খুঁড়ে জীবন্ত অবস্থায় যারা পুতে ফেললে সজ্ঞানে, তাদের শাস্তির বহরটা কি সত্যই হাস্যকর নয়? আসামীদের মধ্যে দু'জন পেলে বেমালুম খালাস আর বাদ বাকি ক'জনের হলো দু'বছর থেকে তিন বছর কারাবাস! সভ্য জগতে স্বাধীন জাতের যে কোন এই বিচার প্রহসনের কথা শুনে কি সত্যিই আঁতকে উঠবে না, গীতা?

একান্ত উদাসীন ভাবে গীতা ব'ললে, এ দেশে সবই সম্ভব!

—স্থশীলার এই অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তার ওপর জাগে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। তার আত্মার শান্তি কামনা ছাড়া আর আমরা কি ক'রতে পারি? ব'লে বিপুল একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে!

—লোকে বলে 'ভালবাসা' অন্ধ! ভেবে দেখলে—কথাটা পরিপূর্ণ সত্য ব'লেই মনে হয়।

গীতার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই সৌমেন ও অঞ্জলীর আবির্ভাব। উভয়েই সান্ধ্য ভ্রমণের সাজে সজ্জিত।

—তোমরা এখনো ব'সে গল্প কচ্ছো? হ্যাঁ দাদা, বেড়াতে যাবার সময় হয় নি?

ব'লতে ব'লতে অঞ্জলী দাদার চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিপুল মুগ্ধ নয়নে ক্ষণেকের তরে চেয়ে রইলো ওদের হু'জনের মুখের দিকে। ওদের হুটিকে আজ একসঙ্গে একভাবে দেখে ভারী ভাল লাগলো তার। একটি মাত্র বোন—বড় আদরের বোন তার। ভারী মানিয়েছে হুটিকে. যেন নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে বদ্ধ হুটি প্রাণ এক হ'য়ে মিশে গেছে। এই তো সে চায়—এই তো তার বহু দিনের কামনা। বিপুলের বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় স্বস্তির নিঃশ্বাস। এত শীগ্‌গীর অমন প্রতিকূল আবহাওয়ার ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে যে তাবা হুটি প্রাণে এক হ'য়ে মিশে যাবে তা যেন ছিল তার বিশ্বাসের বাইরে। অত্যধিক আনন্দে সে যেন কেমন দিশেহারা হ'য়ে গেল অঞ্জলীর কথার উত্তর দিতে। কতক্ষণে তার এ তন্ময়তা কাটতো তা কে জানে হঠাৎ গীতার কণ্ঠস্বর তাকে সজাগ ক'রে দিলে।

—আপনারা এগোন, আমরা হু'মিনিটের মধ্যে ঠিক আপনাদের গিয়ে ধ'রে ফেলবো।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়—নিশ্চয়! ব'লতে ব'লতে বিপুল চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি হলঘরে গিয়ে ঢুকলো।

চোখের কোনের হু'ফোঁটা আনন্দাশ্রু ওদের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে ফেলার এ ছাড়া বিপুলের আর অন্য কি-ই বা উপায় ছিল!

* * * * *

ক্ষুদ্র পাহাড় না ব'লে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ঢিপি বলাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। পাহাড়টির নাম গোপ। সমতল বাংলার অধিবাসী পাহাড় দেখতে অভ্যস্ত না হওয়ায়, কোন কিছু উঁচু জায়গাকেই পাহাড় আখ্যা দিয়ে ভুল করে অথবা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। এটা ঠিক বাঙালীর স্বভাবধর্ম্ম নয়—অনভ্যস্ততার একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।

গোপের আছে একটা পৌরাণিক, সুন্দর, আগ্রহোদ্দীপক ইতিহাস। মহাভারত-উল্লিখিত বিরাট রাজার এটাই ছিল নাকি রাজধানী।

রাজার ছিল হাজার হাজার গরু। গোপের চারিধারে এখনও আছে বিরাট মাঠ। গোশালার চিহ্ন প্রায় লুপ্ত হ'তে ব'সেছে বা বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে, শুধু স্থানীয় প্রবীণ অধিবাসীদের নির্দ্দেশে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানকে এখনও গোশালা বলা হয়। সেই গোশালার মাটি কপালে ঠেকিয়ে মানুষ পুণ্য সঞ্চয় করে আজও। গোপের উপরিভাগে অসংখ্য বাড়ী—বাড়ী না ব'লে ঘর বলাই সমীচীন; কোনখানাই বাস-উপযোগী নয়। ঘরগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়, জরাজীর্ণ, কঙ্কালসার, ভগ্নপ্রায়। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে বুক কাঁপে, দস্তুর মত ভয় হয়। যে কোন মুহূর্ত্তে ছাত বা পার্শ্ববর্ত্তী দেওয়াল প'ড়ে প্রাণহানির সম্ভাবনা। কোন্-সে যুগের ছোট ছোট ইট্ দিয়ে ঘরগুলি তৈরী। চমৎকার ইট্, একখানাতেও লোনা ধ'রতে দেখা যায়নি—যেন লোহা দিয়ে তৈরী।

চারিদিকেই জঙ্গল, পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য গাছের ভিড়। তার মধ্যে আছে ফুলের গাছ, ফলের গাছ আরো কত কি জঙ্লা গাছ। দিনের আলোয় ছাড়া ঐ ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর বিচরণ করা শুধু কষ্টকর নয়—দুঃসাধ্য। পাকা আতা, কামরাঙা, কয়েদ বেল, পাকা-বেল, বাতাবি লেবু, বাদাম প্রভৃতি সুখাদ্য ও সুমিষ্ট ফলের সমাবেশ লোকের শুধু দৃষ্টি আকর্ষণই করে না—রসনারও তৃপ্তিসাধন করে।

ভয়াবহ কোন জানোয়ারই গোপে নেই—শুধু সাপ ছাড়া। অদ্ভুত আকারের ও রঙের সাপ গোপে ঘুরে বেড়ায় দিনের আলোয়। কচিৎ দু'একটা ভালুক নাকি আগে দেখা যেতো, এখন আর নেই।

দিনের আলো থাকতে থাকতে ওরা গোপ থেকে নেমে এলো। ওদের সকলের হাতেই ফুল—নানা রঙের বুনো ফুল।

সৌমেন বলে চলতে চলতে, মজা দেখেছো বিপুল, এতদিন এলুম তবু গোপটা আমার কাছে নূতনই র'য়ে গেল। প্রতিদিন বৈকালের আগেই ঐ লাল কাঁকরের ঢিবি আমায় চঞ্চল ক'রে তোলে, শেষ পর্য্যন্ত আমায় আসতেই হয়। লক্ষ্য করেছো—কত দিন তোমরা অন্য দিকে গেছো আমি কিন্তু একলাই এদিকে এসেছি!

সংক্ষেপে উত্তর দিলে বিপুল, সত্যি আমারও ভাল লাগে।

গীতার দিকে চেয়ে সৌমেন ব'ললে, কি—আমার কথা বুঝি আপনার মনঃপুত হ'লো না?

গীতা ব'ললে, আমি ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি—গোপ আপনাকে কবি না ক'রে ছাড়বে না।

সৌমেন ব'ললে, ব'লেছেন মিথ্যা নয়। মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে আমার ইচ্ছা যায়। তবে কি জানেন, ছন্দ ঠিক মেলে না। দু'লাইন অতি কষ্টে মিললো তো দশ লাইন রয়ে গেল গরমিল। আচ্ছা, ছন্দ বজায় না রেখে যা-ইচ্ছে তাই লিখলে কি কবিতা হয় না? চুপ ক'রে আছেন কেন—বলুন না? আপনি তো—

ঈষৎ চাপা গলায় গীতা অঞ্জলীকে শুনিয়ে সৌমেনের উদ্দেশে ব'ললে, অঞ্জুকে সামনে রেখে খাতা, পেন নিয়ে ব'সবেন; কবিতার ছন্দ আপনি মিলে যাবে। আর্টিষ্টের যেমন মডেল নইলে—

—ধোৎ, কি সব বাজে বকছো! কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে ব'লে অঞ্জু হন হন ক'রে এগিয়ে প্রায় দাদার পাশে পাশে চলতে লাগলো।

সৌমেন ব'ললে, আপনার কথায় আমার উৎসাহ আসছে। কে জানে—বেদবাক্যের মত আপনার কথা হয়তো সত্যিই ফ'লে যাবে! চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়—কি বলেন?

—কি? অন্যমনস্ক গীতা ব'ললে।

—My good luck! আপনি বুঝি আমার কথা না শুনে

অন্যমনস্ক হ'য়ে কি সব আজেবাজে ভাবছেন? ব'লতে ব'লতে সৌমেন পেছিয়ে এসে গীতার ঠিক পাশে পাশে চলতে সুরু ক'রলে।

—হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস ক'চ্ছিলেন?

—চেষ্টা ক'রলে কি এই গোপ সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো কবিতা লেখা যায় না? ব'লে সৌমেন গীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে।

—নিশ্চয়, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

—আপনার তো কবিতা-টবিতা বেশ আসে, গীতা দেবী! দেবেন আমায় একটু দেখিয়ে শুনিয়ে? কিছু না—শুধু সময় কাটানোর একটা—

স্বচ্ছ-হাসি হেসে গীতা ব'ললে, ওটা হ'লো মানুষের অন্তরের একটা অপূর্ব্ব প্রেরণা। কবিতা লেখা কি কেউ কাকেও শিখিয়ে দিতে পারে, সৌমেনবাবু? তা ছাড়া আপনি ভুল ক'চ্ছেন; আমি তো কোনদিন কবিতা লিখিনি। ও রসে আমি বঞ্চিত। যারা লেখে তাদের আমি শ্রদ্ধা করি, যাদের লেখা প'ড়ে আমি আনন্দ পাই তাদের আমি মনে মনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

বিপুল পিছন ফিরে সৌমেনের উদ্দেশে ব'ললে, ওহে কবি! পশ্চিম আকাশের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাও, তোমার কবিত্বের নেশা ছুটে যাবে।

কথায় মসগুল হ'য়ে এতক্ষণ ওরা ঢিমে তালে পথ চ'লছিল। পশ্চিম আকাশ যে কখন মেঘে ছেয়ে এসেছে তা ওরা লক্ষ্যই করেনি! দিনের আলো শেষ হ'তে না হ'তেই যেন পিছনের পৃথিবী নীবিড় আঁধারে ভ'রে গেছে, তারই ছোঁয়াচ লেগে সারা পৃথিবী একাকার হ'য়ে যেতে আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

সকলেই যথাসম্ভব জোরে চলতে শুরু ক'রলে। বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ছুটে এলো ধূলোর ঝড়। কাঁকর মেশান লাল ধূলো বারে

বারে আছাড় খেয়ে প'ড়তে লাগলো ওদের সারা অঙ্গে। আর চোখ চেয়ে রাস্তা চলা যায় না, আশপাশে কোন আশ্রয়ও চোখে পড়ে না। অদূরে লাল ধুলোর পাহাড় উড়িয়ে ছুটে আসছে খুব সম্ভব এক পাল মোষ। ওরা তাড়াতাড়ি রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অনেকখানি তফাতে স'রে গেল।

হায়রাণের একশেষ হ'য়ে এক-একটি প্রেতমূর্ত্তির মত ওরা যখন ক্লান্ত চরণে বাসায় ফিরলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। বাসায় তখন আর এক কাণ্ড। বিশ পঁচিশ জন সাঁওতালী মেয়ে-পুরুষ সামনের বারাণ্ডায় ব'সে দস্তরমত কলরব ক'চ্ছে আর প্রায় তাদের মাঝখানে একখানি টুলের ওপর ব'সে সভাপতির মত বক্তৃতা দিচ্ছে ভাঙা বাঙলায় স্বয়ং বাহাদুর। ওদের আবির্ভাবে বাহাদুর আসন ছেড়ে দীর্ঘ সেলাম দিলে। বাহাদুরের দেখাদেখি আগন্তুকগণ মাটি ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়াল অস্ফুট কলরবে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ওদের ঘিরে তারা প্রায় সমস্বরে তাদের বক্তব্য শোনাতে লাগলো। এক বিন্দুও বিপুল বা অন্য কারোও বোধগম্য হ'লো না। বাহাদুর ব্যূহ ভেদ ক'রে বাবুদের ভিতরে যাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। অশান্ত ও অশিষ্ট আগন্তুকদের বার কয়েক ধমক দিয়ে সে ভিতরে এসে ওদের আসল বক্তব্য সংক্ষেপে যা ব্যক্ত ক'রলে তার সারাংশ :—

প্রতি বৎসর বৈশাখী পুর্ণিমায় এদেশী সাঁওতালদের একটা বিশেষ উৎসব হয়। উৎসব চলে তিন দিন। যাত্রাগান, সাঁওতালী নাচ আর নানা রকম আমোদ-প্রমোদই ওদের উৎসবের অঙ্গ। বাংলা সংশ্লিষ্ট সামনের ঐ বড় মাঠটা ওরা তিন দিনের জন্য চায়, ওখানেই হবে ওদের উৎসব। আসল মালিকের কাছে ওরা গেছলো, তিনিই ওদের এখানে পাঠিয়েছেন। বাঙ্‌লোর বাবুদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে তাঁরও কোন আপত্তি নেই। একখানা ক্ষুদ্র চিঠিও

তিনি দিয়েছিলেন, বাহাদুরের হাতে এসে সেটা পৌঁছাবার আগেই ওরা সেটা টানা হেঁচড়া কাড়াকাড়ি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে, নইলে হুজুরে সেখানা সে পেশ ক'রতো।

সম্মতি দিয়ে বিপুল বাহাদুরকে বিদায় ক'রলে।

বড় হল ঘরেই এক একটি শোফা আশ্রয় ক'রে সকলে বসে কতকটা নির্জীবের মত।

সকলেই নীরব, কারুর মুখে কথা নেই। ওদের মুখের দিকে চাইলে মনে হয়—উপবিষ্ট শ্রান্ত জীব ক'টি না জানি কত দিন পরে এই প্রথম পেলে বসবার সুযোগ। সুখী-ভোগী লোক একটুতেই বড় বেশী কাতর হ'য়ে পড়েন। উদ্দেশ্য—চা না খেয়ে আর এক পাও তাঁরা হাঁটতে রাজী নন্। বাবুর্চি অনতিবিলম্বে চা নিয়ে এলো। অঞ্জলী আসন ছেড়ে উঠে এলো।

গীতা বললে, তুমি বসো আমি ক'চ্ছি?

সহাস্যে অঞ্জলী ব'ললে, বা-রে আমরা কি—, কি জাত ব'লেছিলে, দাদা?

বিপুল নীরবে হাসতে লাগলো।

—হেঁয়ালীটা কি? সৌমেন উৎসুক নয়নে গীতার দিকে চাইলে।

গীতা ব'ললে, ব'লছি।

গরম জলের ছোট্ট কেটলী থেকে টি-পটে জল ঢালতে ঢালতে অঞ্জলী ব'ললে গীতার উদ্দেশে,—তোমার মনে আছে বৌদি?

কথাটা ব'লে ফেলেই কতকটা অপ্রস্তুত হ'য়ে সে আড়চোখে সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে; দেখলে,—সে শুধু একা নয়, সকলেই ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছে।

বাহাদুর হঠাৎ ভিতরে এসে সেলাম দিয়ে জানালে যে, আগন্তুক

মেয়ে-পুরুষ সবাই চা খেতে চায়। চা না খেয়ে ওরা কিছুতেই উঠতে রাজি নয়।

বিপুল বাবুর্চিকে ডেকে ওদের জন্য এক হাঁড়ি গরম জল বসাতে ব'লে দিলে। চা বণ্টনের ভার প'ড়লো বাহাদুরের ওপর। তা না হয় হ'লো, কিন্তু অতগুলি পাত্র একসঙ্গে কোথা পাওয়া যায়! সমস্যাটা ওরাই সমাধান ক'রে দিলে, কাঁচা শাল পাতায় ওরা চমৎকার বাটী তৈরী ক'রে ফেললে। বলা বাহুল্য এই পাতাগুলিই দুপুরে গীতা কিনেছিল ভাত খাবার জন্য। উচ্ছল উল্লাসের মধ্য দিয়ে চললো ওদের চা-পান। অঞ্জলী দিলে ওদের প্রত্যেককে একখানা ক'রে বিস্কুট।

বিপদ কোন দিনই একা আসে না। চা পর্ব্ব শেষ হ'তে না হ'তেই সুরু হ'ল ঝড় আর তার সঙ্গে জল। ঝড় জলের চিরদিনের মিতালী আজ যেন দানা বেঁধে উঠলো। খোলা মাঠে ঝড়ের গোঁয়ানি—সত্যি শুনলে ভয় হয়। টালি খোলার বাংলো ঝড়ের বিপুল দাপটে কাঁপছে ঠক্ ঠক ক'রে। চালটা যে-কোন মুহূর্ত্তে উড়িয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনায় সকলেই যেন সন্ত্রস্ত। অমন শক্ত কাঠের কাঠামো ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছে।

হ'ল ঘরের চেয়ার, টেবিল, সোফা, টিপয় প্রভৃতি হাতাহাতি ঘরের মধ্যেই একপাশে সরিয়ে আগন্তুকদের ভিতরে বসবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়। ঝড় জলের ঝাপটায় কতক্ষণ মানুষ খোলা বারাণ্ডায় ব'সে থাকতে পারে!

পুরো দু'ঘণ্টা কাটলো. তবু ঝড় জলের বিশ্রাম নেই। শীগ্‌গীর থামবে ব'লে মনে হয় না। কাল বৈশাখী একবার যখন জেগেছে তখন এত সহজে সে ছেড়ে যাবে না। ঝড় জলের উপদ্রবটা এক ঘেয়ে হ'য়ে আপনা হ'তে গা-সওয়া হ'য়ে গেল।

বাহাদুর এসে জানালে যে, আগন্তুকরা ঝড় জল না থামলে ঘরের

বাইরে বেরুতে রাজি নয়। ওদের মধ্যে জন কয়েক আবার ঢালা ফরাসের ওপর এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ বলছে যে, আজকের রাতটা তারা এখানেই কাটিয়ে যাবে।

বাবুদের প্রশ্রয় পেয়ে বাহাদুরের হুমকি, আস্ফালনকে ওরা মোটে আমলই দিচ্ছে না। হুজুরের হুকুম না পেলে কি-ই বা সে ক'রতে পারে।

বাহাদুরকে আপাততঃ বিদায় দিয়ে বিপুল নিজের ঘরে বৈঠক ডাকলে। পাশের ঘর থেকে পিয়ানো ছেড়ে উঠে এল অঞ্জলী, রান্না-ঘরে ঠাকুরকে নির্দ্দেশ দিতে গিয়েছিল গীতা, সেখান থেকে তাকেও আসতে হ'লো। সৌমেন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হাতে কলম নিয়ে, বোধ হয় সে কাল বৈশাখীর রুদ্ররূপকে কবিতায় রূপ দিতে ব্যস্ত ছিল।

সমস্যার সমাধান করা নিতান্ত সহজ নয়। অতগুলি লোকের খাওয়ার ব্যবস্থার চেয়েও সুকঠিন রান্নার ব্যবস্থা করা। পঁচিশ-তিরিশ জন লোককে বেঁধে খাওয়াবার মত হাঁড়ি বা পাত্র এই ভয়াবহ রাত্রে কোথা পাওয়া যায়? হাঁড়ি বা ডেকচি যা সঙ্গে আছে তা বার পাঁচেক উনুনে না চাপালে অতগুলি লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করা অসম্ভব!... ...নানা গবেষণার পর আগন্তুকদের জন্য খিঁচুড়ীর ব্যবস্থাই হয়। বিদেশ-বিভুঁয়ে এই দুর্য্যোগের রাত্রে করা যাবে কি? না খাইয়ে লোকগুলোকে উপোসীও রাখা যায় না আর বাহাদুরের মত অনুসারে ওদের মেয়ে তাড়ানও যায় না, যে-কোন উপায়ে খাওয়ার ব্যবস্থা ওদের ক'রতেই হবে। ঠাকুর-চাকরদের একটু কষ্ট হবে আর নিজেদেরও একটু অসুবিধা, কিন্তু উপায় কি?

অতিথিদের খাওয়ানোর ভার প'ড়লো গীতার ওপর আর তদারকের ভার পড়লো অঞ্জলীর ওপর। অসুস্থ মানুষ হিসাবে সৌমেন থাকবে নীরব দর্শক মাত্র। বাহাদুরকে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আজ

রাত্রে ওরা এখানে থাকবে এবং খাবে। সে যেন ওদের ওপর অযথা কোন জুলুম না দেখায় এবং অভদ্রতা না করে, বরং ওদের সুখ-সুবিধার দিকে সে যেন রাখে সজাগ দৃষ্টি।

হুজুরের অভিমত শুনে সে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'লো ব'লে তার মুখ দেখে মনে হলো না। নীরবে সেলাম জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিপুলের যে-কোন আদেশের আগেই যে বাহাদুর বলতে অভ্যস্ত 'জী-হুজুর', আজ আর সে কোন কথাই ব'ললে না।

চোর-ডাকাত সম্বন্ধে বাহাদুরের ধারণা বড়ই সজাগ। অশিক্ষিত সাজ সজ্জাবিহীন, পাদুকাশূন্য কুলি মজুর বা ঐ জাতীয় যে-কোন শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে সে কোনদিনই ভাল ধারণা পোষণ করে না; ওরা প্রত্যেকেই ওর কাছে 'ডাকু' পদবাচ্য ছাড়া আর কিছু নয়। তাই কতকগুলো ডাকুকে প্রশ্রয় দেওয়ায় বাহাদুর মোটেই প্রসন্ন হতে পারলে না। ওদের সুখ-সুবিধার দিকে হোক বা নাই হোক, ওদের হাবভাব, চালচলনের দিকে রাখলে সে অপ্রসন্ন চিত্তে সজাগ দৃষ্টি!

অতগুলি লোকের রান্না শেষ হ'তে রাত নেহাত কম হ'লো না, প্রায় সাড়ে-বারোটা। ঝড়ের গতি তখন কমে এসেছে কিন্তু জল ঝরছে সমানে। পশ্চিমের বারাণ্ডায় ওদের খাবার জায়গা ক'রে দেওয়া হ'লো। হিসাব ক'রে দেখা গেল, সংখ্যায় ওরা আঠাশ জন। পাতে পাতে খিচুড়ী দিয়ে ওদের খেতে ডাকা হ'লো। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউই ঘর থেকে বেরোয় না। বাহাদুর বার বার ডেকে হায়রাণ হ'য়ে যাচ্ছে। ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন সব ওরা বলাবলি ক'চ্ছে। কথার সুর ক্রমশঃ উঠে প্রায় কলরবে পরিণত হ'লো। বাহাদুর এসে জানালে যে ওরা খেতে রাজি নয়! কি সর্ব্বনাশ, এত আয়োজন সব নষ্ট হবে! এমন শুকনো বিপদে কি মানুষে পড়ে!

ভারী রাগ হ'লো বিপুলের, বললে, ব্যাটাচ্ছেলেরা খাবে না তো

আগে ব'ললে না কেন! ন্যাকামি পেয়েছে সব, কে ডাকতে গেছলো ব্যাটাদের! খাবেনা—চালাকি! মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো ব্যাটাদের! বাহাদুর, বন্ধ কর দরওজা!

—আঃ থামুন আপনি! ব'লে গীতা হল ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কলরব।

কারণ আর কিছুই নয়, কেমন ক'রে ওরা জানতে পেরেছে যে, বাবুরা মোরগ খায়; আর সে সব মোরগ বুনো নয়—পোষা! পোষা মোরগ খাওয়া ওদের ধর্ম্মনিষিদ্ধ এবং যারা খায় তাদের ছোঁয়া খেলে ওদের জাত যায়, সমাজে একঘ'রে হ'তে হয়। জাতিচ্যুত হবার ভয়ে ওরা বাবুদের বাড়ী খেতে গররাজি। অবশ্য শোনা কথায় বিশ্বাস নেই, তাই তাদের মধ্যে এত মতভেদের দ্বন্দ্ব এবং কলরব। দলের মধ্যে কেউ ব'লছে যে, কথাটা সত্যি; আবার কেউ ব'লছে—মিথ্যা! এখন মা'জী যা ব'লবে তাই তারা বিশ্বাস ক'রবে।

সব দিক ভেবে গীতা ব'লতে বাধ্য হয় যে, তারা যা শুনেছে তা ভুল এবং মিথ্যা; বাবুরা মোরগ খায় সত্য তবে তা পোষা মোটেই নয়—বুনো।

হর্ষধ্বনি ক'রতে ক'রতে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় এসে এক-একটা পাতা দখল ক'রে বসলো। আর কোন কথা নেই, তরকারী দিতে তর সইলো না—সপাসপ্ পাতা সাফ্ ক'রে ফেললে। ঠাকুর তরকারী দিয়ে খিচুড়ী আনতে গেল, ফিরে এসে দেখলে তরকারী সাফ্। দেখতে দেখতে খিচুড়ী আর তরকারী সব ফুরিয়ে গেল, পাঁচ ডেকচি খিচুড়ী ওরা যেন নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিলে। ওরা তবু উঠে না, পেট ওদের তখনও খালি। গীতা অপ্রস্তুতের একশেষ, অদূরে উপবিষ্ট বিপুলের মুখ চুণ; অঞ্জলী রান্নাঘর থেকে আর বাইরে আসেনা। অতীথিরা বার বার চেয়ে দেখছে গীতার মুখের দিকে, আর নিজেদের

মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে কি যেন সব বলাবলি ক'চ্ছে অস্ফুট ভাষায়।

গীতা বাবুর্চিকে আড়ালে ডেকে কি যেন ব'লে দিলে।

ফিরপোর যে ক'খানা রুটি বাবুদের জন্য ছিল, সব ক'খানাই সে চুপিচুপি রান্নাঘরে ঠাকুরের কাছে দিয়ে এলো।

অবশিষ্ট তরকারী এবং রুটির টুকরো সবাইকে গীতা ভাগ ক'রে দিলে। পাঁউরুটি খেতে তারা মোটেই আপত্তি ক'রলে না, হাসিমুখে খেয়ে উঠে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে গীতা, বিপুলের মুখে ফুটলো হাসি; খুক্ খুক্ করে চাপা-হাসি হাসতে হাসতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো অঞ্জলী। অসুস্থ শরীর ব'লে সৌমেনকে আগেই খাইয়ে শুতে পাঠানো হ'য়েছিল, এরা তিনজন এবং বাড়ীর ঠাকুর, চাকর প্রভৃতি এখনো অভুক্ত।

বিপুল ব'ললে, উঃ বড্ড বুদ্ধি ক'রে শেষ রক্ষা ক'রলে, গীতা! আমাদের দু'ভাই বোনের তো দিনে তারা দেখার অবস্থা—না কি বলিস, অঞ্জু?

—আমি তো লজ্জায় আর রান্নাঘর থেকে বেরুতে পারিনি, দাদা।

—শুনলে গীতা, শুনলে! হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠলো বিপুল।

—শুধু শেষটা—? ভোজন পর্ব্বের প্রথমটা রক্ষা ক'রলে কে? আপনি তো ওদের খিচুড়ীর বদলে উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা ক'রতে যাচ্ছিলেন? ব'লে গীতা হাসতে লাগলো।

বিপুল যেন আরো কি ব'লতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে গীতা ব'ললে, বাকি কথা খেতে ব'সে হবে।

আপনি মুখ হাত ধুয়ে নিন! এসো অঞ্জু!

অঞ্জলীকে বাথরুমে পাঠিয়ে গীতা গেল আগন্তুকদের শোবার তদারকে। জল তখনও সমানভাবে ঝরছে।

বৈশাখী পুর্ণিমার ক'দিন আগে থাকতেই বাঙলোর সামনের মাঠে

ম্যারাপ বাঁধা হ'তে লাগলো। দেখতে দেখতে গ'ড়ে উঠলো হোগলা-ছাওয়া একটা বিরাট আটচালা। চতুর্দশীর দিন থেকেই আটচালার ছু'ধারে সার বেঁধে এক-হারা হোগলা ঘরে দোকান ব'সতে সুরু হ'লো। বেগুনি, ফুলুরি আর পাঁপর ভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী। তা ছাড়া, কাচের চুড়ির দোকান, মাটির পুতুলের দোকান, লোহার হাতা, খন্তি, বেড়ী ও সাঁড়াশী প্রভৃতির দোকান ; মাটির হাঁড়ি, কলসী, সরা, গামলা প্রভৃতির দোকান ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে গায়ে গা মিলিয়ে ব'সে গেল।

দলে দলে মেয়ে-পুরুষ আসতে লাগলো কত দূর-দূরান্তর থেকে। অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং শক্তিসামর্থ্যের অধিকারিণী সাঁওতাল রমণীরা। ওদের মধ্যে এক-একজনের মাথায় বোঝা, পিঠে বাঁধা একটা ছেলে, কাঁকালে আর একটি আর ডান হাতে একগাছি ঈষৎ লম্বা লাঠি। ক্রোশের পথ ক্রোশ ওরা এই ভাবে পথ অতিক্রম ক'রে আসছে। ওরা কষ্ট স্বীকার ক'রতেও যেমন পারে, প্রাণখোলা আনন্দকে উপভোগ ক'রতেও ঠিক তেমনি জানে।

সেদিন বৈশাখী পুর্ণিমা।

পুবের বারাণ্ডায় তখনও উদীয়মান স্বর্য্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েনি। এই দিকটাতেই সকালবেলা ওরা চায়ের টেবিলে জমায়েত হয়। তরুণ রবির কাঁচা আলোয় সকালবেলা চা খেতে ওদের ভারী ভাল লাগে। প্রতিদিনের মত আজও চা পানের সঙ্গে গল্প চ'লছে। তবে আজকের গল্পে একটু নূতনত্ব আছে, কারণ আজকের table-talk গতানুগতিকতাবর্জিত—ওদের ঐ উৎসব সংক্রান্ত। সহুরে লোকের কাছে এ যেন এক অদৃষ্টপুর্ব্ব অভিনব ব্যাপার। চা পানোন্মত্ত তরুণ-তরুণীর হাসি-কথার মাঝে বারাণ্ডার ধারে প্রায় আধ হাত লম্বা শুকনো শালপাতার বিড়ি টানতে টানতে লাঠি হাতে এসে দাঁড়াল এক

বিরাটাকার নাতিদীর্ঘ প্রৌঢ় ! আগন্তুকের চেহারার তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি এবং ক্ষীণজীবী বাহাদুর তখনও অল্প দূরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ চাপা অথচ কর্কশকণ্ঠে তাকে বোঝাতে চেষ্টা পাচ্ছে যে, সাহেব মেমেদের চা খাবার সময় তাঁদের বিরক্ত করা শুধু অভদ্রতা নয়—অমার্জ্জনীয় অপরাধ ! কিন্তু কে কার কথা শোনে ! বাহাদুর এবং তার ভোজালীকে সে মোটেই আমল দিলে না, গলার একটা অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে সে বাবুদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা ক'রলে। আগন্তুকের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া বাহাদুরের করার মত কিছুই রইলো না।

আগন্তুকের আসার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যে, আজ তাদের গুরুজী চাঁদবাবু উৎসব দেখতে আসবেন এবং আজকের রাতটা তিনি এখানেই থাকবেন। চাঁদবাবুর ভূয়সী প্রশংসা এবং তাঁর অশেষ গুণের কথা সে উল্লেখ ক'রলে পঞ্চমুখে। তাঁর মত মানুষরূপী দেবতার আদর, আপ্যায়ন এবং অভ্যর্থনা করা মূর্খ, জঙলী সাঁওতালদের কর্ম্ম নয় ; ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত। চাঁদবাবুকে যদি এক রাত্রের মত থাকবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁর মর্য্যাদা অনুযায়ী আদর-আপ্যায়নের ভার বড়বাবু গ্রহণ করেন তা'হলে সাঁওতালরা তাঁর কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবে।

এত কথা তার খরচ করার প্রয়োজন ছিল না, বিপুল সহজেই সম্মতি দান ক'রলে। এমন অনায়াসলব্ধ চমকপ্রদ উল্লাস তাঁদের জীবনে এসেছে খুবই কম। চাঁদবাবুর সম্বন্ধে কি অসীম আগ্রহই না জাগলো ওদের মনে ! এতগুলি সাঁওতাল যাকে দেবতার মত ভক্তি করে—নিশ্চয়ই তিনি একজন পথচারী সামান্য মানুষ নন্। মস্ত বড় যোগী, ধার্ম্মিকপ্রবর—একটা বিরাট কিছু। জটাজুটধারী দীর্ঘাকার তেজপুঞ্জ কলেবর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, পরণে তাঁর কৌপিন অথবা তিনি গৈরিকধারী আজন্ম ব্রহ্মচারী ফলমূলাহারী তাপস ! গুরুজী যখন—

বয়স নিশ্চয় সত্তর-আশীর কম নয়। কি ভাষায় কথা বলেন তা তিনিই জানেন, অথবা মোটে কথা বলেনই না—মৌনী।

চায়ের বৈঠক ভাঙতে সেদিন একটু দেরীই হয়। চাঁদবাবুকে নিয়ে তাদের আলোচনা যেন শেষই হ'তে চায় না। কারুর সঙ্গে কারুর মতের মিল হয় না। সৌমেন বলে এক—গীতা বলে অন্য। অঞ্জলী অনাগত চাঁদবাবুর পক্ষ নেয়—বিপুল করে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা। যাকে মানুষ কোন দিন চোখে দেখে না, যার সম্বন্ধে কোনকিছুই জানা নেই তাকে নিয়েই গড়ে উঠে বিরাট সমালোচনা, এটাই স্বাভাবিক—এটাই মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম। এ সমালোচনার শেষ কোথা? অন্য দিন রোদের আভাষ অল্পেই তাদের সন্ত্রস্ত ক'রে তোলে, আজ কিন্তু ঘটলো তার ব্যতিক্রম। অরুণ রবির সোনার আলো ক্রমশঃই রুক্ষ হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়ছে ওদের চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে কিন্তু সেদিকে আজ আর খেয়াল কোথা, সকলেই নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে ব্যস্ত, আত্মহারা।

বাজারে যেতে দেরী ক'রলে বাবুদের খেতে দুপুর পেরিয়ে যাবে। গত রাত্রে অতিথিদের ভূরি ভোজনের সহানুভূতির ঠেলায় ভাঁড়ার প্রায় খালি, আনাজপাতির বালাই নেই। তেল, নুন, ঘি, লঙ্কা প্রভৃতি মসলাপাতিও বাড়ন্ত। চাকরটা বাবুদের বৈঠক ভাঙার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে প্রায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। ওদিকে সরকার মশাই বারে বারে তাড়া দিচ্ছেন। মহা-মুস্কিলে পড়লো বেচারী। গত্যন্তর না দেখে সে ধীরে ধীরে গীতার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। শম্ভুকে দে'খে গীতার খেয়াল হ'লো, তার চমক ভাঙলো।

—ওঃ বাজারে যাবে? তা এতক্ষণ আমায় ডাকোনি কেন?

শম্ভু নীরবে মুখের কোনে অতি কষ্টে টেনে আনে ক্ষীণ হাসির রেখা। কেন যে সে ডাকেনি তা সে নিজে স্পষ্ট বুঝলেও বোঝাবার

শক্তি ও সাহস তার নেই। কে জানে বড় লোকেরা কখন কি মেজাজে থাকে! আজকের দিনে চাকরী হারাবার মত বিড়ম্বনা আর দ্বিতীয় কিছু নেই। অসময়ে রস ভঙ্গ করার অজুহাতই তার মত বার টাকা মাইনের চাকরের চাকরী যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

গীতার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠক ভঙ্গ হয়, চাঁদবাবু সংক্রান্ত সমালোচনা সে বেলার মত বন্ধই থাকে।

অঞ্জলী ব'ললে, ওমা—তাইতো এত বেলা হ'য়ে গেছে; কখন কি হবে?

বিপুলের বোধ হয় পা ধ'রে গেছলো, সে হাই তুলতে তুলতে উঠে দাঁড়ালো। সৌমেন ব'ললে, নাঃ আজকের সকালটা বৃথাই গেল! ছু'কাপ চা তৈরী ক'রতে বলি—কি বল বিপুল?

বিপুল পাইচারি ক'রতে ক'রতে শির সঞ্চালনে সম্মতি জানালে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সৌমেন বোধ হয় বাবুর্চির উদ্দেশে ভিতরে গেল।

বৈকালের দিকে বিপুলের বন্ধু বিরামবাবু সহর ছেড়ে সহরতলী অভিমুখে অর্থাৎ বিপুলের বাঙ্‌লোয় বেড়াতে এলেন।

বন্ধুর উদ্দেশে বিপুল ব'ললে, বিরামবাবু কি এত দিন বাড়ীতে বসে বিরাম গ্রহণ ক'চ্ছিলেন? তারপর, আছো কেমন?

রহস্য ক'রে বিরামবাবু ব'ললেন, মুটে-মজুর লোকের থাকা আর না থাকা ছু-ই সমান—না কি বলেন সৌমেনবাবু? প্রত্যুত্তরে সৌমেন একটু হাসলে মাত্র।

বিরামবাবুর সঙ্গে সৌমেনের খুব বেশী দিনের পরিচয় নয়, পরিচয়টা এখনো তরল, ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়নি। বিরামের বয়স খুব বেশী নয়—প্রায় ওদের সমবয়সী, কিন্তু চালচলনে লোকটা একেবারে

সেকেলে এবং একটু বুড়ড়ুটে ভাবাপন্ন। কনট্রাকটারী ক'রে ক'রে লোকটার মন এবং মেজাজ দু-ই কড়া হ'য়ে গেছে। শোনা যায়— কনট্রাকটারী ক'রে বিরাম বর্ত্তমানে কোটিপতি, শোনা কথা সাধারণতঃ একটু অতিরঞ্জিতই হয়ে থাকে, ধরা যাক বিরাম বর্ত্তমানে লক্ষপতি। কিন্তু বিরাম বর্ণচোরা আম, তার পোষাক-পরিচ্ছদ কথাবার্ত্তায় কে ব'লবে যে তার দু'বেলা পেটপূরে খাবারও সংস্থান আছে! বিরামকে কৃপণ ব'ললে কিন্তু অন্যায় করা হবে. খরচ সে যথেষ্ট করে তবে সব সময়ে নয়। দিলটা তার সময়ে সময়ে যখন খুলে যায় তখন দানে সে দাতাকর্ণ, মুক্তহস্ত; দু আনার কম সে কোন ভিখারীকে দানই করে না। আবার মেজাজ খারাপ থাকলে ভিখারী দেখলেই সে মেরে তাড়ায়। সাংসারিক খরচ সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম. দিল ভাল থাকে— চলবে কালিয়া, পোলাও, লুচি. মাংস, পায়েস, পিঠে আর দিল বিগড়ালে শাক, ডালের পয়সা দিতেও বিরাম বিমুখ। বিরামের বন্ধুরা বলে, ওটা খেয়ালী। বাড়ীর লোক বলে, মাথাপাগোল। পাড়ার লোক বলে, মেজাজী!

বিরাম চা খায় না। বিপুল তাকে জোর ক'রে চায়ের টেবিলে এনে বসায়। বিরাম চাপা গলায় বলে, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না বিপুল, মেয়েদের সামনে আমি কেমন নার্ভাস হ'য়ে পড়ি! ওরা সব up-to-date মেয়ে, ওদের সামনে কথা বলতে আমার জীভ জড়িয়ে আসে। তা ছাড়া মুটে-মজুর লোকের মুখ দিয়ে কখন কি বেফাঁস কথা বেটো-করে বেরিয়ে পড়ে তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছেরে ভাই? শুধু তাই নয়, চা খাওয়া আমার একদম নিষেধ। লিভারটা আমার বেমালুম খারাপ হ'য়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে কালে-ভদ্রে এক-আধ কাপ খেয়ে যাই আর-কি! সারা রাত বিছানায় প'ড়ে ছটফট্ করি, এক ফোঁটা ঘুম চোখের ডগায় আসে না।

গীতা আর অঞ্জলী এসে না প'ড়লে বিরাম তার কথায় সহজে বিরাম দিতো ব'লে মনে হয় না, চেয়ার গ্রহণ করার আগে ওরা বিরামকে নমস্কার ক'রলে। বিরাম উঠে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে সশ্রদ্ধ নমস্কার ক'রলে—যেমন জমিদারকে দেখে সশ্রদ্ধ নমস্কার করে তাঁরই গোমস্তা।

গীতা এক কাপ চা বিরামের দিকে এগিয়ে দেওয়া মাত্র গর্জ্জে উঠলো সে, খবরদার! খবরদার!! অমন কাজটি ক'রবেন না! চা আমার ধাতে মোটে সয় না! আমাকে বরং একখানা কেক-টেক দিন, তোয়াজ ক'রে খাই।

সৌমেন কিন্তু আর থাকতে পারলে না, ব'ললে, কিছু মনে ক'রবেন না বিরাম বাবু, কেকে মুরগীর ডিম আছে! তাই ব'লছিলুম, হিন্দুর ছেলে হ'য়ে—

বিরাম ব'ললে, তাতে কি, হাঁস মুরগী আমি হামেসাই খাই।

সৌমেন ব'ললে, খেয়ে আপনার রাত্রে ঘুম হয় তো?

কেক্ খেতে খেতে বিরাম ব'ললে, বিলক্ষণ! অমন মিষ্টি মাংস আর আছে?

গীতা আর অঞ্জলী কোন কথার উত্তর দেয় না, ওরা মৃদু হেসে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

—মুরগীর মাংস অমন চমৎকার মুখরোচক ব'লেই বোধ হয় হিন্দুর খাওয়া নিষেধ, আর মুরগী-উপাসকেরাই এই শাস্ত্রবাক্যের প্রচারক।

গীতার দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চেয়ে এক বিচিত্র হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিরাম ব'ললে, দেখুন, মেয়েমানুষের কাছে ভাল মন্দ জিনিষ চেয়ে-চিন্তে খেতে আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। কেকটা আপনাদের—

—আর একখানা দেবো? ব'লেই গীতা তার প্লেটের উপর আর একখানি কেক তুলে দিলে।

—দিলেন যখন খেয়েই ফেলি! সৌমেনবাবু যে চোখ বুঁজেই চা খাচ্ছেন—বড্ড আরাম পাচ্ছেন বুঝি? ব'লে বিরাম সৌমেনের দিকে চেয়ে বিশ্রীভাবে হাসতে লাগলো।

সৌমেন ভয়ানক চটে গেছে বিরামের ওপর। লোকটা বিংশ শতাব্দীর একটি জানোয়ার বিশেষ! সভ্য জগতে মেয়েমানুষ' কথাটার একটা সহুরে বিশ্রী অর্থ হয়, একথা যদি গীতা ও অঞ্জলীর জানা থাকতো তা হলে নিশ্চই তা'রা গরম চা সমেত কাপ বক্তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সরোষে চেয়ার ছেড়ে স্থান ত্যাগ ক'রতো! আর ওরই বা দোষ কি, ও তো নিজের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার কথা আগেই জানিয়েছিল। সৌমেনের যত রাগ গিয়ে পড়লো বিপুলের ওপর।

কেকটি শেষ ক'রে বিরাম ব'ললে, কি—সৌমেনবাবু যে উত্তর দিচ্ছেন না?

বিরক্ত মুখে সৌমেন ব'ললে, শুধু চোখ নয় মশাই, কান দুটো বুজিয়ে খেতে পারলে আরও আরাম পেতাম।

—হেঁ হেঁ ভারী রসিক লোক আমাদের এই সৌমেনবাবু! চা আর আছে নাকি? কেকের ডেলা দাঁতের পাশে আটকে গেছে, একটু চা হ লে—

কথা শেষ না ক'রে বিরাম মুখ চোকাতে লাগলো।

—কিন্তু রাত্রে যদি ঘুম না হয় তা হলে আমাকে যেন দোষ দিও না, ব'লে বিপুল নিজেই এক কাপ চা ওর দিকে এগিয়ে দিলে।

এক চুমুক খেয়ে নাক মুখ সিটকে বিরাম কাপটা ঠেলে দিয়ে ব'ললে, ধ্যাৎ তেতো! একদম মিষ্টি হয় নি!

বিপুল চামচ দুই চিনি ওর কাপে ঢেলে দিয়ে ব'ললে, আর দেবো?

—থামো—খেয়ে দেখি! বাঃ চমৎকার বাইনেছ! চায়ে যদি মিষ্টি না হ'লো তবে চা খেয়ে লাভ? চা খাওয়া শুধু চিনি আর দুধের লোভে বইতো নয়, নইলে এমন গরম বিষ লোকে খায়! ওকি সৌমেনদা, আপনি যে চেয়ার ছেড়ে ভাগোলবা হ'চ্ছেন?

গম্ভীর কণ্ঠে সৌমেন ব'ললে, আপনি দেখছি ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা ক'চ্ছেন। লক্ষণ ভাল নয়!

-- জানো বিপুল, ভারী মাইডিয়ার লোক আমাদের এই সৌমেনদা।

যেতে যেতে সৌমেন ব'ললে, এই তো ব'লছিলেন—মেয়েদের সামনে আপনার মুখে বোল ফোটে না, আর এখন তো দেখছি—খৈ ফুটছে!

বিপুলের দিকে চেয়ে বিরাম ব'ললে, সত্যি, মেয়েদের সামনে আমি কেমন ঘাবড়ে যাই? মেয়েদের মন ভোলাবার মত ইনিয়ে বিনিয়ে কথা আমার কেমন জুগিয়ে ওঠে না। ওকি, আপনারা যান কোথা?

মৃদু হেসে গীতা ব'ললে, কাজ আছে। আচ্ছা—নমস্কার!

প্রত্যুত্তরে বিরাম ব'ললে, হ্যাঁ।

দৃষ্টিপথের অন্তরালে না যাওয়া পর্য্যন্ত বিরাম ওদের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তারপর কতকটা নিজের মনেই আক্ষেপের সুরে ব'ললে, যাঃ ওঁদের তো নমস্কার ক'রতে ভুলে গেলুম!

--কি অমন আনমনা হ'য়ে গেলে কেন? ব'ললে স্মিতহাস্যে বিপুল।

— আনমনা? কৈ—না। আসরটা একদম খালি হ'য়ে গেল কিনা তাই - ব'লতে ব'লতে বিরাম একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে সুরু ক'রলে।

-- ওরা তোমাকে কি মনে ক'রলে জানো?

—কি?

—মনে করলে যে, তুমি একটি হাস্যকর জীব!

বিড়িতে একটা সুখ টান দিয়ে বিরাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ব'ললে, অঃ এই কথা! ও আমাকে প্রায় সকলেই মনে করে। তোমার বোন—ঐ কি নাম? ওকে তো আমি চিনি। আচ্ছা, আর একটি — ঐযে টক্‌টকে ফর্সা—বাইজী ঢঙে ঘুরিয়ে কাপড় পরা—

—আঃ চুপ্ চুপ্, আস্তে! কি সব আজে-বাজে যা-তা কথা বলতে রু ক'রলে। যার কথা বলছো—ও আমার বৌ।

হো হো ক রে হেসে উঠলো বিরাম।

— কি বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

কেমন ক'রে আর বিশ্বাস হবে বলো? রাম না হ'তে রামায়ণ হ'তে শুনেছি কিন্তু বিয়ে না হ'তে কোথাও বৌ হ'তে শুনিনি। কি রকম বৌ— পাতানো বৌ?

—আরে না না, বিয়ে এখনো হয়নি। তবে খুব শীগগীর হবে।

ঈষৎ চাপাগলায় ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললে বিরাম, বিয়ে হবার আগেই বৌকে নিয়ে ঘরকন্না ক'চ্ছো? বলিহারী বাওয়া তোমাদের সভ্য সমাজকে! আমাদের দেশ, পাড়াগাঁ হ'লে তোমাদের একঘ'রে ক'রে ধোপা নাপিত বন্ধ করে ছাড়তো? তারপর—ছেলেপুলে কি সব বিয়ের আগেই হবে—না পরে?

—তুমি একটি ইডিয়ট! সংযত হ'য়ে কথা ব'লতে জানো না? তুমি জানো, ওর সঙ্গে আমার এখন কোন সংশ্রব নেই; আমরা এখন বন্ধু। সভ্য সমাজে মেয়েছেলেতে-বেটাছেলেতে বন্ধুত্ব হওয়া মোটেই দোষের নয়। তোমাদের সঙ্কীর্ণ মন, যা তা ভেবে নাও!

বিরাম হাসতে হাসতে ব'ললে, তোমাদের তাহ'লে—ঐ যে ইংরেজীতে কি একটা কথা আছে, হ্যাঁ কোর্টশিপ চ'লেছে? মানে বিয়ের আগে যাচাই ক'রে দেখে নিচ্ছ যে, ভবিষ্যতে জমবে কেমন? এ

এক রকম ভালো, নইলে ঝগড়াটে মেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়। এই যেমন ধর না কেন—আমার অবস্থা! গাঁটছড়া বেঁধে বিয়ে যখন হ'য়ে গেছে তখন আর চারা নেই। নাঃ, তোমার কথাই ঠিক, গোড়ায় যাচাই ক'রে জিনিষ নিলে পর আর মন কষাকষি হবার ভয় থাকে না। যা বলেছো, আমাদের সমাজটাকে বদলানো দরকার। এঃ, ব'কতে ব'কতে গলাটা কাঠ হ'য়ে গেল! তোমরা পান খাও—না সহেবস্থবোর বাড়ীতে ওবালাই নেই?

বিপুল চাকরকে পান আনতে বললে।

বিরাম চাকরের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ব'ললে, একটু দোক্তা এনো হে?

হাসতে হাসতে বিপুল ব'ললে, ঐটার কিন্তু অভাব।

—তা হোক, আটকাবে না। বিড়ির মসলাতেই কাজ চালিয়ে নেবো।

—তারপর বিয়ের সময় এই মিষ্টান্নম্ ইতরেজনা হবে তো? না গোলা লোক ব'লে—হো হো করে স্বচ্ছ হাসি হাসতে লাগলো বিরাম।

দূর থেকে সহস্র কণ্ঠের অস্পষ্ট জয়ধ্বনি ভেসে আসে। সাঁওতালরা ষ্টেশন থেকে তাদের গুরুজীকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে উৎসব ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে। শোভাযাত্রার উল্লাসধ্বনি ক্রমশঃই স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠলো। উৎসব ক্ষেত্রে যারা ছিল তারাও এবার সজাগ হ'য়ে কলরব স্থরু ক'রলে।

বিরাম ঈষৎ বিস্ময়ে ব'ললে, ব্যাপারখানা কি-হে বিপুল, তোমাদের এখানে কি আজ স্থভাষ চন্দোর আসছে নাকি?

—ছাখোনা কে আসে!

—বাপ্‌রে বাপ্‌, এসে দস্তুরমত মোচ্ছব লাগিয়ে দিয়েছে ব্যাটারা!

শোভাযাত্রা দৃষ্টির সীমার মধ্যে এসে পড়লো। বিরাট্‌ শোভাযাত্রায়

ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সকলেই যোগদান ক'রেছে। এলোমেলো বিশৃঙ্খলভাবে ঘন ঘন জয়ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা উৎসবক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে আসছে। ছ'জোড়া সাদা গরু একখানা গরুর গাড়ীকে ধীরে ধীরে টেনে আনছে। গাড়ীখানা নানা রকম ফুল দিয়ে সাজান। বোঝা গেল, ঐ গাড়ীতে আছেন ওদের গুরুজী চাঁদবাবু। সাঁওতাল হ'লে কি হয়, সত্যি ওদের রুচির প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। এমনই সাজাবার কৌশল যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে—গাড়ীখানা বুঝি বা ফুলের তৈরী। শুধু গাড়ী নয়, গাড়ীর বাহন অর্থাৎ গরুগুলিকেও ফুল দিয়ে চমৎকার ক'রে সাজিয়েছে। এত বড় বড় গরুও যে বাঙলা দেশে মেলে—না দেখলে বিশ্বাস হয় না। গাড়ীর ওপর একখানি সুন্দর রথ, গঠন-প্রণালীর মধ্যে কলাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে রথখানির কলেবর গ'ড়ে উঠেছে। রথের মধ্যে চাঁদবাবু উপবিষ্ট, গুরুজীকে ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে; বিশেষ লক্ষ্য ক'রলে গুরুজীর মুখখানি শুধু চোখে পড়ে।

গুরুজী উৎসবক্ষেত্রে গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কাড়া, নাকৃড়া, মাদল, জয়ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বেজে উঠলো। উঃ, সে কি ভয়াবহ কর্ণপটাহভেদী চমকপ্রদ উল্লাস। গুরুজীর বয়শ পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে, তামাটে রং, দোহারা চেহারা। পরণে আধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবী, পায়ে স্যাণ্ডেল, চোখে চশমা। কথা ব'লতে বোঝা গেল—গুরুজী বাঙালী। ইনিই লক্ষ সাঁওতালের আরাধনার ধন, প্রাণের ঠাকুর চাঁদবাবু। প্রথমে চাঁদবাবু ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। তারপর সদাশয় সরকার বাহাদুরের অমানুষিক অত্যাচারের ফলেই হোক অথবা মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবেই হোক, বর্ত্তমানে ইনি অহিংসবাদী। নিরক্ষর সাঁওতাল সম্প্রদায়কে সচেতন ক'রে তোলাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

উৎসবক্ষেত্রে পদার্পণ ক'রেই চাঁদবাবু পরিষ্কার সাঁওতালী ভাষায় একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। সাঁওতালদের সুখ-দুঃখের কথা, অভাব-অভিযোগের কথা, দেশ ও দশের কথা সুললিত কণ্ঠে চাঁদবাবু ঐকান্তিকতার সঙ্গে ব'লে গেলেন। শুধু সাঁওতাল নয়, চাঁদবাবুর শ্রোতা হিসাবে বহু শিক্ষিত ও ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত লোককেও আশপাশে দেখা গেল।

বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালী মেয়েরা তাদের সমাজের প্রথা অনুসারে চাঁদবাবুকে বরণ ক'রে গলায় পরিয়ে দিলে জয়মালা, কপালে দিলে তিলক।

বিপুল প্রভৃতি যথারীতি চাঁদবাবুকে অভ্যর্থনা ক'রলে। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কল্পিত চাঁদবাবুর সঙ্গে বাস্তব চাঁদবাবুর আস্‌মান-জামীন্ তফাৎ। চাঁদবাবু প্রকৃত বাঙালী।

চায়ের টেবিলে ব'সে সবার সঙ্গে ভদ্রভাবে গল্প ক'রতে ক'রতে তিনি চা খেলেন, এবং ধর্ম্মের অজুহাত দেখিয়ে কোন কিছুই খেতে তিনি বাদ দিলেন না। ঘরের ছেলের মত খাওয়া সম্বন্ধে লজ্জার তাঁর বালাই নেই। গীতা আর অঞ্জলীর সঙ্গে ব্যবহার ক'রলেন ঠিক যেন নিজের ছোট বোনের মত। একমাত্র ধর্ম্ম সংক্রান্ত আলোচনা বাদ দিয়ে রাজনীতি থেকে সুরু ক'রে রঙ্গালয় ও ছায়াচিত্র পর্য্যন্ত তিনি অম্লানবদনে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই আলোচনা ক'রলেন। ধর্ম্মের কথা উঠতে তিনি সবিনয়ে ব'ললেন, যে সম্বন্ধে কোন কিছু জানিনি আর জানবার চেষ্টাও করিনি কোনদিন—সে সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ! মানুষের সেবাই ধর্ম্ম, ইহকাল এবং পরকাল। এ ছাড়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কথার কোন মূল্য নেই। এটা আমার অতি বিনয় নয়, চরম অখণ্ড সত্য।

সে দিন ভোরের ট্রেণেই চাঁদবাবু সবার কাছে বিদায় নিয়ে বীরভূম

চ'লে গেলেন। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের সাহচর্য্যে মানুষ যে মানুষের মনে এমন ভাবে ছায়াপাত ক'রে আপনার চেয়েও অতি আপনার ক'রে নিতে পারে তা চাঁদবাবুকে যে না দেখেছে, তাঁর সান্নিধ্যে যে না এসেছে—সে বুঝবে না, হয়তো বিশ্বাসও ক'রবে না। বাস্তবিক, এক-একটা মানুষ যেন যাদু জানে! ক্ষণেকের পরিচয়ে চাঁদবাবুর মত লোক মনের কোণে শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে এমন দাগই রেখে যান, যা আর সারা জনমে মিলায় না। রক্ষা এই যে চাঁদবাবুর মত লোক হাজারে একটা জন্মায়, নইলে সাধারণ লোক পাগল হ'য়ে যেতো। এরা কি ভগবানের আশীর্ব্বাদ—না অভিশাপ!

চাঁদবাবুর চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব মণ্ডপের সব কটা আলো যেন এক সঙ্গে নিবে গেল। ওদের সারা রাতের নৃত্য, গীত, আনন্দ-উল্লাসের যেন আর কোন মূল্যই রইলো না। গুরুজীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘন বিষাদের একখানি কাল যবনিকা নেমে এলো ওদের উৎসব প্রাঙ্গণে, সব কিছুই ম্লান, বিবর্ণ, প্রাণহীন! সকলেই যেন ঝিমিয়ে পড়লো, ঘুমিয়ে পড়লো মাটির ধূলোয়। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ! কে ব'লবে—গত রাত্রে এই নিস্তব্ধ উৎসব প্রাঙ্গণে হাজার প্রাণের উল্লাসের বন্যা ব'য়ে গেছে!

ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ওপাশের ঐ শালবনে নাম-না-জানা পাখীরা জাগছে, ফুটছে তাদের অস্ফুট ঘুমভাঙা কলরব। প্রভাতী বাতাসের হালকা ঢেউ লেগেছে কাঁসাই নদীর কালো জলে, সূর্য্যের দু'একটা লাল রশ্মি শালবনের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে আলগোছে ছড়িয়ে পড়লো উৎসব প্রাঙ্গণে—ঘুমন্ত সাঁওতালী ছেলে মেয়ের গায়ে মাথায়, মুখে।

বৈকালের দিকে আসর আবার সরগরম হ'য়ে উঠলো। কোলকাতা

থেকে যাত্রার দল আসছে। কালকের চেয়েও আজ বেশী ভিড় হবে। তেলেভাজার দোকানে এখন থেকেই ভিড় লেগেছে। মনোহারী দোকানে সাঁওতালী মেয়েদের কাঁচের চুড়ি পরার ধূম, পাশের দোকানে মাটির পুতুলের দর কষাকষি, দৈত্য-দানবের মুখোস প'রে সাঁওতালী ছেলেমেয়েদের দাপাদাপি, ওদিকে নাগর দোলার আর্ত্তনাদ…… মৃতসঞ্জীবনী সুধার পরশে উৎসবক্ষেত্রের চারিধার জীবন্ত, জাগ্রত।

সন্ধ্যার আগেই যাত্রার সাজ-সরঞ্জাম বোঝাই দু'খানা গরুর গাড়ী সাজঘরের সামনে এসে থামলো, ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই হ'য়ে যাত্রার দল পিছনে আসছে। সারা আসরে আলো দেওয়া হ'লো। ছেলেমেয়ের উল্লাস ধ্বনিতে সন্ধ্যার আকাশ বাতাস হ'লো মুখরিত।

সর্দ্দার এসে বাঙলোর বাবুদের যাত্রা শোনবার আর একবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেল।

গীতা আর অঞ্জলী ঝোঁক ধ'রলে যে তারা সারারাত যাত্রা শুনবে। থিয়েটার দেখে দেখে চোক পচে গেছে কিন্তু যাত্রা তারা কোনদিন শুনেছে কিনা মনে পড়ে না। নিকৃষ্ট বস্তুর মধ্যেও যদি নতুনত্ব থাকে তবে তার মোহে মানুষের নতুনত্ব পিয়াসী মন আকৃষ্ট না হ'য়ে পারে না। সৌমেন ব'ললে যে, তাকে আজ ওপাশের ঘরে সারারাত দরজা জানালা বন্ধ ক'রে কানে তূলো দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা ক'রতে হবে! বিপুল ব'ললে যে, ঘণ্টাখানেক শুনে শুতে গেলেই চ'লবে।

কার্য্যকালে দেখা গেল ঠিক তার বিপরীত। রাত তিনটে বাজতে যায় তবু ওরা চারজন বারাণ্ডায় পাশাপাশি ব'সে যাত্রা শুনছে। কানে তূলো দিয়ে ঘুমোবার পরিবর্ত্তে সৌমেন কান খাড়া ক'রে একমনে যাত্রা শুনছে, ঘণ্টা চারেক শোনার পরও বিপুলের শুতে যাবার ইচ্ছা নেই; একমাত্র গীতা ও অঞ্জলীর, কথা ও কাজে অপর্য্যাপ্ত সামঞ্জস্য।

যাত্রা—আধুনিক যাত্রা বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল তরুণ-তরুণীর কাছে অত্যন্ত উপাদেয় এবং শ্রুতিমধুর, নইলে তাদের ধৈর্য্যচ্যুতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অনুমানে বোঝা গেল, ভোর না হ'লে যাত্রা ভাঙবার অর্থাৎ শেষ হবার সম্ভাবনা নেই। সারারাত জাগা ওদের অভ্যাসের বাইরে ; অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওরা আসন ছেড়ে উঠতে বাধ্য হয়।

সকালে ওরা যখন চায়ের টেবিলে এসে ব'সলো তখন দশটা বেজে গেছে। যাত্রার আসর ফাঁকা, যাত্রা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাওয়ালারা সাজ পোষাক নিয়ে সকালের ট্রেনে চ'লে গেছে। ছু'পাঁচজন যাত্রার খালি আসরে সতরঞ্চির ওপর প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে। এক পাল রাস্তার কুকুর নির্ভীকচিত্তে সারা উৎসব প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে ভাঙা পাঁপরের টুকরো, পায়ে দলা মুড়ি মুড়কি, যাত্রাওয়ালাদের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত, ডাল, মাছের কাঁটা। আসরের মাঝখানে শুয়ে আছে একটা বড় ষাঁড়। কুকুর, মানুষ, গরু নির্ব্বিকার চিত্তে পাশাপাশি শুয়ে আছে। সমস্ত দোকানটা তুলে নিয়ে গেলেও ঘুমন্ত দোকানী আপত্তি ক'রবে না, দরদাম করা তো দূরের কথা ; পর পর ছু'রাত্রি জেগে তারা বেহুঁস হ'য়ে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ ক'রেছে।

দিবানিদ্রার পর ওরা চা'টা খেয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছে এমন সময় পাশ থেকে কে ব'ললে, পেন্নাম বাবুমশই !

বারাণ্ডার ওপর গামছা পেতে লোকটি এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল।

বিপুল ব'ললে, কি চাই ?

মাথায় গামছাটা জড়াতে জড়াতে লোকটি উঠে দাঁড়াল, ব'ললে, চাইনি কিছু, একটু কথা ছিল। আপনারা বেড়াতে বেরুচ্ছো—পিছু ডাকলুম, কিছুটী মনে ক'রোনি। চলো, আপনাদের সঙ্গে একটু বেড়াতেই যাই।

লোকটি ওদের সঙ্গ নেয়।

নিজেদের মধ্যে কথা ব'লতে ব'লতে ওরা পথ চলছিল। কিছুদূর নিঃশব্দে পথ চলার পর লোকটি ব'ললে, আপনারা এগোও—আমি একটু চা খাই।

পথের ধারে বটগাছের তলায় তোলা উনুনের ওপর পিতলের হাঁড়ী বসিয়ে মাটির খুবিতে চা বিক্রী ক'চ্ছিল এক টিকিধারী পশ্চিমদেশীয় প্রৌঢ়। একখানা ক'রে ইটের ওপর উবু হ'য়ে ব'সে পথচারী আরো দু-পাঁচজন চা-বিক্রেতাকে ঘিরে চা পান ক'চ্ছে। লোকটি বিপুলদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চা-ওয়ালার দলপুষ্টি ক'রলে।

বিপুল নিজেদের মধ্যে কথা ব'লতে ব'লতে পথ ছেড়ে সবুজ ঘাসের মাঠে নামলো। বেশ কিছু দূর যাবার পর হঠাৎ বিপুলের লক্ষ্য পড়লো বুকপকেটের দিকে। যাঃ অমন দামী পেনটা গেল! অস্ফুট স্বরে ব'লে কি যেন মনে ক'রবার চেষ্টা করে বিপুল। বেশ পরিষ্কার মনে আছে, সে পেন্ নিয়ে বেরিয়েছিল। দামী জিনিষ হারালে মানুষ যে ব্যথা পায় তার তুলনায় অনেক বেশী ব্যথা পায় সখের জিনিষ খোয়া গেলে। বিপুলের পেনটা শুধু দামী নয়, ওটি তার অনেক দিনের সাথী সখের সাথী। আর বেড়াতে যাওয়া হ'লো না, যেখান দিয়ে তারা এসেছিল সেইখান দিয়েই তারা সদলে পেনটা খুঁজতে খুঁজতে ফিরলো বাড়ীর দিকে। কিছু দূর আসবার পর হঠাৎ দেখা সেই লোকটির সঙ্গে—সেই 'বাবুমশই'। সবারই মনের অবস্থা খারাপ, দেখেও কেউ তাকে দেখলে না; বরং ওর উপস্থিতিতে ওরা অসন্তুষ্টই হ'লো।

থমকে দাঁড়িয়ে লোকটি প্রশ্ন ক'রলে, বাবুমশইরা যে এরি মধ্যে ফিরে পড়লে?

কেউ তার কথায় উত্তর দিলে না, সকলের চোখই তখন মাঠের বুকে ঘাসের ওপর নিবদ্ধ।

—গরীব, মুখ্যু মানুষ ব'লে হেনেস্তা না ক'রে একটা মুখের কথাই ছুঁড়ে মারো, বাবুমশইরা।

ভয়ানক বিরক্ত হয় সৌমেন। বলে, ভালো আপদ এসে জুটলো! তখন থেকে তুমি আমাদের পিছু নিয়েছো কেন, কি চাই তোমার?

—এত চটে-মটে কথা ব'লছো কেন গো, বাবুমশই।

সরোষকণ্ঠে সৌমেন বলে, ফের যদি ভ্যাজ ভ্যাজ করো তো পুলেসে ধরিয়ে দেবো! আস্তে আস্তে স'রে পড়ো!

—আঃ, যেতে দাও না, সৌমেন! ওর সঙ্গে বাজে ব'কে লাভ কি? ব'লতে ব'লতে বিপুল ছড়ি দিয়ে ঘাস উল্‌টে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে।

বিপুলের কাছে স'রে এসে লোকটি ব'ললে, বাবুমশইয়ের কি কিছু খোয়া গেছে?

—হ্যা, একটা দামী কলম। সংক্ষেপে উত্তর দিলে বিপুল চোখ না ফিরিয়েই।

—এইটে কি—? ব'লে লোকটি একটি কলম বিপুলের দিকে তুলে ধ'রলে।

আনন্দে বিপুলের মুখে কথা ফোটে না। সে বিস্ময়-পুলকিত নয়নে পেনটির দিকে চেয়ে রইলো। পেনটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধস্বরে ব'ললে, তুমি কোথায় পেলে হে।

একগাল হেসে লোকটি ব'ললে, চুরি করিনি বাবুমশই, পুলিশ ডাকবার দরকার নেই।

বিপুল ব'ললে, না, না, চুরির কথা হ'চ্ছে না। কোথা পেলে তাই জানতে চাইছি। ব'লে বিপুল কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

—রাস্তা থেকে মাঠের কোলে নামতে যে ছোট্ট খানাটা পড়ে তারই ওপর কলমটা উল্‌টে প'ড়ে চিক্ চিক্ ক'চ্ছিল।

ব্যাগ্ থেকে পাঁচ টাকার নোট একখানা বার ক'রে বিপুল ওর হাতে দিতে যেতে লোকটি জোড়হাত ক'রে বললে, মাপ কর্ব্বে—বাবুমশই! আমার এমন চেহারা আর এমন বিচ্ছ্রী বেশভূষো দেখলে কি হবে—এককালে আমি ভদ্দোর ঘরের ছেলে ছিলুম্? কেমন ক'রে কে জানে—মাথার দু'একটা খিল আমার হঠাৎ একদিন আলগা হ'য়ে গেল, আর আমিও সটান বাড়ী থেকে হাওয়া দিনু। ওঃ সে কি আজকের কথা! যাত্রাই তো ক'চ্ছি আজ বিশ বছর।

বিপুল ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে ব'ললে, তোমার নাম কি?

মাথা চুলকে লোকটি ব'ললে, তবেই তো মুস্কিলে ফেললে বাবু-মশই! আমার নামটা মুরারী, তবে ঘোষ কি বোস সঠিক মনে নেই; মোট কথা জাতে আমি কায়েত। মাথাটা মাঝখানে একদম বিগড়ে গেছলো কিনা, বছর দশেক হ'লো সারবো সারবো হ'য়েছে। হঁ্যা বাবুমশই, আমার মাথার কি এখন কোন গণ্ডগোল আছে ব'লে মনে হ'চ্ছে?

—তুমি যাত্রা কর?

—আগে কর্ত্তাম, এখন আর করিনি। কাল থেকে ছেড়ে দিয়েছি—মানে ম্যানেজারমশই জবাব দিয়েছে।

গীতা, অঞ্জলী আর সৌমেন মুরারীর কথা উপভোগ ক'রতে ক'রতে নীরবে পথ চলে।

বিপুল একাই কেবল ওকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। লোকটার বলার ধরণ ভারী উপভোগ্য, ওর মুখে গ্রাম্য কথার টান বা সুর কানে বেশ লাগে। বিপুল আবার প্রশ্ন করে,—তোমায় জবাব দিল কেন?

ম্যানেজারমশইয়ের উচিত ছিল আমায় পেনসন্ দেওয়া, তা না

দিয়ে উনি দিলে আমায় জবাব। তা দিক—ওপরে ভগবান আছে—ধর্ম্মে সইবে না। আচ্ছা বাবুমশই, আপনিই বলোতো, রাতের পর রাত জেগে ক'টা পাট মানুষ সাজতে পারে? হনুমানের পাটগো—আজকাল যার ভদ্দোর নাম হ'য়েছে মারুতি—ওটা তো আমার বাঁধা, তা ছাড়া আছে হাজারটা কুঁচো পাট সাজা। যুদ্ধ ক'রে আসরে কোন রাজরাজড়া ম'রে পড়ে রইলো, মুদ্দোফরাস সেজে আসর থেকে ব্যাটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলুম বাইরে। রাজা মহারাজা যারা সাজে তাদের চেহারা কি মশই—সাতটা বাঘে খেতে পারবেনা; তাদের অতখানি দূর টেনে আনা কি চাড্ডিখানি কথা, শীতকালেও ঘাম বেরিয়ে যায়! ঝাড়ুদার, ঘেসেড়া, কাটা-সৈনিক, ব্যাধ, ভূতপ্রেত, দানাদক্ষি প্রভৃতি পাট যেন আমার জন্যে বায়না দিয়ে তৈরী করা। এক-আধদিন নয় বাবুমশই, দশটি বছর দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঐ সব পাট বেধড়ক্কা সেজে আসছি। আর মাইনে? পেটখোরাকী আর বারোটি টাকা, তাও আদায় ক'রতে হয় ঠেঙিয়ে মাথা মোড় খুড়ে। যাকৃগে অমন ডিমের চাকরী! আর আমার টাকা খাবেই বা কে—না কি বলো বাবুমশই, পাঁচ ভূতে বইতো নয়?

—তা এত দিনের বাঁধা চাকরী তোমার গেল কেন?

—বরাতের ফের আর বলো কেন, বাবুমশই! বাউল সেজে যে ব্যাটা গান ক'রতো কাল রাত্রে হ'লো তার ভেদবমি, ম্যানেজার আমায় বলে কিনা বাউল সেজে গান গাইতে। গান আমার বাপ দাদারা কোন দিন গায়নি, আমি কেমন ক'রে গাইবো? রাস্তা-ঘাটে, পুকুরপাড়ে, বন-বাদাড়ে হ'লে নয় কথা ছিল, কিন্তু এ একবারে আসরে গিয়ে! শেষকালে এই বুড়ো বয়সে পাল চাপা দিয়ে পিটিয়ে ধনচে বানিয়ে ছাড়ুক আর কি! থিয়েটার হ'লে নয় বাঁচোয়া ছিল, তিন দিক ঘেরা—এক দি খোলা; কিন্তু যাত্রার আসর—চারিদিক ফাঁককা,

পালিয়ে বাঁচবার উপায় নেই। আর কিছু থাক বা নাই থাক, প্রাণের ভয়টা তো আছে ; গান গাইতে গিয়ে শেষটা প্রাণে মারা যাবো ! গান গাইনি ব'লে জবাব দিলে, আর বকেয়া মাইনের টাকা 'জরিমানা' ব'লে কেটে নিলে। এখন আমি যা-ই বা কোথা আর খা-ই বা কি ? কোলকাতা না ফিরতে পারলে তো আর অন্য দলে চেষ্টা চরিত্তি ক'রতে পারবো না !

বিপুল ব'ললে, আচ্ছা, আজকের রাতটা তুমি আমাদের এখানে থাকো, কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

পরের দিন সকালে সকলে স্নানটান সেরে দু'খানা ঘোড়ার গাড়ীতে ক'রে চললো 'গোপে' বনভোজনে। গোপের ওপর ওরা আজ নিজের হাতে রান্না ক'রে খাওয়া-দাওয়া ক'রবে। ঠাকুর বাড়ীতেই রইলো, অন্যান্য লোকজন বাড়ীতেই খাবে। গাড়ী গোপের সীমানায় এসে থামবামাত্র মুরারী কোচ্-বক্স থেকে নেমে গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। ক্ষিপ্রহস্তে মুরারী গাড়ীর মাথা থেকে হাঁড়ি, ডেকচি, কড়া, খুন্তি, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি নামিয়ে চাকরটার মাথায় তুলে দিলে। আনাজের ঝুড়ি নিজেই কাঁধে নিয়ে ব'ললে, চলেন বাবুমশই ! আবার একবার আসতে হবে, ও গাড়ীর মাথায় চালের ঠোঙা, ঘি, ময়দা আরো কি কি সব রইলো ; আমি এসে ভাড়া দেবো—এখন গাড়ী ভাড়াটা বাকিই থাক ?

ঢালু রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী উঠতে পারে না, খানিকটা পায়ে হেঁটেই গোপের ওপর আসতে হয়। বাবুদের ফেলে রেখে আগেই মুরারী পাহাড়ের মাথায় তাড়াতাড়ি উঠে এলো। মুরারীর নির্ব্বাচিত বন-ভোজনের স্থানটি ওদের সবারই পছন্দ হ'লো। একটা বিরাট শাল গাছের তলায় জিনিষপত্র নামিয়ে মুরারী চাকরটাকে দিয়ে স্থানটি

পরিষ্কার করিয়ে নিলে। গাড়ী থেকে বাকি জিনিষপত্র নামিয়ে নিয়ে মুরারী ফিরে এসে দেখলে, চাকরটা উনুন গ'ড়তে ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে। তার হাত থেকে শাবলটা নিয়ে মুরারী ব'ললে, তুই ব্যাটা উড়েই র'য়ে গেলি—মানুষ হ'তে পারলিনি!

গীতা ব'ললে, মুরারীর মতে কি উড়েরা মানুষ নয়?

—বাঙলা বুলি ব'ললেই কি আর মানুষ হওয়া যায় গো, দিদিমণি! যা'রে গদাধর, ঐ পাথরের টুকরো কটা নিয়ে আয়?

উনুন তৈরী ক'রে গদাধরকে নিয়ে মুরারী গেল নীচে থেকে জল আনতে। কুটনো কুট্‌তে কুট্‌তে গীতা ব'ললে সৌমেনের উদ্দেশে, একমাত্র বিপুলবাবু ছাড়া মেদিনীপুরে আসা আমরা কেউ-ই সমর্থন করিনি, কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ উপভোগ করা গেল এখানে। যে ক'টি নূতন লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'লো অযাচিতভাবে—প্রত্যেকেই এক-একটি টাইপ, প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। যেমন ধরুন—বিপুলবাবুর বন্ধু বিরামবাবু, সাঁওতালদের গুরুজী চাঁদবাবু, আধ-পাগলা মুরারীমোহন; আর—

অঞ্জলী ব'ললে, আর কি নাম সে-ই সাঁওতালী মেয়েটার—হ্যাঁ, ঝুম্‌রি! সে-ই যে—যার কাছ থেকে তুমি এক রাশ কাঁচা শালপাতা কিনলে, পেতে ভাত খাবার জন্য?

—ও হোঃ হ্যাঁ—মনে প'ড়েছে! ব'লে গীতা অপাঙ্গে বিপুল ও অঞ্জলীর দিকে চেয়ে হেসে লুটিয়ে প'ড়লো।

—দেখো—বঁটিতে যেন হাত কাটে না? গীতাকে সাবধান করে বিপুল।

—না, সেদিকে লক্ষ্য আছে! কি—সৌমেনবাবু যে মৌনব্রত অবলম্বন ক'রলেন?

এতক্ষণ গীতার মুখের দিকে নির্নিমেষলোচনে চেয়েছিল সৌমেন,

গীতার কথায় সচকিত হ'য়ে ব'ললে, মনে ক'চ্ছি—কোন চরিত্র আপনার সমালোচনা থেকে বাদ পড়লো কিনা ?

মুরারী ফিরে এসে উনুন ধরিয়ে দিলে। উনুনশাল থেকে একটু দূরে সতরঞ্চীর ওপর ফরাস বিছিয়ে গোটা তিনেক তাকিয়া সাজিয়ে ক'রলে বাবুদের বিশ্রামের ব্যবস্থা। আজ ভাগাভাগি ক'রে রান্না ক'রবে গীতা আর অঞ্জলী, খুঁটি-নাটি জোগাড় দেবে সৌমেন আর বিপুল। ভারী ভারী কাজের জন্য তো র'য়েইছে মুরারী আর গদাধর।

মুরগীর আওয়াজে বিপুল ব'ললে, সর্ব্বনাশ! মুরগীগুলো তৈরী ক'রবে কে ? গদাধর ব্যাটা তো কাটতে পারবে না ?

মুরারী পাশেই কি যেন একটা ক'চ্ছিল, ব'ললে, তাতে কি হ'য়েছে বাবুমশাই! ও ক'টাকে আমি একাই--

মুরারীকে শেষ ক'রতে না দিয়ে অঞ্জলী ব'ললে, এখানে আর জীব-হত্যা নাই বা করা হলো, দাদা ?

হো হো ক'রে হেসে উঠলো বিপুল, ব'ললে, যতই লেখাপড়া শিখুক—সংস্কারটা মেয়েদের অস্থিমজ্জাগত! সকলেরই কি এই মত ? বেশ—দু'ব্যাটা রামপাখীর এক দিনের পরমায়ু বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো। মুরারী তুমি মুরগী খাও ?

—কি যে বলেন বাবুমশাই! কি খাইনে তাই জিজ্ঞেস করো!

—হুঁ চা খাও ?

—আজই সকালে আপনাদের বাবুর্চির কাছ থেকে এক গেলাস চেয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছি।

—বেশ করেছো! এখন একটা ঘটি, গেলাস যা পাও নিয়ে এসো ? তোমায় যাত্রার দলে চা খেতে দিতো ?

—খাবার মধ্যে ঐটাই দিতো বেশী ক'রে। খিদে মারতে চায়ের আর জুড়িদার নেই, কাজেই ম্যানেজারের ওদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

একটা এ্যায়সা বড় পিতলের হাঁড়িতে চায়ের জল ফুটছে তো ফুটছেই, দিবারাত্রই ফুটছে—কামাই নেই। তবে সে চায়ে না আছে চিনি আর না আছে দুধ, শুধুই রাঙা টক্‌টকে চা। তাই সবাই অমের্ত্ত মনে ক'রে ঘটি ঘটি সাফ্ ক'রে দিচ্ছে। নেশাকে নেশা আর পেটভরানোকে পেটভরানো একাধারে আহার ওষুধ দু-ই।

সৌমেন চায়ের পিয়ালাটি শেষ ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে ব'ললে, মুরারী একটি গ্রামোফোন রেকর্ড বিশেষ, একবার দম দিয়ে ছেড়ে দাও—আর রক্ষা নেই। হ্যাঁ হে—এ্যাতো ব'কতেও পারো তুমি?

হাত কচলিয়ে মুরারী ব'ললে, আজ্ঞে বাবুমশই, ঠিকই বলছো আপনি। আমি একটু বকি বেশী। একে মাথাখারাপ তায় যাত্রা কর্ত্তাম; বকাটা আমার একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। এতো কম বকতে চেষ্টা করি—উঁহু, কিছুতেই না। শোনবার লোক পেয়েছি কি—অমনি আমার বকুনি শুরু হ'লো! তবে যা বকি—কাজের কথাই বকি, বাজে কথার ধার দিয়েও যাইনে।

বিপুল তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব'ললে, তুমি বিয়ে ক'রেছো?

এখনি মুরারীর মুখ থেকে কথার তুবড়ী ছোটার ভয়ে সৌমেন ব'ললে, আঃ কি আরম্ভ ক'রলে বিপুল?

ঈষৎ চাপা গলায় বিপুল ব'ললে, সময় তো কাটাতে হবে! কি হে মুরারী, লজ্জা ক'চ্ছে নাকি?

লাজনম্র কণ্ঠে মুরারী ব'ললে, কি যে বলেন বাবুমশই! আমাকে মেয়ে দেবে কে? বয়স তো কম হ'লো না, শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ক-বে পেরিয়ে গেছে। বিয়ে করা কি আর আমাদের পোষায়, বিয়ে ক'রবে বড়লোকে! বিয়ে ক'রে খাওয়াবো কি?

--কেন, কায়েতের ছেলে তুমি; বিয়েতে তো টাকা পাবে হে?

—কায়েত ব'লে আমার নিজের ভাই-ব্রাদাররাই আমায় মানতে চায় না, বলে—তোর কি জাতের ঠিক আছে, তুই পাগল! আমার নিজের মা তো বহুদিন মরে গেছে। বছর দুই আগে বাড়ী গিয়ে দেখি—বাবাও নেই। সৎ-ভায়েরা আমায় চিনতেই চায় না। চিনবে কেন বাবুমশই, চিনলেই যে বিষয়ের ভাগ দিতে হবে! আমার মায়ের পেটের খোঁড়া বিধবা বোনটা আজও বেঁচে আছে। সে-ই আমায় খাতির-যত্ন ক'রলে, কাঁদলে কাটলে। আহা, বেচারী দুটি ভাতের পিত্যেশে ঝাঁটা লাথি খেয়েও ওদের সংসারে ঝিকে ঝি—চাকরাণীকে চাকরাণী! বোনটার কথা মনে হ'লে আজও আমার চোখে জল আসে, বাবুমশই!

ময়লা পাঞ্জাবীর ছেঁড়া হাতায় মুরারী চোখ দুটো মুছে নিয়ে আরো কি যে ব'লতে যাচ্ছিল, বিপুল তাকে বাধা দিয়ে ব'ললে, Comedyতে শুরু ক'রে তুমি যে tragedyতে এসে প'ড়লে, মুরারী। ছাখো, তোমার দিদিমণিদের কি চাই—না চাই!

উনুনশালের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো মুরারী, ব'ললে, ওকি গো দিদিমণি, এরি মধ্যে যে অর্দ্ধেক কাঠ ফরসা! এত সব রান্না হবে কি ক'রে? ওরে গদাধর, কাটারী আর শাবলটা নিয়ে চল্! শুকনো কাঠ কেটে আনি বন থেকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দু'বোঝা শুকনো কাঠ কেটে নিয়ে মুরারী আর গদাধর ফিরে এলো। কাঠের বোঝা নামাতে নামাতে মুরারী ব'ললে, বাবুমশই! আপনার গদাধর চন্দোর আজ আর একটু হ'লে কেষ্টাকে জবাব দিয়েছিল আর কি! ব্যাটার পরমায়ু আছে, জ্যান্তো কালের মুখ থেকে ফিরে আসা কি যে-সে কথা। পিছন থেকে সাপটা ফণা তুলে ছুটে এসে ছোবল মারে আর কি, দিলুম শাবলটা দিয়ে জোরসে এক ঘা। ব্যস্ বাছাধনের মাথাটি চূর্ণ হ'য়ে একটি ঘায়েই ভবলীলা সাঙ্গ!

—লেবু কোথা পেলে, মুরারী? গীতা জিজ্ঞেস ক'রলে।

গামছার খুঁট থেকে লেবুকটা একটা ডিসের ওপর ঢালতে ঢালতে মুরারী ব'ললে, দিদিমণি! যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি! লেবু না আনার জন্যে বাবুমশই রাগ ক'চ্ছিলো, তাই খোদা বনের মাঝে মিলিয়ে দিলে। কাগজী লেবু—ভারি খোসবাই গো, দিদিমণি!

চাকর-প্রভুতে আজ আর কোন ভেদাভেদ নেই। আজ সকলেই এক সঙ্গে খেতে ব'সলো। সকলকে পরিবেশন ক'রে গীতা আর অঞ্জলীকে ওদেরি সঙ্গে খেতে ব'সতে হ'লো। ওরা ঠিক ক'রেছিল সকলকে খাইয়ে নিজেরা খেতে ব'সবে, কিন্তু ওদের কথা টিকলো না। বাবু থেকে চাকরের পর্য্যন্ত ঘোর আপত্তি। খেতে ব'সে মুরারীর মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না।

মুরারী ব'ললে, আমার বড় ভাগ্য দিদিমণি যে, প্রথম দিনেই তোমাদের বাড়ী ঠাকুরের হাতের রান্না না খেয়ে তোমাদের হাতের রান্না খেতে পেলুম। আহা, একি রান্না! সুধা—সুধা—অমের্ত্ত! যাত্রা-দলের খাওয়ার কথা আজ আমার মনে প'ড়েছে, বাবুমশই!

সৌমেন ব'ললে, ওহে খেতে খেতে বেশী কথা ব'লতে নেই, বিষম লাগলে মুস্কিল হবে!

অগত্যা মুরারীকে মুখ বন্ধ ক'রতে হয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে দুপুর পেরিয়ে গেল।

গদাধর তখন থেকেই থালা, বাসন, ডিস প্রভৃতি মাজা-ধোয়ায় লেগে গেল। দুপুরের ফুরফুরে হাওয়ায় বিপুল গাছের ছায়ায় প'ড়লো ঘুমিয়ে, ভূরি ভোজনে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। গীতা, অঞ্জলী, সৌমেন আর মুরারী বেরুলো বেড়াতে। এধার-ওধার খানিকটা বেড়াবার পর গীতা গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর ব'সলো। মুরারী ওদের কি

একটা আশ্চর্য্য বস্তু দেখাবার জন্য নিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা হ'লো ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য।

গাছে পিঠ দিয়ে গীতা চোখ বুজলো। ফুরফুরে হাওয়ায় চোখ দুটো তার যেন জড়িয়ে আসছে। খাটা-খাটুনি করা তো আর তার অভ্যাস নয়, শরীর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক। চোখের পাতায় তখন তার তন্দ্রা নেমেছে, হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে তার তন্দ্রা টুটে গেল। চোখ চেয়ে দেখে—পাশে তার সৌমেন। এমন নিবিড়ভাবে তার পাশে ব'সে সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা ক'রতে কোনদিন সে সৌমেনকে দেখেনি! প্রথম চমক কাটাবার পর গীতা উঠতে চেষ্টা করে, বাধা দিয়ে সৌমেন বলে, বসো গীতা! কথা আছে!

সৌমেনের মুখে 'গীতা দেবীর' পরিবর্ত্তে 'গীতা' ডাক এই প্রথম। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া গীতার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এমনিভাবে গায়ে গা ঠেকিয়ে পাশাপাশি ব'সে থাকাও তার কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়। সে এক রকম জোর ক'রেই সৌমেনের পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ককণ্ঠে বলে, কি কথা?

সৌমেন পলকবিহীন নেত্রে ওর মুখের দিকে ক্ষণেক চেয়ে থেকে বলে, আমার এই শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্য দায়ী কে জানো? দায়ী তুমি! তুমি কি চাও যে আমার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাক্?

—তার মানে?

—ছলনা ক'রো না, গীতা! তুমি জানো সব—বোঝ সব, তবু তুমি ছলনার দোহাই দিয়ে আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাও! বুকে হাত দিয়ে বল দেখি—তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস কি না?

তীব্রকণ্ঠে গীতা বলে, আপনার এসব কথা আমায় বলার মানে? আপনি ভেবেছেন কি? আপনার এই পাগলামি ক'রতে লজ্জা করে না? বিপুলবাবু আপনার বাল্য বন্ধু, তার সঙ্গে এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা

ক'রতে আপনার বিবেকে বাধে না? অথবা বিবেক ব'লে আপনার মধ্যে কিছুই নেই! ছিঃ—

পথরোধ ক'রে দাঁড়াল সৌমেন, ব'ললে, শুধু ঘৃণাভরে চলে গেলে চলবে না, আমার প্রশ্নের জবাব চাই! আমার এই পতনের জন্য দায়ী কে? তুমি—না আমি? কি, উত্তর দিচ্ছো না যে? আমার কাছ থেকে শুনতে চাও? দায়ী তুমিও নও আর আমিও নই, দায়ী তোমাদের আধুনিক প্রগতির হাব-ভাব, ছলা-কলা, অভিনয় নৈপুণ্য—যা মানুষকে পাগল করে, করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। মিথ্যার ভিতর দিয়ে শূন্য-সততার এমন দাগই এঁকে দাও মানুষের মনে যা ইহজীবনে সহজে মোছে না; দাগের ক্ষত তার উন্মাদনা বাড়িয়েই তোলে। তোমরা সব এক-একটি জীবন্ত আলেয়া!

সৌমেন সোজা পথে না গিয়ে বড় পাথর ডিঙিয়ে, ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম ক'রে উদ্‌ভ্রান্তের মত নীচে নেমে গেল। গীতা কিছুক্ষণ শূন্যমনে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে স্খলিতচরণে ফিরে এলো বিপুলের কাছে। বিপুল তখন তাকিয়ার ওপর কাত হ'য়ে সিগারেট টানছে।

—আমি আর এখানে থাকবো না, বিপুলবাবু! উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ব'লতে ব'লতে গীতা বিপুলের তাকিয়ার এক কোণে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

গীতা প্রথমে কিছুতেই ব'লতে চায়না, শুধু বলে—এখানে থাকা আমার উচিত নয়!

শেষ পর্য্যন্ত সব কিছুই ব্যক্ত হয়। বিপুল স্তব্ধ হ'য়ে শুধু শুনে যায়, কোন উত্তর দেয় না। একটা ক'রে সিগারেট ধরায়—শূন্যদৃষ্টিতে কি যেন ভাবে, সিগারেটটার আধখানা শেষ হ'তে না হ'তেই সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার একটা নূতন ধরায়। পর পর কয়েকটা সিগারেট

ধরিয়ে বিপুল যেন হঠাৎ কি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। পাশে প'ড়ে থাকা পাঞ্জাবীটা গায়ে দিতে দিতে বলে, এসব কথার বিন্দুবিসর্গও অঞ্জুকে জানতে দিওনা! আমি এগোই, তুমি ওদের নিয়ে এস!

—আপনি কোথা যাচ্ছেন? ব'ললে গীতা।

আজ একটা শেষ বোঝা-পড়া কর্ত্তে চাই।

গীতাকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়েই বিপুল ক্ষিপ্রচরণে তার দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল। সৌমেনের সঙ্গে আজ সে এমন বিষয়ের আলোচনা ক'ববে যা' গীতা বা অঞ্জলীর সামনে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সে চায় সৌমেনকে একা। সৌমেন যে তখন বাঙ্‌লোয় না ফিরে অন্য কোথাও যেতে পারে, একথা তার মাথায় এলো না। কিছুদূর পায়ে হেঁটে আসার পর পথে পড়লো একটা ঘোড়ার গাড়ী। বিপুল গাড়ীতে চেপে ব'সলো।

গাড়ী থেকে নামতে নামতে যা' দেখলে তা' সে একদিনের জন্যও কল্পনা করেনি। যা কিছু ব'লবে ব'লে এতক্ষণ সে মনের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা ক'চ্ছিল—সব গুলিয়ে গেল। বাঙ্‌লোর সামনে দাঁড়িয়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ী। সৌমেন হাতে একটা স্যুটকেশ নিয়ে তখন গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছে। গাড়ীর ধারে দাঁড়িয়ে বিপুল ব'ললে, কোথা যাচ্ছো?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সৌমেন ব'ললে তোমাদের এখানে আর আমার থাকা উচিত নয় আর সম্ভবও নয়।

—নিজের সামান্য ভুলের জন্য বা মোহের বশে তুমি চাও আমাদের ভাই-বোন দু'জনের জীবন ব্যর্থ ক'রতে?

—ব্যর্থ! হাঃ হাঃ হাঃ –! পাগলের হাসি হাসতে হাসতে সৌমেন গাড়োয়ানকে গাড়ী ছাড়তে নির্দ্দেশ দিলে।

বিপুল টলতে টলতে এসে বারাণ্ডায়-পাতা ইজি চেয়ারটায় এলিয়ে প'ড়লো।

দিন কয়েক হ'লো ওরা কোলকাতায় ফিরেছে।

সরকারমশাই নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ীর ভিতরের সব কিছু দেখা-শোনার ভার মুরারী নিজেই নিয়েছে। মুরারীর আকস্মিক আগমনে গদাধরের সত্যই একটু মুস্কিল হ'য়েছে। মুরারীর চোখে কাজকর্ম্মে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। তা ছাড়া, দিদিমণি আর দাদাবাবুকে সে এরি মধ্যে হাতের মুঠোয় ক'রে নিয়েছে। কোন কাজেই লোকটার ভয়-ডর নেই। ভয়-ডরই বা থাকবে কেন, ওকি গদাধরের মত বাঁধা মাইনের চাকর! লোকটা পাগল হোক আর যাই হোক, ভারি পরোপকারী। দু'টাকা মাইনে ও-ই তো বাড়িয়ে দিলে দিদিমণিকে ব'লে। খোসামোদ ক'রেও গদাধর দেখেছে, বিশেষ সুবিধা হয়নি; ভারি স্পষ্টবক্তা লোক মুরারী! মোট কথা, মুরারীর অবস্থিতি গদাধর বিশেষ সুনজরে দেখতে পারলে না।

গদাধর সেদিন মুখফুটে ব'লেই ফেললে, তুমি কবে যাত্রা ক'রতে যা বে, মুরারীদা?

চোখ পিট্ পিট্ ক'রে মুরারী ব'ললে, তোর ব্যথা কোথা তা' আমি বুঝি গদাধর, কিন্তু তোর 'জগড়নাথ মহাপ্রভুড়' ইচ্ছা নয় যে, আমি এখন এবাড়ী থেকে অন্য কোথাও যাই। তোর উপরি পাওনা-গণ্ডার কি বড্ডই অসুবিধা হ'চ্ছে, গদাধর?

গদাধর ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—বলি, বাজার চুরির কি মোটেই সুবিধা হ'চ্ছেনা, ধনমণি?

গদাধর কাষ্টহাসি হাসে।

—চুরি না ক'রে চেয়ে নিলেই পারিস! বল—রোজ তোর ক'পয়সা ক'রে গুণ্ডি লাগে বল্? চার পয়সা? বেশ, তুই আমার কাছ থেকে চারটে ক'রেই পয়সা নিস। দ্যাখ্, তুই ব্যাটা উড়ে কিনা—নজরটা

বেজায় ছোট। অমন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ ক'রিস কেন? মারবি তো লাখ দু'লাখ, নচেৎ নয়! কি ব'লিস?

ঘাড় নেড়ে গদাধর মুরারীকে সমর্থন করে। আর কোন কথা না ব'লে মুরারী তাকে গামছা দিয়ে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধে। গদাধর ভাবে, মুরারীদা তার সঙ্গে ঠাট্টা ক'চ্ছে। এরি মধ্যে মুরারীর মুখের চেহারা বদলে গেছে। গদাধর কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

রোষকষায়িত নেত্রে মুরারী ব'ললে, প্রথমে তোকে নিয়ে যাবো দিদিমণির কছে, তারপর যাবো থানায়! তুই ব্যাটা যার খাবি তারই ক'রবি সর্ব্বনাশ!

—কেন মুই, তো কিছুই করিনি? ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয় গদাধর।

—তোর মনের ভাব যা—বাগে পেলে তুই ব্যাটা মনিবের সর্ব্বনাশ ক'রে ছাড়বি।

—ওসব কথা তো মুই ঠাট্টা ক'রে বলনু! সত্যি কি আমি চুরি ক'রবো?

গদাধর সত্যই একটু বোকা। সেদিন অনেক দিব্যি-দিলেসা ক'রবার পর মুরারী তাকে ছেড়ে দিলে তার চাকরীর সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে। মুক্তি পেয়ে গদাধর তাকে এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়ালে। খুসী হ'য়ে মুরারী ব'ললে, দ্যাখ্ গদাধর! মনিবকে বাঁচিয়ে কাজ ক'রবি। তোর প্রভু জগন্নাথ তবেই হবে তোর উপর প্রসন্ন। শোন্, আমি এ্যাদ্দিন চ'লেই যেতুম, কিন্তু বাড়ীর মনমরা ভাব ঐ সৌমেনবাবু—ছোটবাবু চলে যাবার পর থেকে। কারুই মনে সুখ নেই, কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব। এ অবস্থায় তোদের হাতে সংসার ছেড়ে যাই কেমন ক'রে বল দেখি? অথচ ব্যাপারটা আমি মোটেই বুঝতে পাচ্ছিনে।

গদাধর এপাশ ওপাশ চেয়ে অতি সঙ্গোপনে কি সব ফিস্ ফিস্ ক'রে

মুরারীকে ব'ললে এবং বিশেষভাবে তাকে নিষেধ ক'রলে—সে সব কথা বাইরে কারুর কাছে প্রকাশ ক'রতে। সবকিছু শুনে কেমন যেন উদাসনয়নে মুরারী ওর মুখের দিকে 'চেয়ে রইলো, একটি কথাও আর ব'ললে না।

পিসীমার আর যেন দেরী সইছে না। তিনি এই আষাঢ়েই চান ওদের চার হাতকে এক ক'রে দিতে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে কেমন যেন ভাল মনে হ'চ্ছেনা। সবকিছুই যখন ঠিক তখন বিয়েটা বাকি থাকা তো ঠিক নয়। নাই থাক কোলকাতায় সমাজ, তবু সেকেলে লোকের চোখের সামনে এদের এই অবাদ মেলামেশা সত্যই ঠেকে বিসদৃশ। পাড়ার লোকেও তো পাঁচ কথা ব'লতে পারে আড়ালে। বিয়েই যখন হবে তখন কি দরকার এসব অনুত্থাপিত অবান্তর প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনায়! আর এক কথা, বিপুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু সৌমেন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত হীন ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করেন। এ তো গেল ওপক্ষের কথা। এ পক্ষের অঞ্জলীরও ঐ একই মত। এই আষাঢ়েই সে দাদার বিয়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। তার দিক থেকে অনুরোধ-উপরোধ ও ঐকান্তিকতার অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে সে দিন দুই গিয়ে গীতার পিসিমার সঙ্গে দাদার বিয়ের সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ ক'রে পিসীমাকে খুব সম্ভব তৎপর হ'তেই ব'লে এসেছে।

গীতা আর বিপুলের ইচ্ছা কিন্তু অন্য রকম। তারা চায় অঞ্জলীকে প্রস্তুত হবার অবসর দিতে। সৌমেনের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে কত বড় আঘাত যে অঞ্জলী পেয়েছে তা জানেন একমাত্র অন্তর্যামী! একদিন না একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সৌমেন অনুতপ্ত হৃদয়ে নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে। বিনা দোষে অঞ্জলীর ওপর যে নিদারুণ

অবিচার সে ক'রে গেল তার জন্য হবে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। একান্তই সে যদি ফিরে না আসে আর অঞ্জলীর মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তার পছন্দ মত যে-কোন উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

সৌমেনকে অঞ্জলী ভালবাসে আর সে ভালবাসা দু'দিনের চোখের নেশা নয় যে চট্ ক'রে অতি সহজে কেটে যাবে! অথচ তাদের সেই চেষ্টাই ক'রতে হবে অতি সন্তর্পণে—অঞ্জলীকে বুঝতে না দিয়ে। আর সে চেষ্টা—সময়সাপেক্ষ! কিন্তু পিসীমা আর অঞ্জলী সময় ক্ষেপণ ক'রতে একান্ত নাবাজ। পিসীমার তৎপর হওয়ার কারণ থাকতে পারে কিন্তু অঞ্জলীর এই তৎপরতার কারণ কি? বর্ত্তমানে সংসারের আভ্যন্তরিক সব দায়-দফা তাকেই পোহাতে হয়, তাই সে কি চায় গীতাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তার ওপর সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে অবসর গ্রহণ ক'রতে! সত্যই যদি তাই মনোগত ভাব হয় তবে তা' মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এখন বরং পাঁচ কাজের মধ্যে নিজেকে সে নিয়োজিত রেখে অন্যমনস্ক থাকে। কিন্তু তখন? তখন হবে তার অখণ্ড অবসর।

অন্য দিকটাও দেখতে হয়! অঞ্জলীর চাই এখন একজন অতি আপনার অন্তরঙ্গ সাথি। মেয়েছেলেই পারে মেয়েছেলের মনের কথা খুলে ধ'রতে, তার মনের গতি পরিবর্ত্তিত ক'রতে। এত বড় বাড়ীখানার মধ্যে একা অঞ্জলী, সঙ্গীবিহীন ফাঁকা বাড়ীর আবহাওয়াই তো মানুষকে ভাবুক ক'রে তোলে! নাঃ, এ সময় অঞ্জলীকে একা রাখা ঠিক নয়। এমত অবস্থায় গীতাকে এনে রাখা ছাড়া অন্য কোন সহজ উপায় আছে ব'লে তো মনে হয় না।

গীতার এখানে এসে ধারাবাহিক ভাবে থাকাটা শুধু পিসীমা কেন—এবার অনেকের চোখেই যদি দৃষ্টিকটু ঠেকে তবে তাদের দোষ দেবার

বিশেষ কিছু নেই। অবিবাহিতা যুবক-যুবতীর দিকে সবারই থাকে একটা সহজাত সদাই জাগ্রত খরদৃষ্টি, তা' সে পল্লীগ্রামই কে জানে আর সহরই কে জানে!······গীতা আর বিপুলের সম্মতিতেই বিয়ের তারিখ ধার্য্য হয়।

সাত

মাত্র মাসখানেকের মধ্যেই নানাস্থানে ঘুরে ক্লান্তদেহে ও শ্রান্ত-মনে সৌমেন ফিরে এলো কোলকাতায়। সহরতলীর একাংশে একখানি ছোট ঘর ভাড়া ক'রলে। সারাদিন উদ্দেশ্যবিহীন হ'য়ে পাগলের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কোন দিন হোটেলে ঢুকে কিছু খায় আবার কোন দিন নিছক উপোস দিয়েই সারাদিন কাটিয়ে দেয়। পাইস-হোটেলে সেদিন খেতে ঢুকে সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। উঃ, এভাবে উদরপুর্ত্তি ক'রেও লোকের বাঁচতে সাধ যায়!

পাশাপাশি দু'খানি ঘর, একখানি দরজার ওপর খড়ি দিয়ে লেখা—'ব্রাহ্মণদিগের জন্য', পাশেরখানির দরজার ওপর লেখা 'শূদ্রদিগের জন্য; অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের জন্য। জাতি হিসাবে সৌমেন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র; সুতরাং দু'নম্বর ঘরেই তার স্থান সংগ্রহ করা উচিত। কিন্তু সেখানে হ'য়েছে শূদ্রপর্য্যায়ভুক্ত সর্ব্বজাতির সমন্বয়, কয়লাওয়ালা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, এ-আর-পি, মুদী, জেলে প্রভৃতি। তাদের বাহ্যিক পোষাক ও আলাপ-আলোচনাই তাদের পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। ওদিকে এক নম্বর ঘরে উপবীতধারী এক ব্রাহ্মণপুঙ্গব প্রতি মিনিটে বার তিনেক ক'রে হাঁচতে হাঁচতে অন্নের গ্রাস গলাধঃকরণ ক'চ্ছেন। তার দু'পাশের দু'খানি ক'রে আসন বাদ দিয়ে অন্য ব্রাহ্মণসন্তানগণ অম্লানবদনে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন ক'চ্ছেন। চারিদিক এত অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন যে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে। সৌমেন না খেয়েই বেরিয়ে এলো।

খেয়ালের মাথায় সেদিন সন্ধ্যার পর সৌমেন গেল গীতাদের বাড়ীর দিকে। গীতাদের বাড়ীর সামনে অর্দ্ধসমাপ্ত প্রকাণ্ড ম্যারাপ। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে সৌমেন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ফিরে এলো।

গীতাকে পাবার যে ক্ষীণতম আশাটুকু সে মনের মাঝে আজও পোষণ করে, সেটুকুও নিঃশেষে মুছে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। বিচার-বুদ্ধি এবং বিবেকের সাহায্যে সে নিজের বাসনাকে বিশ্লেষণ করে না, সে চায় শুধু তার উন্মত্ত বাসনার পরিতৃপ্তি। ন্যায়-অন্যায়ের যুক্তিতর্ক ভেসে যায় তার কামনার প্লাবনে।

গীতার কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অঞ্জলীর মুখ। মনটা তার ভ'রে ওঠে তিক্ততায়। অঞ্জলী! অঞ্জলী!! ঐ তো তার চাওয়া-পাওয়ার মাঝে একমাত্র বিঘ্ন! নইলে গীতার করুণা বিপুল লাভ ক'রতে পারে, সৌমেন পারে না? বিপুলের তুলনায় সে কিসে ছোট, কিসে হীন? বিদ্যা, বুদ্ধি, সুচেহারা—নারীর কাম্য সব কিছুরই সে অধিকারী; তবে কেন এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে বিপুল! একমাত্র অন্তরায়—অঞ্জলী! অঞ্জলীর কথা ভাবতেও তার মন কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। শুধু অঞ্জলীই বা কেন, তার দাদা বিপুলকেই বা রেহাই দেওয়া যায় কোন্ কৈফিয়তের দোহাই দিয়ে! ওরা দু'ই ভাই-বোনই সৌমেনের পথের কাঁটা! ওরা চক্রান্ত ক'রেছে যে, কিছুতেই সৌমেনের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত' হ'তে দেবে না।

এমনিভাবে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অদ্ভুত প্রলাপের মধ্য দিয়ে সৌমেনের কেটে যায় সারাটি রাত।

ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

আজ ক'দিন হ'লো সৌমেন এসেছে। বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটেদের

সঙ্গে তার কোন বিষয়েই খাপ খায় না। লোকটা যেন কেমন সৃষ্টিছাড়া, প্রকৃতিটা ছন্নছাড়া, বেখাপ্পা, ভবঘুরে। তাকে নিয়ে বাড়ীর লোকে এরি মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু ক'রছে। যত দিন যায় বাসীন্দাদের আগ্রহ ও আলোচনার মাত্রা বেড়েই চলে। কত কথাই না তাকে ঘিরে হয়। কেউ বলে, বেকার কিনা তাই না আছে খাওয়ার ঠিক আর না আছে নাওয়ার ঠিক। বাড়ীতে বোধ হয় পোষ্য অনেক, তাই বেচারীর 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের' অবস্থা, কাজ-কর্ম্মের চেষ্টাতেই ফেরে! কারো মতে, সৌমেন একজন ছদ্মবেশী সন্ত্রাসবাদী একলা একখানা ঘর নিয়ে বোমাটোমা তৈরী ক'চ্ছে বা করার মতলবে আছে। ওধরণের লোকের মনের জোর ভয়ানক, সাঙ্ঘাতিক। ওরা শুধু কাজ নিয়েই থাকে, কথা বলে খুব কম। সরকার বাহাদুরের ওরা জীবন্ত যম, ওদের জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য ; ওরা মৃত্যুকে ডরায় না, হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে উঠে ফাঁসীর দড়ি নিজের গলায় হাসতে হাসতে পরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ ভয় করে, ভক্তিসহকারে থাকে দূরে স,রে কেউ বা বলে, সৌমেম একটা খুনে! অথবা স্বদেশী ডাকাতীর পলাতক আসামী। সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে এখানে আছে আত্মগোপন ক'রে। এ ধরণের লোককে প্রশ্রয় দেওয়া যে-কোন বুদ্ধিমান লোকের উচিত নয়। এদের সংশ্রবে থাকায় বিপদ আছে। আবার কেউবা সংক্ষেপে মন্তব্য করে, লোকটার মাথা খারাপ।

সারাদিনের পর সন্ধ্যায় সৌমেন যখন ঘরে ঢুকলো তখন তার আর এক মূর্ত্তি। সে যেন সত্য সত্যই পাগল হ'য়ে গেছে। সারা ঘরময় সে উন্মাদের মত ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে চেয়ারে ব'সে মাথার দীর্ঘ কেশ দু'হাত দিয়ে টানতে লাগলো। অদ্ভুত, ভয়াবহ মূর্ত্তি সৌমেনের ; চক্ষু রক্তবর্ণ ; ওষ্ঠ কম্পিত, অন্তর-দ্বন্দ্বের ছায়া মুখের ওপর পরিস্ফুট।

তার সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে যেন বহে গেছে কালবৈশাখীর ঝড়, ঝড়ের তাণ্ডব নর্ত্তন।

বেশ কিছুক্ষণের পর সৌমেন উঠে আলোর স্থইচটা টিপে দিয়ে তক্তোপোষের নীচে থেকে বার ক'রলে মদের বোতল আর গ্লাস। এক বোতল শেষ ক'রে বার ক'রলে আর এক বোতল। উপর্য্যুপরি কয়েক গ্লাস খেয়ে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারটা টান দিয়ে নিলে টেবিলের ওপর। তারপর অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ক্যালেণ্ডারখানার ওপর চোখ বুলিয়ে মদের বোতলের কর্ক খোলা স্ক্রু দিয়ে একটা তারিখ গোল ক'রে ক্রুদ্ধ কঠিন হস্তে দাগ দিতে দিতে অট্টহাস্য ক'রে উঠলো সৌমেন, বললে, আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সুখের সংসার পাতবে বিপুল! হাঃ হাঃ হাঃ—

মদ খেতে খেতে প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললে সৌমেন। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো কালান্তক বিভীষিকা।............ঘুমন্ত সর্প জাগ্রত হ'য়ে ক'রলে তার ক্রুদ্ধফণা বিস্তার, সামনে যা পেলে তারই ওপর আঘাতের পর আঘাত ক'রে নিষ্ফল আক্রোশে ঢেলে দিলে বিষ—তীব্র মারাত্মক বিষ।............হিংস্র ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের রোষ-কম্পিত গর্জ্জন, তারপর নির্ম্মম পাশবিক হত্যাকাণ্ড।............নেমে এলো প্রলয়ের ঘন কৃষ্ণ কুজ্ঝটিকা, শুরু হ'লো মহাপ্রলয়ের সর্ব্বধ্বংসী তাণ্ডব নর্ত্তন! সৌমেনের জলন্ত চোখের সামনে জেগে উঠলো হত্যা-বিভীষিকা। তার হাতের ক্ষুদ্র স্ক্রু লক্ লক্ লেলিহান রক্তপিপাসু ছুরিকায় পরিণত হ'য়ে আমূল বিদ্ধ হ'লো একটি তরুণীর বুকে—সে আর কেউ নয়, গীতা!

ক্যালেণ্ডারে গীতার বিয়ের তারিখটার ওপর বার বার স্ক্রু দিয়ে আঘাত ক'রতে ক'রতে রক্তচক্ষে, কম্পিত কলেবরে দাঁতে দাঁত চেপে সৌমেন ব'ললে, হ্যাঁ—হত্যা, হত্যা!

আট

রাত প্রায় দু'টো বা আরও বেশী।

বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের কলরব অনেকক্ষণ থেমে গেছে। বাইরে চাকর-দরওয়ানদের কথার আওয়াজও আর কানে আসছে না, প্রায় সকলেই অচেতন। উৎসব-মুখরিত রজনীর বাড়তি আলো অনেক-গুলোই নিবিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। কিছুক্ষণ আগে পিসীমার একবার গলার সাড়া পাওয়া গেছলো। শুতে যাবার আগে তিনি বোধ হয় সমস্ত কিছুর তদারকে বেরিয়েছিলেন! সারা বাড়ীখানা নিঝুম, নিস্তব্ধ। কে ব'লবে যে হাজার লোকের পদধূলি প'ড়েছিল এই বাড়ীতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, কে বলবে—এটা বিয়ে বাড়ী! বার বাড়ীতে হ'য়তো এখনো আনেকেই জেগে—কে জানে ?

সন্ধ্যা থেকেই আকাশটা গুম হ'য়ে ছিল, বাতাস ছিল না মোটে। আকাশে আজ একটা তারাও দেখা যায়নি। অনেকেই অনুমান ক'রেছিল যে প্রকৃতির এই বিরাট নিস্তব্ধতা বৃথা যাবে না। ঝড় এবং জল দুই এক সঙ্গে আসার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে। অনুমান মিথ্যা হ'লো না, হ'লোও তাই! রাতের তৃতীয় প্রহরে দিক্‌দিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে নেমে এলো ঝড়, জল আর আকাশের বুকচিরে বজ্র। ঝল্‌সানো বিদ্যুৎ দীপ্তিতে ঘুমন্ত কলিকাতা নগরী ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত। ঝড়ের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন ও বৃষ্টিপাতের বিরামবিহীন একটানা সুর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

বিয়ের বাসর বহুক্ষণ ভেঙে গেছে। বাসরঘরে শুধু বর আর বধূ ব'সে ব'সে গল্প ক'চ্ছে। আজকের রাত—স্মরণীয় রাত! এ রাতে চোখের পাতায় ঘুম কি সহজে নামে! বিপুল গল্প ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে প'ড়লো। বাদল রাতের বৃষ্টিধারার মিষ্টি মধুর ছন্দে গীতার

চোখেও তন্দ্রা নামে। বিপুলের সাড়া না পেয়ে গীতা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো পলকবিহীননেত্রে। নিদ্রালস চোখে আনন্দবিহ্বলা তন্বী বেড-সুইচ টিপে বড় আলোটা নিবিয়ে দিলে। ঘুমন্ত জীবন-সাথীর মুখের ওপর এসে-পড়া চুলগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে তারই পাশে শুয়ে প'ড়লো।

* * * * *

কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গরাখার আবরণে আপাদমস্তক আবৃত এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি ধীরে—অতি-ধীরে দ্বিতলের বাসরঘরে প্রবিষ্ট হ'লো। ক্রূর চোখে গীতাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে সে ক্ষিপ্রহস্তে বেড-সুইচ নিবিয়ে। টর্চের আলোয় চোখের পলকে দিলে আগন্তুক তার ছুরিকাখানি গীতার বক্ষে আমূল বসিয়ে। গীতার মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীর মুখের ওপর ফুটে উঠলো আতঙ্ক, অনুশোচনা ও অনুতাপের করুণ ছায়া।

প্রভাতের অস্পষ্ট আলোয় ঘরখানি ঐ শবের মুখের চেয়েও ম্লান।

ঘরের ভিতরের তদন্ত সেরে প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী বাইরের বারাণ্ডায় এসে ব'সলেন। তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে গীতার আপাদ-মস্তক আবার চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'লো। বারাণ্ডায় আর তিল ধারণের জায়গা রইলো না—সার্জ্জেণ্ট, পুলিশ ও বাড়ীর অন্যান্য লোকজনে ভ'রে গেল।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী বিপুলকে প্রশ্ন ক'রলেন, আপনার ঘুম ভাঙলো কখন?

হতাশায় বিহ্বল বিপুল বিবর্ণ মুখে ব'ললে, রাত তখন তিনটে বা তারও বেশী, ঘড়ি দেখিনি।

—হঠাৎ আপনার ঘুম ভাঙলো?

—হ্যাঁ হঠাৎই। গীতার আর্ত্তনাদে—

আর ব'লতে পারলে না বিপুল, কণ্ঠ তার রুদ্ধ হ'লো। মুখে রুমাল চেপে ধ'রে সে উদ্গত অশ্রু অতি কষ্টে রোধ ক'রলে।

—জেগে আপনি কি দেখলেন?

সামলে নিয়ে বিপুল ব'ললে, ঘর অন্ধকার। মনে হ'লো, কে যেন ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম। তারপর—তারপর—

আশ্বাস দেন পুলিশ কর্ম্মচারী, আপনার মত লোকের ধৈর্য্যহারা হওয়া উচিত নয়, বিপুলবাবু। It is a simple case! আসামী গ্রেপ্তার করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। শুনুন! এই রক্তমাখা রুমালখানা যে আপনার বন্ধু সৌমেনবাবুর—একথা আপনি কেমন ক'রে জানলেন?

—ওখানা বড়দিনের সময় আমার ভগ্নী অঞ্জলী প্রেজেণ্ট ক'রেছিল সৌমেনকে।

গম্ভীর হ'য়ে পুলিশ কর্ম্মচারী কিছুক্ষণ হেঁটমুণ্ডে মাথায় পেনসিল ঠুকে ঠুকে কি যেন চিন্তা ক'রলেন, তারপর টেনে টেনে ব'ললেন, গীতা দেবীকে মাঝখানে রেখে আপনাদের দু'বন্ধুর মধ্যে যে tug of war চ'লেছিল তাতে একরম একটা কিছুই ঘটা স্বাভাবিক। সমস্ত কিছু শুনে অবশ্য মনে হয় যে সৌমেনবাবুই হত্যাকারী। আচ্ছা, আমি যদি বলি বিপুলবাবু যে—ও রুমালখানা আপনার কাছে ছিল?

প্রাণহীন ক্ষীণ হাসি হেসে বিপুল ব'ললে, অর্থাৎ আমিই খুন ক'রেছি! কিন্তু দেয়ালের গায়ে ঐ যে রক্তমাখা হাতের ছাপ?

—বেশ! ও ছাপ যদি আপনার না হ'য়ে অন্যের হয় তবে আপনিই নিন না বিপুলবাবু আততায়ীর সন্ধানের ভার? আপনার পক্ষে সেটা যতটা সহজসাধ্য হবে—

হঠাৎ নীচে শোনা গেল একটা হৈ-চৈ ব্যাপার। গদাধরের গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলো মুরারী। সকলে স্তম্ভিত, ব্যাপারটা জানবার জন্য সকলেই হ'য়ে উঠলেন কৌতূহলী।

মুরারী ব'ললে, একে সব কিছু জিজ্ঞাসা কর, দারোগাসাহেব! আসল ব্যাপার বেরিয়ে প'ড়বে! সব ঠিকঠাক বল্ গদা, রেহাই পাবি; নইলে তোরই ফাঁসি নির্ঘাত!

পুলিশ কর্ম্মচারীর এক ধমকে গদাধরের প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়। ভয়ে তার মুখে কথা সরে না। সত্যি কথা ব'ললে, নিষ্কৃতি পাবার আশ্বাস পেয়ে গদাধর কম্পিতকণ্ঠে অশ্রুসজল চোখে যা' ব'ললে, তার সারমর্ম্ম হ'চ্ছে এই:—গতরাত্রে প্রায় দেড়টার সময় ঝড়-জলের আগে সে যখন এ বাড়ী থেকে তার মনিবের বাড়ী যাবে ব'লে বেরুচ্ছে তখন গেটের অদূরে সৌমেনের সঙ্গে তার আকস্মিক দেখা। প্রথমটা সে চিনতে পারেনি, সৌমেন এসেছিল মত্ত অবস্থায়। সৌমেন তার হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট (দারোগার সামনে গদাধর নোট দু'খানা তার গেঁজিয়ার ভিতর থেকে বার ক'রে দিলে) দিয়ে সব খবর জেনে নেয়। বাড়ীর পিছন দিকে যে লোহার ঘুরানো সিঁড়িটা আছে সেটার অবস্থিতি ঠিক বাসরঘরের পাশেই। ঐ সিঁড়ির দরজাটা সৌমেনের নির্দ্দেশে সে এসে খুলে দেয়। সৌমেন বলে যে, বিপুলের সঙ্গে অন্যের অজ্ঞাতে আজই রাত্রে তার দেখা করা চাই। সৌমেন সম্বন্ধে কারুর কাছে, এমন কি, বিপুলের কাছে পর্য্যন্ত কোন কথা ব'লতে সে নিষেধ করে। দরজা খুলে দিয়ে মনিবের বাড়ী ফেরার আর সে অবসর পায়নি, ঝড়-জল এসে পড়ে!

গদাধরের কাছ থেকে আরো কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কারের প্রলোভনে পুলিশ কর্ম্মচারী তাকে থানায় নিয়ে গেলেন। যথারীতি গীতার মৃত-দেহ মর্গে চালান দেওয়া হ'লো।

হস্তরেখা বিশারদের দ্বারা অতি শীঘ্র প্রমাণ হ'য়ে গেল যে, ঐ রক্ত-মাখা হাতের ছাপ আর যার হোক—বিপুলের নয়।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে খুনীর সন্ধানের ভার বিপুলই গ্রহণ করে। গীতাকে হত্যা ক'রে সৌমেন ব্যর্থ ক'রেছে বিপুলের জীবন, ব্যর্থ ক'রেছে অঞ্জলীর জীবন। তার ক্ষমা? অসম্ভব! সৌমেনকে সে কিছুতেই ক্ষমা ক'রবে না। হত্যাকারী যে সৌমেন—এ বিষয়ে আর যার সন্দেহ থাক, বিপুলের নেই। যেমন ক'রেই হোক পাপীর শাস্তি বিধান সে ক'রবেই। যতদিন বাঁচবে ততদিন সে ফিরবে সৌমেনের পিছনে, প্রতিহিংসা গ্রহণ করাই হ'লো তার জীবনের ব্রত। অঞ্জলী? অঞ্জলী নিশ্চয় হবে তার দাদার সহায়ক ও কাজের সমর্থক! ভালবাসার দোহাই দিয়ে আর সে কিছুতেই চাইতে পারে না সৌমেনের জীবন, তার মুক্তি। গীতাকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য সৌমেন নিশ্চয়ই হারিয়েছে অঞ্জলীর অকৃত্রিম ভালবাসা। বিপুলের বোন কি ভালবাসার দোহাই দিয়ে একটা খুনীর পায়ে আত্ম-বলিদান দিতে পারে? ধরার ভার লাঘব করার জন্য সৌমেনের মৃত্যু অনিবার্য্য।

যা ছিল সখ আজ তাই হ'লো তার জীবনের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। সখের গোয়েন্দা বিপুল ঘটনা-বৈচিত্র্যে আজ বাধ্য হ'লো সত্যিকারের গোয়েন্দা সাজতে।

নয়

মাসখানেক পরের কথা। রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটা; মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, *টিপ্ টিপ্* ক'রে বৃষ্টি প'ড়ছে। সহরের শেষ প্রান্তে একটি মাঝারি রকমের রেঁস্তোরা। সৌমেন একটি কোণে ব'সে চা পান ক'চ্ছিল। হঠাৎ তা'র লক্ষ্য প'ড়লো বিপুলের উপর। চা খাবার

ছলে সে যেন কাকে খুঁজছে, হাতে চায়ের কাপ, দৃষ্টি কিন্তু ফিরছে সারা রেঁস্তোরাময় যেন কারুর সন্ধানে। অর্দ্ধ সমাপ্ত চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ত্রস্তে পাশের দরজা দিয়ে সৌমেন পথে নেমে এলো। ক্ষিপ্রপদে বেশ কিছুদূর রাতের অন্ধকারে পথ চ'লবার পর একটা পার্কের কোণে সে থম্‌কে দাঁড়ালো। পকেট হাতড়ে বার করলে একটা বিড়ি, ওপাশের বিড়ির দোকানের জ্বলন্ত দড়িটায় ধরিয়ে নিয়ে আবার পথ চ'লতে স্থরু ক'রলে।

সৌমেনকে হঠাৎ দেখলে চেনা কষ্টকর। সে চেহারা আর নেই। মাথায় লম্বা রুখু চুলের রাশ, চোয়াল ছুটো উঠে প'ড়েছে, একমুখ দাড়ি-গোঁফ। চক্ষু তা'র কোটরস্থ, দেহ শীর্ণ। পরণের জামা কাপড় মলিনাদপি মলিন, শতছিন্ন। ভাবটা তার সদাই সন্ত্রস্ত নয়, কেমন যেন অন্যমনস্ক!

গঙ্গার ধার দিয়ে সৌমেন চ'লেছে। শবদাহ ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে, তারপর ঢুকলো শ্মশানে। জ্বলন্ত চিতার দিকে নিজের মনে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সৌমেন। কতক্ষণ পরে শ্মশান থেকে বেরিয়ে আবার গঙ্গার ধারের পথ বেয়ে চ'ললো আনমনে।

হরিনাম সংকীর্ত্তন সহকারে বিপরীত দিক থেকে শব নিয়ে একদল শোভাযাত্রী সৌমেনের কাছাকাছি এসে প'ড়লো। শোভাযাত্রার সম্মুখ ভাগে একটি হৃষ্টপুষ্ট লোক ধামা থেকে খৈ আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চ'লেছে। শোভাযাত্রার সামনে একদল অগ্রগামী ভিক্ষুক পয়সা কুড়োতে কুড়োতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে এগিয়ে আসছিল। দূর থেকে সৌমেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, শববাহীর দল ক্রমশঃ নিকট হ'তে নিকটতর হ'য়ে এলো। নিক্ষিপ্ত একটি পয়সা এসে প'ড়লো সৌমেনের ঠিক পায়ের কাছে, পয়সাটা সে কুড়িয়ে নিতে যাবে এমন সময় একটি জোয়ান ভিখারী এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো তার ওপর।

সৌমেনও কিছুতে ছাড়বে না পয়সাটি আর সে লোকটিও নাছোড়বান্দা, কেড়ে নেবে তবে ছাড়বে। কাড়াকাড়ি মারামারিতে পরিণত হ'তে মোটেই বিলম্ব হ'লো না। একটি ঘুষিতে সৌমেনকে ধরাশায়ী ক'রে সে পয়সাটি ছিনিয়ে নিয়ে স'রে প'ড়লো।

শোভাযাত্রা তখন বেশ খানিকটা দূরে এগিয়ে গেছে। সৌমেন ধীরে ধীরে পথের ওপর উঠে ব'সলো। মাথাটা তার তখনও ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছে, কাঁকরে হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত; নাকটা ফুলে উঠেছে। পাশেই প'ড়েছিল একটা কাঠের গুঁড়ি, গুঁড়িটার উপর ঠেসান দিয়ে সৌমেন ব'সে রইলো। শরীরটা কিছু সুস্থ হ'লে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নেমে গেল গঙ্গার ধারে। মাথায় মুখে জল দিয়ে আঁচলা ক'রে জল খেতে গেল। আঁচলা ভর্ত্তি জলের ওপর ভেসে উঠলো একজনের অতি-পরিচিত একখানি পাণ্ডুর মুখচ্ছবি, সে মুখ অঞ্জলীর। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার জল গঙ্গাতেই মিশে গেল। একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে অশ্রুসজল চোখে গঙ্গার ধার থেকে উঠে এলো সৌমেন। সৌমেনের অন্তরাত্মা ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো, নিজের মনে অস্ফুটকণ্ঠে সে ব'ললে, উঃ কি ক'রেছি! কি ক'রেছি!!

গভীর রাত্রি। কচিৎ দু'একজন লোক পথ দিয়ে বাড়ীর দিকে ঈষৎ ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই হেঁটে যাচ্ছে। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি ঝরার এখনো বিরাম নেই। মাঝে মাঝে উড়ে আসছে এক-একটা দমকা, এলোমেলো পাগলা হাওয়া। সৌমেন পথ বেয়ে চ'লেছে।

ফুটপাথে-রক্ষিত জলাধার হ'তে গাড়োয়ান ঘোড়াকে জল পান করাচ্ছিলো। সৌমেন এসে ক্ষণেক দাঁড়ালো, ঘোড়াকে জল খেতে দেখে তার ঘুমন্ত, দুরন্ত তৃষ্ণা হঠাৎ জেগে উঠলো। তৃষ্ণায় তখন তার বুঝি বা বুকের ছাতি ফেটে যায়! ঘোড়ার সঙ্গে একই জলাধার হ'তে সে আঁচলা ক'রে জল পান ক'রে নিঃশব্দে এক দিকে চলে গেল।

রেঁস্তোরায় ঢোকবার আগে থেকেই বিপুল আজ সৌমেনের পিছু নিয়েছে। গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত তার পিছনে এসে শ্মশানঘাটের কাছাকাছি সৌমেন হঠাৎ তার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে পড়ে। আশপাশে সৌমেনের সন্ধানেই সে এতক্ষণ ফিরছিলো।

পশ্বাদির জন্য রক্ষিত জলাধার হ'তে একটা মানুষকে জল খেতে দূর থেকে দেখে বিপুলের কেমন সন্দেহ হয়। বিপুল একটা পর্দা ফেলে রিকসায় চ'ড়ে সৌমেনের পশ্চাতে ধাবমান হ'লো। সৌমেনও চ'লেছে—পিছনে পিছনে বেশ একটু তফাতে একখানা পর্দা-ফেলা রিকসাও আসছে। বার বার লক্ষ্য ক'রে সৌমেনের কেমন সন্দেহ হ'লো, সে পাশের বস্তির সরু অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ঢুকে প'ড়লো। শিকার হাতছাড়া হয় দেখে বিপুল তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে প'ড়লো রিকসা থেকে এবং ক্ষিপ্রপদে সে-ও বস্তির মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বিপুল একা বেরিয়ে এলো ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে। ক্লান্ত শরীরে, শ্রান্ত মনে বিপুল রিকসায় উঠে বাড়ীর পথেই ফিরলো।

বস্তির অলি-গলি অতিক্রম ক'রে প্রায় মাতালের মত টলতে টলতে সৌমেন এসে হাজির হ'লো বস্তির মধ্যস্থিত একটি খোলা প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণে সেদিন বস্তির নীচ জাতীয় বাসিন্দাদের কালীপুজা। অদূরে কালীমূর্ত্তি। হাড়িকাঠে পশুবলি দেওয়া হ'য়েছে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে জমাটবাঁধা লাল রক্ত। রক্ত দেখে শিউরে উঠলো সৌমেন, এক অজানা আতঙ্কে তার দেহের শিরা উপশিরাগুলো টন্ টন্ ক'রে উঠলো। পথে যেতে যেতে একটা বাঁশের খুঁটি ধ'রে নিজেকে সামলে নিলে। গীতার বিয়ের রাতের কথা তার মনে প'ড়লো —মনে প'ড়লো সেই তাজা তপ্ত রক্ত-বিভীষিকা, মনে হ'লো এখনো যেন তার হাত দিয়ে ঝ'রে প'ড়ছে লাল তপ্ত রক্ত! সৌমেন খুঁটি ধ'রে সেখানেই ব'সে প'ড়লো।

পূজা অন্তে পুরুষ ও রমণীর দল এক সাথে ধ্যানেশ্বরীর আরাধনায় গা ঢেলে দিয়েছে। অফুরন্ত আনন্দবাসরে চ'লেছে তাদের উৎকট উদ্ভট্ নৃত্য ও গীত। ওদের দিকে উদাসনয়নে চেয়ে সৌমেন কতক্ষণ ব'সে ছিল কে জানে, একজন জোয়ান মাতাল তাকে জোর ক'রে টানতে টানতে আসরের মাঝখানে নিয়ে হাজির ক'রলে।

—তুমি আবার কোন্ গগন থেকে নেমে এলে, সুন্দরী ?

দ্বিতীয় মাতাল চক্ষু মুদ্রিত প্রথম বক্তার ভ্রম সংশোধন ক'রলে। তের ব্যাটা ! সুন্দরী কি—ওটা যে ব্যাটাছেলে। শালা, বেমালুম মাতোয়ারা হ'য়ে গেছে !

তৃতীয় ব্যক্তি অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে মন্তব্য ক'র্লে, ও ব্যাটা পেঁচী মাতাল !

চতুর্থ ব্যক্তির মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না, অতি কষ্টে জড়িত-কণ্ঠে মাতালটি জিজ্ঞাসা ক'রলে, কে বাবা ! আবু এলি ? ফিরে এলি বাবা ! বাপ্ আবুরে—, ব'লতে ব'লতে সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

তখন তারই সুরে সুর মিশিয়ে রোগা, খেঁকুরে একটা প্রৌঢ়া মড়াকান্না সুরু ক'রে দিলে।

পঞ্চম মাতালটি তখন হাঁটুর ওপর তাল ঠুকে আপন মনে জড়িত-কণ্ঠে ব'লছে :—

এক গেলাস প'ড়লো পেটে—
শুঁড়ি ব্যাটা তোর মদ বটে,
দু' গেলাস প'ড়লো পেটে—
হাতীর ওপর হাওদা ছোটে,
তিন গেলাস প'ড়লো পেটে—
তিড়িঙ্ নাচন, তিড়িঙ্ নাচন !

ব'লতে ব'লতে সে দস্তুর মত এঁকেবেঁকে নাচতে স্বুরু ক'রলে। তার সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী সুস্থ মানুষের ভয় হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ পায়ের ঠিক রাখতে না পেরে টলটলায়মান অবস্থায় সে যদি তার বিরাট বপু নিয়ে কারুর ওপর ট'লে পড়ে তবে সেই হতভাগ্যের বিপদ সুনিশ্চয়; চাপা প'ড়ে অপঘাতে মৃত্যুর প্রচুর সম্ভাবনা।

সেই বিরাট বপুর দেখাদেখি প্রায় অনেকেই সৌমেনকে ঘিরে নৃত্য জুড়ে দিলে। কতকগুলো নাচতে উঠে প'ড়ে গেল, কতকগুলো প'ড়লো নাচতে গিয়ে আর অধিকাংশই ট'লে প'ড়লো নাচতে নাচতে। আবহাওয়াটা একটু শান্ত হ'তে সৌমেন ব'ললে, আজকের মত তোমরা আমায় একটু থাকতে দেবে? কে একজন ব'লে উঠলো, শুধু থাকা! আরে ছোঃ, থাকবে—খাবে—নাচবে—গাইবে। দে—দে এক পাত্তোর?

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো ধেনো মদে ভর্ত্তি মাটির গেলাস সমেত পাঁচ সাতখানা হাত। উঃ কি উৎকট দুর্গন্ধ! দেশী মদের যে এমন ভয়াবহ গন্ধ তা সৌমেন কোন দিন কল্পনাও করেনি। নাকটা চেপে ধ'রে সে কাতর কণ্ঠে ব'ললে, ছিঃ ছিঃ এসব আমি কোনদিন খাই নি!

—কত গ্যালো রথারথী আর ষ্যাওড়াতলায় চক্কোবর্ত্তী!

—কেন নেএঁকুড়েপনা কচ্ছো বাবা, আবুহোসেন! টেনে নাওনা এক পাত্তোর!

সেই মড়াকান্না-কাঁদা, শীর্ণা, কঙ্কালসার প্রৌঢ়াটি এক খুরি মদ সৌমেনের মুখের ওপর তুলে ধ'রে ব'ললে, খ্যাঁক খেঁকে গলায়, সতীপনা রেখে টুক ক'রে গলায় ঢেলে দাও, ধনমণি!

সৌমেনের প্রায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো এদের আতিথ্যের জ্বালায়,

সে মিনতিভরা কণ্ঠে ব'ললে—না—না আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে! তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, দোহাই তোমাদের!

নারীর অমর্য্যাদা করার জন্য কার যেন রক্ত হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠলো, সে উত্তপ্তকণ্ঠে মারমুখী হ'য়ে ব'ললে, তুমি শালা কেমনধারা বেরসিক হে! মেয়েমানুষ নিজের হাতে তোমাকে ঢেলে দিচ্ছে মদ আর তুমি কিনা —

বক্তাকে সমাপ্ত ক'রতে না দিয়ে সৌমেন ক্ষিপ্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, না খেলে তোমরা কিছুতেই ছাড়বে না! খেতেই হবে?

প্রায় সকলে সমস্বরে ব'লে উঠলো, নিশ্চয়! নিশ্চয়!!

—বেশ দাও!

সকলে হাতে পেলো যেন আকাশের চাঁদ। যে কোন দিন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেনি তার হাতে নেশার পাত্র তুলে দেওয়া বা তাকে প্রথম দীক্ষিত করার মত আনন্দ নেশাখোরের আর দ্বিতীয় কিছুই নেই সংসারে। চারিদিক থেকে শব্দ উত্থিত হ'লো—দাও! দাও!! ঠুসে দাও এক পাত্তোর!

এবার আর পাঁচ সাতখানা হাত এগিয়ে এলো না, এলো কাঁচের চুড়িপরা একখানি শীর্ণ কঙ্কালসার, মাত্র কাল চামড়া ঢাকা, উলকি-আঁকা ভৌতিক হাত এগিয়ে। সারা মুখে মেয়েটির বাণিজ্যের ছাপ ও ছায়া পরিস্ফুট, ভয়াবহ জঘন্য ব্যাধির ক্ষতচিহ্ন তার সারা অঙ্গে। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে অতি কষ্টে পাত্রস্থিত মদ সৌমেন গলাধঃকরণ ক'রলে। উপর্য্যুপরি কয়েক পাত্র মদ পান ক'রে সৌমেন ব'ললে অস্ফুটকণ্ঠে, উঃ কি ক'রেছি—কি ক'রেছি!

— কি ক'রেছো, বাওয়া?

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে আপনহারা সৌমেন ব'ললে, ক'রেছি মানুষ হ'য়ে মানুষের জীবন ব্যর্থ!

কোন মেয়েমানুষের ভালবাসায় প'ড়েছিলে, চাঁদ?

দৃপ্ত সৌমেন ব'ললে, ধ্যাৎ ননসেন্স! কৈ দাও—মদ দাও!

সহরের এক প্রান্তে।

একটা খোলার ঘরের মাথার ওপর একখানা বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা 'বেকার-বান্ধব সমিতি'। দোচালা খোলার ঘরটি খুবই বড়, এত বড় একখানা খোলার ঘর খুবই কম চোখে পড়ে। ঘরটির চারদিক ছিটেবেড়ার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভিতরটা ছোটখাটো একটা প্রদর্শনী। বাঁখারী দিয়ে ছোট ছোট 'পার্টিসনে' ভাগ করা সারা ঘরখানা। এক একটি 'পার্টিসনের' ধারে হাতেলেখা 'পেষ্টবোর্ড' টাঙানো—যেমন মুড়ি বিভাগ, পুরাণো কাগজ বিভাগ। ক্যালাণ্ডারের ছবি বিভাগ, দাঁতন বিভাগ, ভাঙা কাচ বিভাগ প্রভৃতি।

প্রত্যেক পার্টিসনের ধারে ঝুলছে একটা ক'রে হ্যারিকেন। হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় সকলেই কাজে ব্যস্ত। কেউ মুড়ি মাপছে, কেউ চিনেবাদাম বাচছে, কেউ বা থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখছে পুরাণো ছেঁড়া কাগজ, আবার কেউ বা ছোট, বড় এবং মাঝারি কাচ বাছাই ক'রছে! যে যাব কাজে ব্যস্ত, কেউ কারু দিকে ফিরেও চায় না। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সদাই সজাগ। এদের সঙ্গে আলাপ ক'রলে মনে হবে, এরা প্রত্যেকেই আপনাতে আপনি বিভোর। কাজে এবং কথায় এরা সকলেই যেন এক স্বতন্ত্র জগতের মানুষ! আচারে-ব্যবহারে, বেশ-ভূষায় এরা অত্যন্ত সরল; তবে অহমিকাশূন্য হ'য়েও এরা প্রত্যেকেই একদিন বড় হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে।

রাত্রি তখন ন'টা কি সাড়ে ন'টা, পাইকারী ক্রেতার ছদ্মবেশে বিপুল এই 'বেকার-বান্ধব সমিতি'তে হানা দিলে। একজন কর্ম্মব্যস্ত তরুণের

উদ্দেশে ব'ললে, শুনলাম আপনাদের এখানে পাইকারী দরে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, তাই

যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা তার দিক থেকে উত্তরই এলো না, একটি ছোকরা এগিয়ে এসে নমস্কার ক'রে বিপুলকে অফিস ঘরটি দেখিয়ে দিলে। ওদিকের কোণে গেরুয়া কাপড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি ঘর, দরজার মাথায় পেষ্টবোর্ডে লেখা—'অফিস'।

অফিসে প্রদীপের আলোয় একটি যুবক তখন কি যেন লিখছিলো। যুবকটি বিপুলকে নমস্কার ক'রে কথা না ব'লে ইসারায় ব'সতে ব'ললে। কাজ শেষ ক'রে নিখিল (যুবকটির নাম) ব'ললে স্নিগ্ধকণ্ঠে, কাজটা জরুরী। লিমিটেড কনসার্ণ কিনা, হিসাবটা ঠিক রাখতে হয়। এবার বলুন আপনার দরকার কি ?

—পাইকারী দরে আমার কিছু দাঁতন চাই।

—পাইকারী দরের চেয়েও সস্তায় আপনারা এখানে জিনিষ পাবেন। গত কাল একটি উৎসাহী তরুণ আমাদের সমিতিতে যোগ দিয়েছেন। দাঁতন বিভাগ তিনিই পরিচালনা ক'রবেন। একটা নূতন বিভাগ খুলতে না খুলতেই……নাঃ আমাদের luckটা ভালই ব'লতে হবে ! বিপুলের দিকে চেয়ে নিখিল মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

বিপুলও হাসলে—হাসলে মনে মনে তবে সে অদৃশ্য হাসি সারল্যের নয়—সয়তানীর ! কিছু বুঝতে না পারার ভানে বিপুল ব'ললে, ও কথা ব'লছেন কেন ?

নিজের কথায় জোর দিয়ে নিখিল ব'ললে, নূতন বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই খদ্দের ! ও বিভাগটা খোলার ইচ্ছা ও জল্পনা-কল্পনা আমাদের বহু দিনের, কিন্তু হ'লে কি হবে, বনে-বাদাড়ে গিয়ে কাজ কর্ত্তে কেউ রাজী নয়।

রহস্য ক'রে বিপুল ব'ললে, মানুষের প্রকৃতি অনুসারে আপনাদের এখানে কাজের ভার দেওয়া হয় নাকি ?

নিখিল ব'ললে, নিশ্চয়! নইলে কাজ ভাল হয় না।

উৎসাহ দিয়ে বিপুল ব'ললে চমৎকার, এ দেখছি আপনাদের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান! তা—আপনাদের নূতন বন্ধু বুঝি সহরের চেয়ে বনঝোপই একটু বেশী পছন্দ করেন?

হেসে ফেললে নিখিল, ব'ললে, হ্যাঁ ঠিক ধ'রেছেন আপনি! আমাদের সমিতির নূতন সভ্যটি একটু পাগলাটে পাগলাটে—কতকটা কবি প্রকৃতির। তা' যাক্, এবার কাজের কথা হোক্। আপনার ক'হাজার দাঁতন চাই বলুন?

—এই লাখ্ খানেক!

—my good luck! কবে দিতে হবে? বিস্ফারিতনেত্রে নিখিল ব'ললে।

ইতস্তত: না ক'রে বিপুল ব'ললে, যত শীগ্‌গীর হয় ততই ভালো। ব্যবসা ব'লে কথা—বুঝতেই তো পাচ্ছেন! আমি এই সব দাঁতন পাঠাচ্ছি আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি……আনন্দে উৎফুল্ল নিখিল ব'ললে, বা: চমৎকার! কে বলে বাঙালীর business brain নেই!

কিন্তু সার্, দিন দুই সময় আমাদের দিতেই হবে!

একটু যেন দ'মে যাবার ভাব দেখালে বিপুল, বাঁ দিকের চোখটা ঈষৎ ছোট ক'রে টেনে টেনে ব'ললে, দিন দু'ই! আমি ভেবেছিলাম আপনাদের এখানে সব কিছুই রেডি-মেড! আচ্ছা দিন দুই সময়ই দিলাম কিন্তু দেখবেন, ওর চেয়ে যেন দেরী ক'রে ফেলবেন না তাহ'লে আমার অর্ডারই ক্যানসেল হ'য়ে যাবে?

খদ্দের হাতছাড়া হবার ভয়ে বিনীতকণ্ঠে নিখিল ব'ললে, সে কি কথা, সার্! কথা যখন দিচ্ছি তখন—

নিখিলের মুখের কথা শেষ হবার আগেই বিপুল ব'ললে, এই নিন্ এ্যাড্‌ভ্যান্স!

—ধন্যবাদ! ব'লেই নিখিল অগ্রিম প্রাপ্তির বিল লিখতে ব'সলো। বিপুল ব'ললে কিন্তু দরদাম তো হ'লো না?

—আপনার সঙ্গে কি আর দরদাম কষাকষি ক'রবো, স্যার্! ন্যায্য মূল্য হিসাবে 'বেকার-বান্ধব সমিতি'কে আপনি যা' দেবেন, আমরা আপনার সেই দান হাসিমুখে মাথা পেতে নেবো। বুঝতে পাচ্ছেন না, আমরা বেকার—সকলেই বেকার! আমাদের মূলধন প্রায় নেই ব'ললেই হয়, আমরা যা-কিছু করি সবই প্রায় গায়ে গতরে; কাজেই টাকা পয়সার ধার আমরা বিশেষ ধারি না। একটু যদি কষ্ট করেন তা'হলে আমাদের এই সমিতির ব্যাপারটা আপনাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই! আসুন। ব'লে নিখিল আগন্তুককে অফিসের বাইরে নিয়ে এসে বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো দু'এক লাইন ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়ে।

বিপুল ওদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও এই অসাধারণ যুগে নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার উৎসাহ ও উদ্যমে সত্যই মুগ্ধ হ'লো এবং শতমুখে ক'রলে ওদের প্রশংসা।

নিখিল ব'ললে, অন্ততঃ এই মনের জোর নিয়ে আমরা কাজে নেমেছি যে, উন্নতি আমাদের অবশ্যম্ভাবী! জয় আমাদের অনিবার্য্য! আমরা শুধু চাই আপনাদের সহানুভূতি আর শুভেচ্ছা। দেখলেন তো, বাণিজ্যের আড়ম্বর আমাদের কিছুমাত্র নেই। মুড়ির চাল আর চিনেবাদাম ছাড়া কিছুটি আমাদের কিনতে হয় না। কাগজ আনা হয় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আর নয় ডাষ্টবিন ঘেঁটে। ভাঙা কাচও তাই। দাঁতন কেটে আনা হবে বন থেকে নিখরচায়। ছেঁড়া কাগজ আর ভাঙা কাচ বেচে আমরা মুড়ির চাল আর কাঁচা বাদাম পাড়াগাঁ থেকে কিনে আনি। আমরা নিজেরাই ওসব উনুনে খোলায় ক'রে ভাজি। ওপাশের ঐ যে পোড়ো, জঙ্গুলে, আগাছায়-ভর্ত্তি জমিটা দেখছেন, ওটা

আমরা সুবিধা দরে এবছর থেকে জমা নিয়েছি। ওখানে আমরা চিনেবাদাম আর তরিতরকারির চাষ ক'রবো। মাইনে? মাইনে আমরা এক পয়সাও নিইনি, শুধু এক বেলা ক'রে আমরা নিরামিষ খাই। এই যে দেখছেন পরণে আমাদের খদ্দরের কাপড় আর হাতকাটা পাঞ্জাবী, এসব আমরা নিজের হাতে সূতো কেটে তাঁতে বুনে নিয়েছি। কার্পাস তূলোর চাষও এবার আমরা ক'রবো স্থির ক'রেছি।

উৎফুল্ল অন্তরে বিপুল ব'ললে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে বাংলা বনাম ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান আপনাদের চেষ্টাতেই হবে! আচ্ছা, আমি তা'হলে আজ আসি! নমস্কার!

প্রতিনমস্কার ক'রে নিখিল ব'ললে, স্বদেশী গুড়ের তৈরী একটু চা খেয়ে যাবেন না, স্যার্!

—আজ থাক ভাই, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো!

নিখিল দ্বারদেশ পর্য্যন্ত এসে বিপুলকে এগিয়ে দিলে।

দূর থেকে ছদ্মবেশে বিপুলকে 'বেকার-বান্ধব সমিতি' থেকে বেরুতে দেখে স্তম্ভিত সৌমেন অন্ধকারে একটা গাছের পাশে স'রে দাঁড়ালো। বিপুল নিজের মনে তারই সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। দাঁতনের বোঝাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে কপালের ঘাম মুছে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে সৌমেন আবার অন্ধকারে পথ দিয়ে চ'লতে শুরু ক'রলে। দাঁতনের বোঝা সেখানেই প'ড়ে রইলো, সমিতিতে সে-ও আর ঢুকলো না।

'বেকার বান্ধব সমিতি'র সম্বন্ধে একটা হীন ধারণাই এযাবৎ বিপুল মনে মনে পোষণ ক'রতো। কতকগুলো বাপে-তাড়ানো ভবঘুরে ভ্যাগাবণ্ডের ওটা একটা আড্ডাখানা। হতভাগাদের না আছে শিক্ষা আর না আছে কালচার, অনাছিষ্টি অমূলক পরিকল্পনা নিয়ে পাগলামি

করা ছাড়া ওদের অন্য উদ্দেশ্য নেই—থাকতেই পারে না। ওদের মধ্যে হয়তো অনেকেই নেশাখোর, পকেটমার, ধাপ্পাবাজ! ওরা মানুষ নামের অযোগ্য। দেশের ভাল করা দূরে থাক, নিজেদের ভালও ওরা চায় না; আর কিসে যে নিজেদের ভাল হবে সে ধারণাও ওদের নেই। উদ্দেশ্যবিহীন জীবন। হৈ চৈ ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া ওদের উদ্দেশ্য। আজ কিন্তু তার সে ধারণা ব'দলে গেল। নিজের ভুল ও অজ্ঞাত অহমিকার জন্য বিপুল নিজের মনে নিজেই হ'লো লজ্জিত ও অনুতপ্ত! যাদের সে মানুষ নামের অযোগ্য মনে ক'রতো আজ তাদেরই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য ব'লে বিপুলের মনে হ'লো। ওরা ভ্যাগাবণ্ড নয়, ওরাই ভাগ্যবান; প্রতি জনে জনে ওরা ভাণ্ডড়ভোলা। জগতের মহাপাপের প্রতিকারকল্পে ওরা যেন জনে জনে ক'রেছে আত্ম-বলিদান। কঠোর তপস্যা ক'রে—নিজেদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ওরা চায় মানবজাতির কল্যাণ। দিনের পর দিন কি কল্পনাতীত কৃচ্ছ-সাধনই ওরা ক'রে চ'লেছে! ওদের শিক্ষা, ওদের বিবেক-বিবেচনার কাছে সাধারণ মানুষের শির আপনিই নত হ'য়ে আসে। শিক্ষিত, সভ্য সমাজ যাদের ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দেয়, তাদেরই ওরা ভাই ব'লে বুকে টেনে নিয়ে ক'রে দেয় নব নব কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ। ভারি রাগ হ'লো তার সৌমেনের ওপর। সৌমেনের মত সমাজের মড়াকেরাই ওদেব দলে ঢুকে করে ওদের সর্ব্বনাশ। না জানি হতভাগা খুনেটার সংস্রবে এসে বেচারীদের কি নাস্তানাবুদই না হ'তে হয়।

* * * * *

স্বভাব খুনীর দলভুক্ত করা সৌমেনকে চলে না। স্বভাব খুনীর রক্তের মধ্যে মেশানো থাকে খুন করার যে প্রবৃত্তি—তারই বীজাণু, এরা একটার পর একটা খুন অবলীলাক্রমে হাসিমুখে ক'রে যায়, অনুতাপ জাগে না এদের অন্তরে একটি মুহূর্ত্তের জন্য, অনুশোচনার ছায়া

পারে না এদের স্পর্শ ক'রতে; খুন ক'রেই এদের আনন্দ। স্বভাব খুনী যারা—তারা যদি খুন না ক'রতে পারে তবেই আসে তাদের অস্বস্তি। সৌমেন স্বভাব খুনী নয়, তাই নেই তার অনুশোচনার অন্ত। অনুতাপের মর্ম্মদাহী অনলে প্রতি মুহূর্ত্তে সে জলে-পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। সে যে খুনী—এ কথা সে ভুলতে চায়, কিন্তু তার বিবেক তাকে রেহাই দেবে কেন? নিজের হাতের দিকে চাইলেই সে আঁতকে ওঠে, চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য—যা সে চায় না মনে ক'রতে, যা সে চায় চিরতরে মন থেকে মুছে ফেলতে; চায় সে সব-কিছু ভুলে যেতে! নিজের দেহ থেকে হাত দুটোকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারলে সে যেন খুসী হয়।

নিজের অজান্তে সৌমেন ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে পড়লো।

অন্ধকার অপসারিত ক'রে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর চাঁদের কিরণ মন্থর-ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে মাটির ধরণীতে। গঙ্গার ধারে আঘাটায় নোঙ্গর ফেলে বা শক্ত মোটা কাছি দিয়ে তীরের মোটা গাছের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা হ'য়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে অগুণতি নৌকা। মাঝি-মাল্লারা জ্যোছনা আলোয় খেতে ব'সে হাসি-গল্পে মেতে উঠেছে। নৌকার চালে শুয়ে কেউবা তাদের দেশী ভাষায় গান ধ'রেছে, আবার কেউ বা দিচ্ছে তাল। ওপাশের নৌকায় বোধ হয় আজ ব'সেছে গানের জলসা। নৌকার পাটাতনের ওপর এক দঙ্গল লোক গোলাকৃতি হ'য়ে খোল, করতাল প্রভৃতি বাজিয়ে গলা ফাটিয়ে গান ধ'রেছে।

গঙ্গার ধারেই—ঠিক কিনারাতেই একটা বট গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে এক কৌপিনধারী সন্ন্যাসী। জটাধারী সন্ন্যাসী চিমটে বাজিয়ে হিন্দী ভজন গাইছে। শিষ্যটি গুণগুণ ক'রতে ক'রতে একটা শালপাতা পেতে আটা মাখছে। গোটা কয়েক আলু, দুটো বেগুন ধুনির আগুনের অদূরে প্রায় অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় প'ড়ে আছে। আটার

টিকৃলিগুলো আঙরার ওপর ফেলে দিয়ে আলু আর বেগুনের দিকে শিষ্যবরের দৃষ্টি প'ড়লো। 'জয় শিব-শম্ভু' ব'লে তিনি আলু আর বেগুন ধুনীর ভিতর ফেলে দিলেন।

সন্ন্যাসীর গানের সুর ও স্বর নরম হ'য়ে এলো, তিনি চিমটে দিয়ে আটার টিকৃলিগুলো নেড়েচেড়ে পোড়াতে লাগলেন, শিষ্য একটা কাঠি দিয়ে বেগুন আর আলুগুলো একটা একটা ক'রে টেনে বার ক'রলে আগুনের ভিতর থেকে।

আহারাদি কার্য্য শেষ ক'রে সন্ন্যাসীপ্রবর ব'ললেন, এসো হে, প্রসাদ পাও! অদূরে উপবিষ্ট সৌমেন গঙ্গার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে যে তার পিছন দিকে খোলা শালপাতায় আটার টিকৃলি আর কালো কালো পোড়া আলু নিয়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সন্ন্যাসী।

সৌমেন অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো সন্ন্যাসীর মুখের দিকে।

হাসিমুখে পরিষ্কার বাঙলায় সন্ন্যাসী ব'ললেন, নামেই প্রসাদ, এঁটোকোটা নয়। আগুনে-পোড়ান পবিত্র জিনিষ, খেতে কোন বাধা নেই; নাও—ধর।

সারাদিন অভুক্ত সৌমেন ছু'হাত পেতে আগ্রহভরে আটার টিকৃলি আর পোড়া আলু নিয়ে খেতে সুরু ক'রলে। খাবার আগে সভ্য সমাজের রীতি অনুসারে সন্ন্যাসীকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া তার উচিত ছিল কিন্তু তাও সে দিলে না! কেন দেবে? সভ্য সমাজের কৃত্রিমতার খোলস সে তো খুলে ফেলেছে। সন্ন্যাসীর এই অমূল্য দান—অপরিশোধেয় ঋণ কি ছুটো অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিম ছেঁদো কথায় শোধ হ'য়ে যাবে—না যেতে পারে! সত্যিকারের ব'লবার মত কথা সে খুঁজে পেলে না, কাজেই নিঃশব্দে খেয়ে গঙ্গা থেকে পান ক'রলে ছু'আঁচলা জল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ইচ্ছা ছিল সন্ন্যাসীর সঙ্গে সৌমেন একটু

ঘনিষ্ঠতা ক'রবে। কিন্তু পেটটা ঠাণ্ডা হওয়ামাত্র, তৃষ্ণা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সংজ্ঞা তাকে সজীব ক'রে তুললে, অন্তরে জাগলো তার বিচার-বুদ্ধি! মানবের অন্তরজাত প্রবৃত্তি সু আর কু—দুই বোনে বাধলো দ্বন্দ্ব।········সন্ন্যাসীটা বিপুলের চর নয়তো? নইলে ভিক্ষুক কি কখন ভিক্ষুককে দান করে? সৌমেনকে খাওয়াবার মাথাব্যথা সন্ন্যাসীটার কেন? বিপুলের নিযুক্ত কোন গোয়েন্দা ছাই-মেখে গঙ্গাতীরে ধুনি জ্বালিয়ে ব'সে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়! সন্দেহ তো আপনিই ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে, ও কেমন করে জানলে যে সৌমেন উপবাসী? সে পারতো জানতে গত যুগের সন্ন্যাসীরা, এযুগে মানুষের পেটের খবর জানা সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নয়। মানুষের মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারা যায়? হয়তো পারা যায় বুঝতে, কিন্তু তাও পারে ক'টা লোক—হাজারে একটা! সন্ন্যাসীঠাকুর সত্যি যদি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারতো তার কি আর গঙ্গার-তীরে ধুনি জ্বালিয়ে ধূলোয় শুয়ে পোড়া আলু খেয়ে গড়াগড়ি দিতো! কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসীর ধূলিই তো শয্যা, রাজভোগ তো তাদের কাছে বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনধারণ-উপযোগী সরল, অনাড়ম্বর খাদ্যই মানুষের গ্রহণ করা উচিত; সন্ন্যাসীর কথা তো স্বতন্ত্র!

গঙ্গায় তখন ভাটা প'ড়েছে। জল খাবার জন্য তীর ছেড়ে অনেকখানি সৌমেন নেমে এসেছে। তীরের লোক এখান থেকে আর চেনা যায় না। সন্ন্যাসীর অস্পষ্ট মূর্ত্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য না ক'রলে আর চোখে পড়ে না। সন্দেহের বশে সৌমেন চায় সন্ন্যাসীকে এড়িয়ে যেতে। সে অতি সন্তর্পণে ঠিক চোরের মত গঙ্গার চর দিয়ে কাদার ওপর হেঁটে চ'ললো ঘাড় ফিরিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখবার ইচ্ছা সত্ত্বেও সে দেখতে পারলে না, অর্থহীন আতঙ্ক তার ইচ্ছা-শক্তিকে দমন ক'রলে। ইটের টুকরো, পাথরের কুচি প্রায় প্রতি পদে তার চলার

পথে যন্ত্রণাদায়ক বাধা সৃষ্টি ক'রছিল কিন্তু সবকিছু তুচ্ছ ক'রে সে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আরো এগিয়ে চ'ললো। কাঁটার মত কি যেন একটা পায়ে ফুটলো! তা ফুটুক—ওদিকে এখন লক্ষ্য দিতে নেই, পিছনে তার জীবন্ত সমন! সমনকে এড়িয়ে যেতেই হবে। সৌমেন নৌকার কাছি ডিঙিয়ে, পথ-জুড়ে পড়ে থাকা মোটা কাঠের গুঁড়ি লাফিয়ে, জেটির তলা ঘাড় নীচু ক'রে অতিক্রম ক'রে, ধরা-পড়া ফাঁসীর আসামীর মত কম্পিতবক্ষে এগিয়ে চলে।

বেশ কিছুদূর এসে সৌমেন তীরে উঠলো।

মালবোঝাই গুদাম-ঘরের পিছনে গঙ্গার ধারে বিরাট প্রশস্ত জায়গায় ভিখারীদের মেলা ব'সে গেছে। আশ-পাশে দশ-বিশখানা ভাঙা, গোটা গরু আর মোষের গাড়ী এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে, গরু মোষ এধার-ওধার শুয়ে এবং দাঁড়িয়ে সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম-সুখ ভোগ ক'রছে। খড় আর গোবরের সংমিশ্রণে সারা স্থান সমাচ্ছন্ন।

ভিখারীরা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত। গরুর গাড়ীর তলায় সদ্য গড়া ইটের উনুনে কাঠের জ্বালে রান্না হ'চ্ছে। দশ-পনেরটা উনুন ঘিরে ব'সেছে এক-একটি ক্ষুদ্র দল। কানাভাঙা মাটির হাঁড়ি বা টিনের পাত্রে রান্না হ'চ্ছে। বড়রা হাসছে, কথা ব'লছে, গল্প ক'চ্ছে উনুনে জ্বালানি কাঠ ঠেলে দিতে দিতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এধার-ওধার ছুটোছুটি ক'রে খেলা ক'চ্ছে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি ক'চ্ছে পরস্পরকে, আবার কেউ কেউবা ক্ষুধার জ্বালায় শুয়ে কাঁদছে। পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে নেই কোন ব্যবধান, কেমন যেন দৃষ্টিকটু বে-আব্রু ভাব। আব্রু আর পর্দা সম্বন্ধে এরা এত উদাসীন বা অজ্ঞ যে, ওসব কথা ওদের মনে আমলই পায় না। নগ্ন প্রকৃতির মতই ওরা উদার, গুপ্ত আবরণের ধার ওরা ধারে না! তাই তো প্রকৃতির সন্তান, মাটির মায়ের ছেলে বলতে এদেরই বোঝায়।

ভারী ভালো লাগলো সৌমেনের, সে এদেরই মধ্যে একধারে একটু ঠাঁই ক'রে নিলে। পরিশ্রান্ত হ'লে কি হবে, চোখে তার ঘুম এলো না। আজকাল এমনিই হয়, সর্ব্বদুঃখহরা নিদ্রাসুখ ভোগ তার অদৃষ্টে আজকাল খুব কমই ঘটে। মোষের গাড়ীর চাকায় হেলান দিয়ে সৌমেন চেয়ে থাকে উদাসনয়নে আকাশের দিকে। পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলির কথা আজ আবার নূতন ক'রে মনে প'ড়ে। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, একান্ত অনাথ সে। বাবা-মার স্নেহ ভালবাসা পুর্ণমাত্রায় লাভ করার সৌভাগ্য তার হয়নি। পরাশ্রিত হ'য়ে কেটেছে তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের কতকাংশ। হোক সে পরাশ্রিত তবু সে দিনগুলো কতই না মধুর—যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া! বিধাতার অভিশাপ নিয়ে সে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল, মাত্র ঐ কটা দিনে ঘ'টেছিল তার ব্যতিক্রম ; গত জন্মের সুকৃতির ফল নিশ্চয়! তারপর—তারপর এত সুখ বিধাতা তার অদৃষ্টে লেখেন নি, তাইতো সে কুপ্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় প্রলোভনে ভেসে গেল একগাছা ক্ষুদ্র তৃণের মত! দুর্ব্বার স্রোতের গতি রুদ্ধ করার মত শক্তি, সামর্থ্য ও মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি, তাই তার আজ এই শোচনীয় কল্পনাতীত অধঃপতন! অদৃষ্ট-দেবতার ওপর, ভাগ্যনিয়ন্তা বিধাতার ওপর দোষারোপ ক'রে ক্লিষ্ট মানুষ চায় শান্তি পেতে।

ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক এবং মানবধর্ম্মসম্মত! কিন্তু ওভাবে সাময়িক শান্তি ছাড়া মানুষ প্রকৃত শান্তি অর্জ্জন ক'রতে পারে না! কি সে পন্থা? ঐ পন্থা আবিষ্কারের জন্য জগতের প্রতিটি মানুষ আজীবন আবহমান কাল ধ'রে গবেষণা ক'রে আসছে কিন্তু অবস্থা তাদের যে তিমিরে সেই তিমিরে!............সৌমেন দার্শনিক হ'য়ে ওঠে!

আচ্ছা, সত্যি সে কি কোন অন্যায় ক'রেছে? অকৃতজ্ঞ সে? কেন, —অপরাধ? বিপুল পারে গীতার প্রেমে প'ড়তে আর সৌমেনের বেলায়ই

সেটা অস্বাভাবিক, বর্ব্বরোচিত জঘন্য একটা কিছু? একই বিধাতার রাজ্যে বিচারের মাপ-কাঠি আলাদা হবে কেন? ক্ষুধার জ্বালায় চোর চুরি করে, কারণ চাইলে কেউ দেয় না, গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। প্রতি অন্তরে ভগবান্ বিরাজমান, জীবন্ত ভগবান্‌কে রক্ষা ক'রতে তার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ ক'রতে মানুষ তো চুরি ক'রবেই—করাটা স্বাভাবিক! সভ্য সমাজে চোরের শাস্তির বিধান আছে। রকম-ফের হওয়া উচিত। নিজেকে রক্ষা ক'রতে যে চুরি ক'রবে নিরুপায় হ'য়ে —সে মার্জ্জনীয়; কিন্তু জমায়েত করার জন্য যে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রবে তারই শাস্তি হওয়া উচিত অনিবার্য্য! সৌমেন নিজেকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ক'রতে চায়। সে-ও তো নিজের অন্তর-আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছে, সে নিরুপায় হ'য়ে চুরি ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে তারই আরাধ্যা দেবী গীতার প্রাণ! সত্যি সে কি কোন অন্যায় ক'রেছে?

সৌমেনের মাথার ওপর দিয়ে কি একটা রাতজাগা পাখী কর্কশ-কণ্ঠে ডাক দিয়ে গেল। সৌমেনের তন্দ্রা গেল টুটে! ভাবতে ভাবতে কখন যে তার চোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো তা সে জানতেই পারলে না। ঘুমের ঘোরে কি সব সে আবোল-তাবোল ভাবছিল! অস্ফুট-কণ্ঠে সৌমেন নিজের মনেই ব'ললে, উঃ কি ক'রেছি! তার যেন বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। মাথায় জল দিতে সে নেমে গেল গঙ্গায়।

মাথায় মুখে জল দিয়ে সৌমেন জলে পা ডুবিয়ে ব'সে রইলো। তখন জোয়ার এসেছে, জলস্রোতের ওপর ভেসে যাচ্ছে রাশি রাশি চাঁদ। জ্যোছনা-ঢাকা গঙ্গা—একখানা পাতলা রূপালী আবরণে যৌবনশ্রীমণ্ডিত সারা অঙ্গ ঢাকা দিয়ে চ'লেছে কোন সে অজানা অভিসারে। আধো আলো আধো ছায়ার সে অপরূপ খেলা।

হঠাৎ তীরের ওপর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে উঠলো একটা বীভৎস হট্টগোল, চীৎকার; সৌমেনের তন্ময়তা ভেঙ্গে গিয়ে চেতনা ফিরে এলো। জোয়ারের জলও তখন তার হাঁটু পর্য্যন্ত উঠেছে, সে ধীরে ধীরে তীরে উঠে এলো।

সামান্য স্থানাধিকার নিয়ে দু'টি দলের মধ্যে প্রথম বচসা, তারপর গালাগাল, আর সেই গালাগাল বর্ত্তমানে হাতাহাতিতে পর্য্যবসিত; পরিণাম রক্তারক্তি। ফলে অনেকেরই হাঁড়ি ও উনুন একসঙ্গে ভেঙ্গে গেছে, রান্না ফেনশুদ্ধো ভাত ছড়িয়ে প'ড়েছে মাটির ধূলোয়। সেই ভাত কুড়িয়ে জলে ধুয়ে জঠরের জ্বালা তারা কিঞ্চিৎ প্রশমিত ক'রলে। আহারাদি শেষ ক'রে জোয়ান যুবক ক'জন একস্থানে জটলা ক'রতে ক'রতে গান সুরু ক'রলে। প্রায় সকলেই তখন গায়ক, শ্রোতা কেউ নেই ব'ললেই হয়।

সৌমেন একটা গরুর গাড়ীর ওপর উঠে ব'সলো। উঁচু থেকে চারিদিকটা দেখা যায় ভাল।

ওদিকে চ'লেছে তাসের জুয়া। কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির ভিক্ষুক বাজি রেখে তাস ধ'রেছে। মিট্‌মিটে একটা কেরোসিনের ল্যাম্পকে কেন্দ্র ক'রে চ'লেছে ওদের হার-জিতের খেলা। ল্যাম্পের পাশে ময়লা, প্রায় ছিন্ন তাসের ওপর অসংখ্য চক্ষু কেন্দ্রীভূত, খেলোয়াড়ের চেয়ে দর্শকের সংখ্যা বেশী।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। মেয়ে, পুরুষ আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেশীর ভাগই তখন মাটির ওপর ছেঁড়া কাপড়, গামছা অথবা চেটাই পেতে ঘুমে অচৈতন্য, শুধু মাটির ওপরও অনেকে নিদ্রা-মগ্ন। গঙ্গায় এসেছে পূর্ণ জোয়ার, কানায় কানায় ভ'রে গেছে দু'কূল। নীরব, নিস্তব্ধ ধরণী।

রজনীর সেই বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে খেলোয়াড়দের মধ্যে কে

একজন বীভৎসকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো, এই শালা ভোম্বোল, হুড়িয়ে নিলি যে?

ভোম্বলের কাংসকণ্ঠ তার পুর্ব্ববর্ত্তীকে ছাড়িয়ে গেল। নিজস্ব ভাষায় ভোম্বল ব'ললে, যা-রে শালা! জিতেন ওয়াকে হুড়িয়ে নেওয়া বলে। দ্যাখরে দ্যাখ্, বিশে শালার—

ভোম্বলকে কথা শেষ ক'রবার অবসর না দিয়েই 'তবে রে শালা' ব'লেই বিশে দিলে তার গালে এক চড় বসিয়ে। ভোম্বলও ছেড়ে কথা ব'লবার পাত্র নয়, মুহূর্ত্তমধ্যে সে-ও তার পালটা জবাব দিতে কার্পণ্য ক'রলে না। এক লহমায় কঙ্কালসার বিশেকে মাটিতে ফেলে ভোম্বল তার বুকের ওপর চেপে ব'সলো। বিরাট চেহারা ভোম্বলের, তার শরীরের চাপই বিশের নাভিশ্বাস ওঠার পক্ষে যথেষ্ট! সকলে মিলে ওদের ছাড়িয়ে দিলে।

বিশে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললে, ছেড়েদে আমায়! শালাকে আজ খুন করেঙ্গা!

ভোম্বল তাচ্ছিল্যভরে তার বিরাট বপু দুলিয়ে ব'ললে, আরে ঢের শালা খুন করনেওলা দেখেছি!

—বটে! ব'লেই বিশে তার শতছিন্ন ফতুয়ার নীচে কোমরে গোঁজা একখানি ছোরা বার ক'রে শূন্যে তুলে ধ'রলে।

সৌমেনের বুকটা সে দৃশ্যে কেঁপে উঠলো, সে মরিয়া হ'য়ে চেপে ধ'রলে বিশের হাত; ব'ললে করুণকণ্ঠে, যেতে দে ভাই—যেতে দে!

ওপাশ থেকে ক'জন হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে জোর ক'রে বিশের হাত থেকে ছোরাখানা ছিনিয়ে নিলে।

দীপ্তকণ্ঠে বিশে ব'ললে, ছোরা মেরে অমন লাখো টাকার মালিক গণশা ঝুনঝুনওয়ালার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে শেষ ক'রে দিলুম—ওব্যাটা তো কা-কথা!

দূর থেকে ভোম্বল কণ্ঠস্বর এক পর্দা উচুঁতে তুলে ব'ললে, আরে যা রে—যা!

সৌমেন বিশেকে এক ধারে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলে, সত্যি তুমি খুন ক'রেছো?

বিশের উত্তেজনা তখনো কমেনি, সে বীরদর্পে ব'ললে, সত্যি-মিথ্যে ঐ ভোম্বল শালাকেই জিজ্ঞেস কর্।

স্বাভাবিক অবস্থায় হ'লে বিশে নিশ্চয়ই তার খুনের গুপ্ত কথা একজন অজনা লোকের কাছে ব্যক্ত ক'রতো না অকুণ্ঠিতচিত্তে। তার সন্দেহ হ'তো নিশ্চয়, এবং এই অবান্তর গুপ্ত খবর জানতে চাওয়ার জন্য সৌমেনকেও হয়তো বিপদগ্রস্ত হ'তে হতো। একটু ইতস্তত ক'রে সৌমেন জিজ্ঞেস ক'রলে, তোমার অনুতাপ হচ্ছে?

হো হো ক'রে হেসে উঠলো বিশে, একান্ত তাচ্ছিল্যভরে ব'ললে, তুই শালা কি পাগল নাকি! বিড়িটিড়ি আছে? থাকে তো দে একটা?

বিড়ি না পেয়ে ক্ষুণ্ণমনে বিরক্তিভরে বিশে চ'লে গেল। সৌমেন বিশের দিকে চেয়ে নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তার অন্তরের মধ্য থেকে কে যেন ব'ললে অস্ফুটকণ্ঠে, বাঃ দিব্যি হেসে খেলে বেঁচে আছে। বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই, আশ্চর্য্য!

দশ

গোধূলির আলো-আঁধারে ঢেকে আসছে ধরণীর মুখ। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আভায় ছেয়ে গেছে পশ্চিম আকাশ। গাছের মাথায় ছড়িয়ে প'ড়েছে রক্তরাঙা সোনালী আলোর রেখা। সান্ধ্য বাতাসে ভর ক'রে পাখীর ঝাঁক বোধ হয় ফিরে চ'লেছে নিজেদের আশ্রয়ে।

পালতোলা নৌকার মত রাশি রাশি টুকরো মেঘের দল দলবেঁধে সারা আকাশ ছেয়ে ভেসে যাচ্ছে দূর হ'তে দূরান্তরে, দৃষ্টির অন্তরালে। পশ্চিম-পারের দীর্ঘ বাড়ী আর গাছগুলোর অস্পষ্ট কম্পিত ছায়া প'ড়েছে গঙ্গার স্নিগ্ধ কালো জলে। ধীর, স্থির, মন্থরগতিতে গঙ্গা সান্ধ্য সমীরণে হেলেদুলে চ'লেছে যৌবন মদমত্তা লাজনম্রা তরুণী বধূটির মতো।

বিপুলের বরানগরের বাড়ীটা ঠিক গঙ্গার ওপর। বাড়ী নয়—বাগানবাড়ী। আজ ক'দিন হ'লো বিপুলরা এখানে এসেছে। সহরের একঘেয়েমি ভাল না লাগলে তারা মাঝে মাঝে এখানে এসে দিন-কয়েক কাটিয়ে যায়। সহরকে সহর আবার পাড়াগাঁকে পাড়াগাঁ, পরিবর্ত্তন হিসাবে দিনকয়েক মন্দ লাগে না, বেশ ভালই লাগে। বাড়ীটা যেন প্রকৃতির লীলানিকেতন। শুধু বাড়ীখানাই বাগানের মধ্যে নয়, বাড়ীর মধ্যেও বাগান। নানারকম ফুলের গাছ প্রাঙ্গণের আধখানা জুড়ে আছে। বিপুলের চেয়ে বাড়ীখানা বেশী পছন্দ করে অঞ্জলী, তাইতো তার এখানে আসবার এত বেশী জেদ। শুধু ফুল আর ফলের গাছই সর্ব্বস্ব নয়, তা ছাড়া আরো অনেক কিছুই এখানে আছে। কয়েক জোড়া হাঁস, মোরগ, দুটো গাইগরু। এখানে থাকলে ডিম আর দুধ কিনে খেতে হয় না। দু'জোড়া ময়ূর ছিল, একটা সেদিনের ঝড়ে ছাত থেকে উড়ে-আসা টিন চাপা প'ড়ে ম'রে গেছে। বাকী তিনটে সারা বাগানময় ঘুরে বেড়ায় প্যাখম তুলে নৃত্য ভঙ্গিতে, ওদের দেখতে ভারী ভাল লাগে অঞ্জলীর। গত বছর বিপুল একটা বাচ্চা সমেত হরিণ কিনেছিল। এক বছরেই বাচ্চাটা বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে কিন্তু এখনো মার কাছ ছাড়া হ'তে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। ভারি নিরীহ জীব, অঞ্জলী আদর ক'রে ওদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ডাকলেই হরিণটা ছুটতে ছুটতে অঞ্জলীর কাছে এসে দাঁড়ায়, ভারি পোষ মেনেছে জানোয়ারটা।

সন্ধ্যার কিছু আগে দোতলার জানলায় গরাদ ধ'রে উদাসনয়নে গঙ্গার দিকে চেয়ে একমনে দাঁড়িয়েছিল অঞ্জলী। সান্ধ্য সমীরণে চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে মুখের ওপর উড়ে এসে প'ড়ছিল। তন্ময় হ'য়ে সে যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

বিপুল ঘরে ঢুকে ব'ললে, তুই দিন রাত্তির কি ভাবিস বল্‌তো, অঞ্জু?

অঞ্জলীর চমক ভাঙলো, সে ম্লান হাসি হেসে ব'ললে, বাঃ-রে কি আবার ভাববো?

বিপুল ধীরে ধীরে অঞ্জলীর কাছে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রেখে সস্নেহে ব'ললে, আমার বোন হ'য়ে তুই সেই খুনীটার কথা ভাবিস না নিশ্চয়?

—কি যে বল, দাদা! তুমি ব'সো—চা নিয়ে আসি! শেষ কথা'কটা ধরা গলায় ব'লতে ব'লতে অঞ্জলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না যাওয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল না। ব্যথার স্থানে সামান্য আঘাতেই মানুষের বিশেষতঃ নারীর চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। চোখের উদ্গত অশ্রু রোধ ক'রতে না পেরে অঞ্জলী অন্তরালে স'রে আসতে বাধ্য হলো। যত বড় নিকট আত্মীয়ই হোক. নারী সহজে নিজেকে ধরা দিতে চায় না। ব্যথার আগুনে সে নিজে জ্বলে-পুড়ে ম'রবে তিলে তিলে, তবু অন্যের কাছে নিজেকে ধরা দিয়ে অন্তরের ব্যথা লাঘব প্রাণান্তেও ক'রতে চাইবে না। ব্যথার ব্যথীকে নিজের ব্যথার অংশ দেওয়া নারীর পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও মর্ম্মান্তিক। ধরা ওরা সহজে দেয় না স্বেচ্ছায়, অবশ্য ধরা প'ড়লে সে কথা স্বতন্ত্র!

বিপুলের কাছে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাওয়ার মত কঠোর নির্লজ্জতা ও নির্ম্মমতা আর তার জীবনে দ্বিতীয় কিছু নেই। বিপুলের

পক্ষে সেটা যে কত বড় আঘাত তা কল্পনাও করা যায় না। যে তার দাদার জীবন ব্যর্থ ক'রেছে, তার নিজের জীবনকে যে ক'রেছে উপহাস, তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি অঞ্জলী কিন্তু হ'য়েছে ব্যর্থকাম। অঞ্জলী চায় সৌমেনের স্মৃতি ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিতে কিন্তু ঘটে তার বিপরীত, শ্রদ্ধার পাত্ররূপে সৌমেনের ছবি দিবানিশি জাগে তার মানসনয়নে।

বিপুল সারা ঘরময় বারকয়েক পায়চারি ক'রে জানলার গরাদ ধ'রে গঙ্গায় দিকে চেয়ে রইলো।

কি যে অঞ্জু ভাবে, কেন যে অঞ্জু ভাবে—একথা জানে কি শুধু অঞ্জু একা? বিপুল কি কিছুই বোঝে না? বোঝে নিশ্চয় এবং বুঝেও করে না বোঝার ভান! বিপুল চায়,—তার বোনও তারই মত চাইবে খুনী সৌমেনের ওপর প্রতিশোধ নিতে। যে তার জীবন ব্যর্থ ক'রেছে তার ওপর অঞ্জলীর সহানুভূতি, প্রেম, শ্রদ্ধা থাকা কোনমতেই উচিত নয়। তা' যদি থাকে তাহ'লে অঞ্জলী বিদ্রোহী; তার দাদার বিরুদ্ধে, নিজের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহিতা ক'রছে! নাঃ, বিদ্রোহিনী সে হতেই পারে না, হাজার হ'লেও অঞ্জলী মানুষ তো?

অঞ্জলী চা নিয়ে এলো।

স্মিতহাস্যে ভগ্নীর হাত থেকে চায়ের পিয়ালাটি নিয়ে বিপুল ব'ললে, আচ্ছা, বাড়িতে এত লোক থাকতে প্রতিদিন তুই চা নিয়ে আসিস্ কেন বল্‌তো?

—এ যে আমার চিরদিনের অভ্যাস, দাদা!

—তা' বটে! তোর চা কৈ—?

হাসতে হাসতে অঞ্জলী ব'ললে, আমি পরে খাবো।

—না, তোর চা-ও দিতে বল্। আজ ভাই-বোন এক সঙ্গে চা খাবো।

—আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কোন নেশার বশীভূত হওয়া মেয়েছেলের উচিত নয়, নয় দাদা? ওটা একটা বিলাসিতা!

বিপুল বিস্ফারিতনেত্রে অঞ্জলীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এ ঔদাসীন্য শুধু কি অঞ্জুর চায়ের ওপর, না জীবনধারণ উপযোগী সব কিছুরই ওপর। ভোগ-সুখে জলাঞ্জলী দেওয়ার, বিলাসিতা বর্জ্জন করার মূলে অঞ্জলীর খেয়াল ছাড়া কি আর কিছুই নয়? বিপুল নিজেকে সংযত করে; মনের ভাব মুখের ভাষায় প্রকাশ করে না।

বিপুল শুষ্ক হাসি হেসে বলে, তুই একটা পাগলি! চা খাওয়া তোর ছেলেবেলার অভ্যাস, হঠাৎ চা ছাড়লে একটা অসুখ-বিসুখ ক'রতে পারে। হয়তো মাথাই ধ'রবে, গা-হাত তেমন জুতসই ব'লে মনে হবে না; আর সবচেয়ে দামী কথা যে,—কোন কাজে উৎসাহ পাবি না। ওসব ছেলেমানুষী রাখ্, চা আনতে বল্? একান্ত যদি কোনদিন যুক্তি-পরামর্শ ক'রে চা ছাড়তেই হয়—তবে ভাই-বোন এক সঙ্গে ছাড়বো। শুধু ছাড়বো নয়, চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম, চাকর, ড্রাইভারদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো—যায় চামচেটা পর্য্যন্ত!

অগত্যা অঞ্জলীকে দাদার সামনে ব'সে চা খেতেই হয়।

বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে সন্ধ্যার পর বিপুল বেরুবার সময় অঞ্জলী ব'ললে, আজ আর ফিরতে রাত করোনা, দাদা! কোলকাতা হ'লে নয় কথা ছিল, এখানে বেশী রাত পর্য্যন্ত একা থাকতে আমার ভয় হয়?

—এতগুলো চাকর, ঝি, দরোয়ান; ভয় কিসের? আচ্ছা, আমি শীগ্‌গীর ক'রেই ফিরবো।

বিপুল গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সত্যি আজকাল বাড়ী ফিরতে তার বড্ড বেশী রাত হ'চ্ছে। বিপুল ভাবলে, গীতা বেঁচে থাকলে অঞ্জলীর জন্য আজ আর তার কোন চিন্তাই

ছিলো না। এতো রাত ক'রে বাড়ী ফেরার পরোক্ষ কারণই তো গীতার অপঘাত মৃত্যু! খুনীর সন্ধান ক'রতেই তো রাতের আঁধারে আত্মগোপন ক'রে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাগলের মত মরিয়া হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ ভাবে এক আর বিধাতার বিচারে ঘটনা দাঁড়ায় ঠিক তার বিপরীত! অঞ্জলীর অশান্ত মনে শান্তির প্রলেপ দিতেই তো বিপুল চেয়ে ছিল গীতাকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনতে, নইলে আরো কিছুদিন অনায়াসেই তো প্রতীক্ষা ক'রতে পারতো; কিন্তু তা' হবার নয়। একেই বলে বিধিলিপি!

ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্বেও বিপুল সেদিনও রাত বারোটার আগে বাড়ী ফিরতে পারলে না। বাইরে বেরুলেই কাজের নেশা যেন তাকে পেয়ে বসে, সে তখন জগৎসংসার ভুলে গিয়ে কাজের মাঝে ডুবে যায়। সৌমেনকে খুঁজে বার করা ছাড়া অন্য কাজের কথা বাইরে বেরিয়ে সে আর ভাবতেই পারে না। প্রতিহিংসার আগুনে দিবারাত্রি তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে, সে আগুন না নিবিয়ে অন্য কাজ! অসম্ভব!

বিপুল যখন বাড়ী ফিরলো রাত তখন বারোটা বেজে কয়েক মিনিট হ'য়েছে। অঞ্জলী ঘরে ব'সে কি-একখানা বই প'ড়ছে আর বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, পড়ায় আর তখন মন নেই। মোটারের আওয়াজ পেয়ে সে বইখানা বন্ধ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরকে লুচি ভাজতে ব'ললে। গরম লুচি বিপুলের প্রিয় খাদ্য, গরম ছাড়া ঠাণ্ডা জিনিষ যতই উপাদেয় হোক—সে খেতে পারে না।

অঞ্জলী বল'লে, আজ আবার এত দেরী ক'রে ফিরলে, দাদা?

হাসতে হাসতে বিপুল ব'ললে যতই চেষ্টা করি না কেন—

—আগে মুখ-হাত ধুয়ে নাও, লুচি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে!—ব'লে অঞ্জলী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

খেতে ব'সে বিপুল ব'ললে, খাবো কি—ঘুমেই চোখ জড়িয়ে আসছে!

—রোজ এত বেশী খাটলে কি শরীর সুস্থ থাকে, দাদা?

—ঠিক বলেছিস তুই, কাল থেকে সত্যি একটু কম ক'রে খাটবো।

—ঘুমের দোহাই দিয়ে ওক'খানা লুচি যে পাতে ফেলে রাখবে—তা হবে না! আজ একখানি লুচিও ফেলে রাখতে পারবে না। ঠাকুর আর-একটু মাংস দিয়ে যাও।

বিপুল ব'ললে, হ্যাঁ, তোর ভাগের মাংসটুকুও আমাকে খাইয়ে দে!

—আমি তো মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি! ব'লেই অঞ্জলী ঈষৎ সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো।

—তোর ব্যাপার কি বল্‌তো, অঞ্জু? তুই চা খাওয়া ছেড়েছিস, মাংস খাওয়া ছেড়েছিস, আর দু'দিন পরে হয়তো খাওয়াটাই ছেড়ে দিবি! বলি এ রকম ক'রলে বাঁচবি কি ক'রে?

—খাওয়া-দাওয়ার বেশী বিলাসিতা করা মেয়েদের ভাল নয়, তাই একটু সংযত হ'য়েছি মাত্র। তোমার চিন্তার কিছু নেই. আবার ইচ্ছা হ'লেই খাবো।

—নিশ্চয়ই তোর কোন অসুখ ক'রেছে, তা নইলে খেতে ইচ্ছা যাবে না কেন?

—তা ব'লে কাল যেন ডাক্তারবাবুকে ফোন ক'রে ব'সো না! বিশ্বাস কর, আমার কিছু হয় নি; শরীর ভালই আছে। আগেকার চেয়ে তোমার শরীরটা বরং এখন অনেক খারাপ হ'য়ে গেছে। আচ্ছা দাদা, দিন নেই রাত নেই—চব্বিশ ঘণ্টা থাকো কোথা? আর তোমার এত কাজই বা কিসের! এখন দেখছি তোমার কাজের মাত্রাও হঠাৎ বেড়ে গেছে!

খেতে খেতে বিপুল ব'ললে, থাকি পথে-পথে। রাস্‌কেলটা আমায় হায়রাণ ক'রিয়ে ছাড়লে!

আকুল আগ্রহে অঞ্জলী ব'ললে, কে দাদা ?

তাচ্ছিল্যভরে বিপুল ব'ললে, কে আবার ! সেই খুনীটা !

বিস্ময়বিহ্বল জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অঞ্জলী বিপুলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

বিরক্তিভরাকণ্ঠে বিপুল ব'ললে, সৌমেন—আবার কে !

সরকারের তরফ থেকে সৌমেনকে খুঁজে বার করার ভার যে বিপুল স্বেচ্ছায় নিয়েছিল একথা অঞ্জলীর অজানা নয়। তার বিশ্বাস—দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে সৌমেনকে রক্ষা করার এ একটা ছল বিপুলের। আসামীকে সন্ধান করার অজুহাতে বিপুল দেবে তাকে আত্মগোপনের সুযোগ, পালাবার অবসর, নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করার নূতন পন্থা। ভাবতে ভাবতে অঞ্জলী নিজেও অনেক সময় সৌমেনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়েছে, এবং তাদের ভাই-বোনের জীবন ব্যর্থ করার জন্য দিয়েছে তাকে নিদারুণ, মর্ম্মান্তিক অভিশাপ ; কিন্তু একটি দিনের জন্য সে ভুলেও করেনা তার মৃত্যু কামনা। সে যাকে চায় পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখতে—তার দাদা চায় চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে তার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলতে ! তার পথ আর তার দাদার পথ এক নয়। এত দিন সে ভুল বুঝেছে বিপুলকে। সে জানতো—তার মত তার দাদাও সৌমেনের শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আজ তার সে ভুল ভাঙ্গলো ! বড় অভিমান হ'লো তার দাদার ওপর, মনে হ'লো—দাদার স্নেহ ভালবাসা সবই মৌখিক ; তার মধ্যে আন্তরিকতা নেই। তা' যদি থাকতো তবে বিপুল নিশ্চয়ই সৌমেনকে রক্ষা করার চেষ্টা ক'রতো। নিজের ব্যর্থ জীবনের প্রতিশোধ নিতে বিপুল চায় অঞ্জলীর জীবনটাও ব্যর্থতার হাহাকারে ভ'রে দিতে ! প্রতিহিংসার বশে মানুষ এত হীন, এত স্বার্থপরও হ'তে পারে !

কোন দিন সে কাঁদেনি এমন উচ্ছ্বসিতভাবে, আজ কিন্তু আর সে

নিজেকে স্থির রাখতে পারলে না। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে ছোট্ট মেয়ের মত ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো! সৌমেনের জন্য সে ভেবেছে আকুল অন্তরে কিন্তু এমনভাবে কাঁদেনি কোন দিন। নিজের ভাই যদি মুখের দিকে না চায়—উলটে শত্রুতা—হ্যাঁ শত্রুতা করে, তবে নিদারুণ অভিমানে চোখের জল রোধ করা দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে ওঠাই স্বাভাবিক! কাঁদতে কাদতে মনে হয় যেন বিপুল সৌমেনকে ফাঁসীর মঞ্চে তুলে দিয়ে তার গলায় নিজের হাতে ফাঁসীর দড়ি পরিয়ে দিচ্ছে! আতঙ্কে শিউরে ওঠে অঞ্জলী, সারা গা তার কাঁটা দিয়ে ওঠে; ভয়ে জিব শুকিয়ে আসে, অঞ্জলী ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে তার মনে পড়ে গত দিনের কথা। আজ যদি তার বাবা, মা বেঁচে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁ'রা বিপুলের কাজে বাধা দিতেন এবং কৃতকার্য্য হ'তেন। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগিনী সেই মেয়ে—যে মেয়ে শৈশবেই পিতৃমাতৃহারা! বিপুলকে বাধা দেবার মত বা তাকে স্বপক্ষে আনার মত কতখানি শক্তি ধরে অঞ্জলী! সৌমেনকে বাঁচাবার কোন পন্থাই সে নির্দ্ধারণ ক'রতে পারে না, পরিশ্রান্ত অঞ্জলীর চোখের জল ফেলাই সার হয়।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল অঞ্জলী, হঠাৎ কিসের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে ব'সলো অঞ্জলী, ব'সে ব'সে হঠাৎ কি যেন তার মনে প'ড়লো। সো-কেসের চাবি খুলে বার ক'রলে ফুলের মালা জড়ান একখানি ফটো, ফটোখানি টেবিলের ওপর রেখে আগের দিনের শুকনো মালাটা খুলে পিছনের জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দিলে। টেবিলের ছোট্ট ড্রয়ারটা খুলে অঞ্জলী বার ক'রলে কলাপাতা জড়ান সদ্য-আনা একটি টাটকা তাজা ফুলের মালা, দিলে সেটি ফটোর চারিধারে যেমন ক'রে ঠাকুর দেবতার ফটোয় লোকে ফুলের মালা দেয়। মালা দিয়ে সাজিয়ে সে ছলছল

জলভরা চোখে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ ফটোখানির দিকে, তারপর গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে ক'রলে প্রণাম !

বাগানের দিকে আর্সির ওপর টোকা মারার শব্দে অঞ্জলী চমকে উঠলো। চেয়ে দেখলে বন্ধ কাটা-কপাটের ওধারে আর্সির ধারে এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি।

আতঙ্ক-মেশানো স্বরে অঞ্জলী জিজ্ঞাসা ক'রলে, কে— ?

সার্সির ওপর চকিতে স'রে এলো একখানি মুখ, ব'ললে, ভয় নেই, আমি !

কম্পিতকণ্ঠে অঞ্জলী ব'ললে, আমি ! আমি কে ?

—আঃ চুপ্—আস্তে ! দরজা খোল।

সাহসে ভর ক'রে সার্সির ধারে এগিয়ে এলো অঞ্জলী, ব'ললে ঈষৎ চাপা গলায়, কে তুমি ?

—আমি ! আমি সৌমেন।

দরজা খুলতে অঞ্জলী ইতস্ততঃ করে।

—কণ্ঠস্বরে বুঝতে পার্চ্ছো না ? ভয় পাবার কি আছে ? খোল শীগ্‌গীর !

—তুমি কেন এসেছো ?

সৌমেন ব'ললে, দরজা খোল, ব'লছি !

অঞ্জলী দরজা খুলে পাশে স'রে দাঁড়াল। সৌমেন ঘরে ঢুকেই চার পাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজায় খিল দিতে গেল ! বাধা দিয়ে অঞ্জলী ব'ললে, খিল দি'চ্ছ কেন ?

—ভয় নেই, তোমায় খুন করবো না ! ব'লেই একরকম জোর ক'রে সৌমেন দরজার খিলটা এঁটে দিলে।

যত বড় সাহসীই হোক আর যত বেশী প্রেম-ভালবাসা থাকুক না কেন—এরকম অবস্থায় একটা খুনীকে মানুষের ভয় পাওয়া মোটেই

অস্বাভাবিক নয়। দরজায় খিল দিতে দেখে সত্যই অঞ্জলী ভয় পেয়ে গেল। সৌমেন কি তাকেও খুন ক'রতে চায় নাকি? কি তার অভিপ্রায়! অথচ বাধা দেবার বা চীৎকার ক'রে কাকেও ডাকবারও উপায় নেই, সৌমেনের তাতে কি কল্পনাতীত বিপদই না ঘটতে পারে! এক দিকে নিজের প্রাণের ভয়, অন্য দিকে সৌমেনের জীবন; উঃ এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মানুষের জীবন খুবই কম আসে। সাহসে ভর ক'রে অঞ্জলী জিজ্ঞাসা ক'রলে, অমন ক'রে মুখের দিকে চেয়ে দেখছো কি? কি চাই তোমার?

সৌমেন স্থিরনেত্রে অঞ্জলীর মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চল কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো, একটা কথাও ব'লতে পারলে না। চেয়ে চেয়ে শুধু তার চোখের কোণ দুটো জলে ভ'রে গেল।

—বল, চুপ করে রইলে যে? কি চাও তুমি?

ভাবাবেশে রুদ্ধকণ্ঠে সৌমেন ব'ললে, কিছু না। শুধু—শুধু ক্ষমা।

ঈষৎ কঠিনকণ্ঠে অঞ্জলী ব'ললে, চমৎকার অভিনেতা তুমি! ক্ষমা! ক্ষমা চাইতে এসেছো? তার চেয়ে এই ঘরে তুমি আমায় খুন করে রেখে যাও—যা তুমি পারবে!

সৌমেন নীরব, নিশ্চল!

—লজ্জা করে না তোমার ক্ষমা চাইতে আসতে? তুমি শুধু আমার বৌদিকে খুন করোনি, আমার—আমার—ব'লতে ব'লতে অঞ্জলীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'লো।

সৌমেন সসঙ্কোচে অঞ্জলীর হাতটি দু'হাতে চেপে ধরে অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে ব'ললে, আমায় বাঁচাও, অঞ্জু! আমায়—আমার ভুল সংশোধন ক'রবার অবসর দাও; আমায় বাঁচতে সাহায্য করো। বিশ্বাস কর অঞ্জু, আমি অনুতপ্ত! প্রাণের ভয় যে এত, মানুষের বাঁচবার সাধ যে এত বেশি আগে তা জানতাম না, আমি চাই বাঁচতে!

জানি আমি—কত বড় অবিচার তোমার ওপর ক'রেছি, তবু—তবু বাঁচবার আশায় ছুটে এসেছি তোমারি কাছে। পৃথিবীর সবাই আমায় ঘৃণাভরে ত্যাগ ক'রলেও একজন আমায় ত্যাগ ক'রবে না, এ বিশ্বাস আমার আজও আছে, অঞ্জু!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গম্ভীরমুখে অঞ্জলী ব'ললে, না—তুমি ক্ষমার অযোগ্য! তোমাকে দেখলে—তোমার কথা ভাবলে ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে! তুমি এখান থেকে চ'লে যাও!

—এটাই কি তোমার মনের কথা, অঞ্জু?

বিদ্রূপের হাসি হেসে অঞ্জলী ব'ললে, এখনো মনে ক'রো যে অঞ্জু তোমাকে সেই আগেকার চোখেই দেখবে?

—নিশ্চয়! সে বিশ্বাস আজও আছে!

অঞ্জলী ব'ললে, ভুল!

কঠোর কণ্ঠে সৌমেন ব'ললে, ভুল? আমার ধারণা ভুল? পৃথিবীতে তাহ'লে আমার ব'লতে একজনও নেই? বেশ, তবে আর চ'লে গিয়ে লাভ কি! যার কেউ নেই তার বাঁচবার সাধ, প্রাণের মায়াও থাকতে পারে না; সে মরিয়া! আমি নিজে গিয়ে তোমার দাদাকে ধরা দিচ্ছি! ব'লতে ব'লতে সৌমেন সশব্দে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন ভেবে অস্ফুটকণ্ঠে অঞ্জলী ডাকলে, শোন।

শুনেও শুনলে না সৌমেন, সে মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে চ'ললো। অঞ্জলী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলে না, সে পড়ি-কি-মরি হ'য়ে ছুটে গিয়ে সৌমেনকে টানতে টানতে এনে ঘরের দরজা অতি সন্তর্পণে অর্গলবদ্ধ ক'রলে।

সৌমেন একটা কথাও ব'ললে না। আর দাঁড়াতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে সে মেজের ওপর অবসন্নভাবে ব'সে পড়লো, ক্ষীণ কণ্ঠে ব'ললে, এক গেলাস জল!

খালিপেটে জল খেয়ে গাটা গুলিয়ে উঠলো; মাথাটার ভার মনে হলো খুবই বেশী ; সৌমেন মেজের ওপর লুটিয়ে প'ড়লো। পাখাটা খুলে দিয়ে অঞ্জলী সৌমেনের মাথার কাছে ব'সে আর্ত্তকণ্ঠে ব'ললে, এমন ক'রছো কেন ?

সৌমেন নিজের হাতে মাথা রেখে চোখ বুজে রইলো, কোন উত্তরই দিলে না। অঞ্জলীর কেমন ভয় হলো, সে যে কি ক'রবে কিছুই স্থির ক'রতে পারলে না ; শুধু চঞ্চল ভয়ার্ত্ত চোখে সে সারা ঘরময় চেয়ে দেখলে। তাড়াতাড়ি উঠে এক গেলাস জল নিয়ে এসে সৌমেনের মুখ চোখ মুছিয়ে দিলে, মুখ নীচু ক'রে ডাকলে, শুনছো ?

সৌমেন একবার চোখ মেলে চেয়ে তাকে কথা ব'লতে নিষেধ ক'রে আবার চোখ বুঝলো। অঞ্জলী সৌমেনের দীর্ঘ রুক্ষ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রতে ক'রতে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। কতক্ষণ এভাবে কাটলো কে জানে, ঘড়িতে দু'টো বাজার সাঙ্কেতিক ঘণ্টাধ্বনিতে তার চেতনা ফিরে এলো। সে ধীরে ধীরে সৌমেনের হাতটায় ঈষৎ চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে, শরীরটা কেমন বোধ হ'চ্ছে ?

চোখ মেলে চেয়ে দেখলে, সৌমেন ব'ললে স্মিতহাস্যে, ভয় নেই, তোমার কোলে মাথা রেখে মরার সৌভাগ্য আমার হবে না !

—কিন্তু রাত যে বাড়ছে !

নিতান্ত উদাসীনভাবে সৌমেন জিজ্ঞাসা ক'রলে, ক'টা বাজলো ?

—দু'টো বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে ব'ললে সৌমেন চোখ বুজে, ভোর হ'তে এখনো ঢের দেরী !

—না, না, ভোরের আগেই তুমি এখান থেকে চ'লে যাও ! আচ্ছা, হঠাৎ তমি এমন অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লে কেন ?

মৃদু হেসে সৌমেন ব'ললে, এ কিছু না! খালিপেটে জলটা প'ড়তেই গা কেমন গুলিয়ে উঠলো, মাথাটাকে ঠিক রাখতে পারলাম না। তাই, তাই……এ আমার প্রায়ই হয়।

—খালিপেট কেন, তুমি কি কিছু খাওনি আজ?

মুখে কিছুই ব'ললে না সৌমেন, শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে।

—উত্তর দিচ্ছ না যে?

—শুধু আজ নয় অঞ্জু, আজ তিন দিন হ'লো রাস্তার কলের জল ছাড়া আর কিছুই পেটে যায় নি। অঞ্জলী অবাক হ'য়ে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলো, তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো একটা করুণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস। সৌমেনের মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে অঞ্জলী ব'ললে, ওঠ!

—যাবার সময় তো এখনো হয়নি, এরি মধ্যে উঠবো কেন?

—খাবে চল!

খেতে ব'সে সৌমেন ব'ললে, এই রাত দুপুরে তোমার ঘরে এত খাবার এলো কোথা থেকে?

—তুমি আসবে কিনা তাই আগে থাকতে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম!

—তুমি কি আজকাল গুণতে শিখেছো?

অঞ্জলী কোন জবাব দিলে না।

সৌমেন গোগ্রাসে খেতে লাগলো। সে-ও আর কোন কথা ব'ললে না। খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে হঠাৎ সৌমেন হাত গুটিয়ে অঞ্জলীর মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে, খিদের মুখে সবই তো খেয়ে ফেললাম, তুমি খাবে কি?

—আমি খেয়েছি! ব'ললে অঞ্জলী।

বিশ্বাস ক'রলে না সৌমেন। সৌমেনের বিশ্বাসই ঠিক, অঞ্জলীর

খাওয়া হয়নি। প্রতিদিনের মত আজও ঠাকুর তার খাবার ঢাকা দিয়ে রে'খে গেছলো—যা সে ধ'রে দিলে সৌমেনকে। প্রত্যহ ফটোখানিকে ফুল দিয়ে না সাজিয়ে সে রাত্রে খায় না, তাই তার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে।

খাওয়া শেষ ক'রে সৌমেন ব'ললে, যে কষ্ট তোমায় দিয়ে গেলাম তাতে আজকের রাতটা অন্ততঃ তোমার আমার ছ'জনের জীবনেই অক্ষয় হ'য়ে থাকবে! উঃ! কি খেয়েছি—যাকে বলে সত্যিকারের ফাঁসির খাওয়া!

—থামো, যথেষ্ট হ'য়েছে! তোমার একটু ভয় হ'চ্ছে না! বিরক্ত-ভাবে সৌমেনকে জিজ্ঞাসা ক'রলে অঞ্জলী।

—ভয়? কৈ না, আশ্চর্য্য, ভয়ের কথা আমার এতক্ষণ মনেই ছিল না! অথচ আজ ক'মাস প্রতিটি মুহূর্ত্তে—উঃ! ব'লতে ব'লতে সৌমেন চোখ ছুটো বুজে ক্ষণেকের তরে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

ড্রয়ার থেকে এক তাড়া নোট বার ক'রে সৌমেনের হাতে দিয়ে অঞ্জলী ব'ললে, তুমি কিছুদিনের জন্য ক'লকাতার বাইরে চলে যাও। টাকার দরকার হ'লে অন্য লোকের হাত দিয়ে আমায় লিখে পাঠিও, তোমার হাতের লেখা দাদা চেনে। এখানকার অবস্থা চিঠিতে সব-কিছুই তোমাকে আমি জানাবো। আমি—

ঘড়িতে তিনটে বাজার সাঙ্কেতিক ঘণ্টাধ্বনিতে উভয়ে চমকে উঠলো। অঞ্জু কি ব'লতে যাচ্ছিল—ভুলে গেল। সে তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল দিয়ে সৌমেনকে প্রণাম ক'রে উঠে দেখলে যে, ফটোর মালাটি আসল মালিকের গলায় গিয়ে উঠেছে।

অত্যধিক আনন্দ-বিষাদে তার চোখের কোণ অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। ছল ছল চোখে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সৌমেনও নীরবে কাটা-কপাট পেরিয়ে পাশের

সুপারি গাছ বেয়ে নীচে নেমে হাতছানি দিয়ে ইসারায় কি যেন ব'লে অন্ধকারে মিশে গেল।

* * * * *

ক'দিন হ'লো অঞ্জলী যেন বদলে গেছে। গত দিনের উৎসাহ, চঞ্চলতা, হাসি, কথা—হারিয়ে যাওয়া যা-কিছু সবই সে নূতন ক'রে ফিরে পেয়েছে। বিপুল তো আশ্চর্য্য হলোই, সে নিজেও কম আশ্চর্য্য হলো না। দাদাকে সে কিছুতেই কাছছাড়া ক'রতে চায় না। আগে বিপুলের অনুরোধে সে বৈকালে একদিনের জন্যও বেড়াতে যেতে চাইতো না, এখন সে প্রতিদিন বৈকালে বেড়াতে যাবার জন্য দাদার আগেই প্রস্তুত হ'য়ে ড্রাইভারকে গাড়ী বার ক'রতে বলে। অঞ্জলীর এই বালিকাসুলভ চপলতা ভালই লাগে বিপুলের। এতদিন পরে অঞ্জলী বোধ হয় আপনাতে আপনি ফিরে এলো, সৌমেনের স্মৃতি তার মন থেকে চিরদিনের জন্য মুছে গেছে! স্বস্তির, শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিপুল।

অঞ্জলীর এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনে এত বেশী মুগ্ধ হলো বিপুল যে, সে নিজেকে ছেড়ে দিলে বোনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। অঞ্জলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজই সে করে না। আজকাল সব সময় তাকে বাড়ীতেই কাটাতে হয়, বাইরে বেরুলে অঞ্জলী হয় অসন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে কর্ত্তব্যের কুশাঙ্কুর তাকে বিদ্ধ করে, তাকে সজাগ ক'রে তোলে; কিন্তু অঞ্জলী সামনে এসে দাঁড়ালেই তার সঙ্কল্প ভেঙ্গে যায়। কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে হারানো বোনকে ফিরে পেয়ে আর হারাতে সে পারবে না।

ভাই-বোনের নিত্য কাজের একটা বাঁধাধরা 'রুটিন' তৈরী ক'রেছে অঞ্জলী। এক বিন্দু সময়ও তারা বাজে নষ্ট হ'তে দেবে না, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কাজের মাপকাটি দিয়ে মাপা।

প্রতিদিন সকালে বাঁধা সময়ে বিছানা থেকে উঠে চা পান, তারপর

মালিকে সঙ্গে নিয়ে সারা বাগানময় ঘুরে গাছপালার তদারক। দুপুরে আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম, অপরাহ্নে গল্প, পুস্তকাদি পাঠ এবং চা পান অন্তে সন্ধ্যায় মোটারযোগে সান্ধ্য ভ্রমণ। রাত্রে জ্যোতিষ তত্ত্ব আলোচনা, আবার কোন কোন দিন বা হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা—পুস্তক সাহায্যে।

ঘরোয়া কাজের নেশায় দাদাকে মাতিয়ে রাখতে গিয়ে অঞ্জলী নিজেও মেতে উঠলো। বাগানে সমান জায়গা ভাগ ক'রে নিয়ে তারা ভাই-বোনে দস্তরমত চাষ-আবাদ স্কুরু ক'রে দিলে। মালির সাহায্যে বেড়া দিয়ে জায়গা ঘিরে লাগালে নানা ফুল ও ফলের গাছ। নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে জল নিজেদের ঢালতে হবে, মালি শুধু দেবে জলের জোগান। আগাছা জন্মালে নিজেরা ক'রবে পরিষ্কার। নিজের হাতে গোবরের সার দেবে গাছের গোড়ায়। ভাই-বোনে যেন রেশা-রেশি লেগে গেল—কার গাছে ফুল আর ফল বেশী ফলে তারই চেষ্টায়! ভাইয়ের বাগানে ফুল ফুটলে ভাই সেটি নিজের হাতে বোনকে উপহার দেয় আবার বোনও দেয় তার পালটা জবাব।

বাগানের পশ্চিম ধারের পুকুরটা বহুদিন যাবত ঝাঁজে ভর্ত্তি হ'য়ে স্নান-পানের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছিল, অঞ্জলীর তাগাদায় সেটার স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন না ক'রে আর উপায় নেই। অত বড় দীঘির মত পুকুর—পরিষ্কার ক'রতে লোকজন নেহাত কম লাগলো না। ভাই-বোনের চেষ্টায় পুকুরটার রূপ বদলে গেল। জল বহুদিন বদ্ধ অবস্থায় থেকে একটু লালচে হ'য়েছিল, পেঁকো গন্ধটাও বিশ্রী! কয়েক মণ চুণ ঢেলে দিয়ে জলের রঙ ও স্বাস্থ্য দু'টোই ফিরিয়ে নিয়ে আসা হ'লো। বাঁধানো ঘাট থেকে কতকটা দূরে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে একটা মাচা বাঁধা হ'লো বিপুলের মাছ ধ'রবার জন্য। বহুদিনের পুরানো বোট্‌খানা পুকুরের পাড়ে একটা চালাঘরের মধ্যে এতদিন দৃষ্টির আড়ালে প'ড়ে ছিল।

অঞ্জলীর সেদিকে দৃষ্টি প'ড়লো। মিস্ত্রী ডাকিয়ে নূতন কাঠ, লোহা প্রভৃতি আনিয়ে বোটখানা মেরামত ক'রতে কম টাকা খরচ হ'লো না! সংস্কৃত দীঘির বুকে বোটখানা যেদিন নামানো হ'লো সেদিন অঞ্জলীর আনন্দ আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অঞ্জলী বোটখানার নামকরণ ক'রলে ময়ূরপঙ্খী। পুকুরের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য গোটা দশেক বড় হাঁস কিনে আনা হ'লো।

মাস দুয়েকের মধ্যে বাগান, বাড়ী, পুকুর, জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির রূপ বদলে দিলে ওরা দু'ভাই-বোনে। বাগানে ঢোকবার ফটকটার রুচি-সম্মত সংস্কার ক'রিয়ে শ্বেতপাথরে লেখান হ'লো—গীতা-কানন! গীতার বিভিন্ন 'পোজে' ছোট, বড়, মাঝারি নানারকমের 'অয়েল পেন্টিং' করিয়ে সারা বাড়ী ভরিয়ে দিলে অঞ্জলী।

গ্রীষ্ম থাকতে থাকতেই বর্ষার আবহাওয়া দেখা দিলে।

বিপুল ব'ললে, এখানের কাজ তো আপাততঃ শেষ হ'লো! চল্ অঞ্জু, এবার ক'লকাতার বাড়ীতে ফিরে যাই? বর্ষা নামলে ভয়ানক মশার উপদ্রব হবে। তখন আর একটা দিনও তিষ্ঠুতে পারবো না, তাছাড়া ম্যালেরিয়া তো আছেই।

অঞ্জলী প্রতিবাদ ক'রে ব'ললে, সারা বাগান, বাড়ী পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ ক'রছে। মশা কোথা থেকে আসবে?

হাসলে বিপুল। ব'ললে, তোর বাগান নয় নন্দনকাননে পরিণত, কিন্তু আশপাশেপর দিকে চেয়ে দেখেছিস কি? বেশ তো, বর্ষাটা ক'লকাতায় কাটিয়ে আবার ফিরে এলেই তো চলবে। একমাত্র বাগানের গাছ-গাছড়ার কাজ ছাড়া সব কাজই আমাদের রুটিন মাফিক্ ক'রতে হবে, এখানেও যা—সেখানেও তা। এক জায়গায় অনেক দিন থাকতে তোর ভাল লাগে? আমার তো স্বর্গে গেলেও একটানা ভাবে থাকতে ভাল লাগে না।

ক্ষণেক চুপ ক'রে থেকে অঞ্জলী ব'ললে, কিন্তু আমার কাজ যে এখনো বাকি।

বিস্মিতকণ্ঠে বিপুল ব'ললে, আবার কি কাজ?

—রাস্তার ধারে দক্ষিণ দিকে বৌদির নামে একটা মন্দরি আর সঙ্গে একটা নাটমন্দির করাতে হবে। ওখানে প্রতি দিন যাতে অন্ততঃ পঁচিশজন ভিখারী অন্নভোগ পায় তার জন্য ক'রতে হবে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা।

বিপুল বোনের মুখের দিকে বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে চেয়ে রইলো।

—কি ভাবছো, দাদা?

বিপুল ব'ললে, ভাবছি, এসব বড় বড় পরিকল্পনা তোর মাথায় আসে কোথা হ'তে!

অঞ্জলী হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বিপুল ব'ললে, এক কাজ কর্, অঞ্জু! ইট না কিনে, ইট তৈরী করিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা কর? পোড়া ইটের পাঁজা বর্ষার জলে ভিজে পাকা হোক, বর্ষা পেরুলে পূজার পর বরং কাজে হাত দিবি। আগামী নব বর্ষে পয়লা বোশেখ তোর মন্দিরের হবে উদ্বোধন, ইতিমধ্যে ধীরে সুস্থে মনের মত ক'রে কাজ শেষ ক'রতে পারবি।

অঞ্জলী সম্মত হ'লো।

পরের দিন থেকেই ইট তৈরীর তোড়জোড় সুরু হ'য়ে গেল।

কথা হ'লো, একটা শুভ দিন দেখে ইটের পাঁজায় আগুন দিয়ে ওরা ক'লকাতার বাড়ীতে ফিরে যাবে। বর্ষা নামলে ইট তৈরীর ব্যাঘাত হবে, কাজেই দেরী ক'রে কাজে হাত দেওয়ার সময় নেই; বেশ তাড়াতাড়িই কাজ সারতে হবে, কারণ বর্ষা নামার আর খুব বেশী দেরী নেই। কাজেই অঞ্জলীও তার দাদারই মত তৎপর না হ'য়ে পারলে না।

অঞ্জলীর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম, সে চেয়েছিল আরো কিছুদিন তার দাদাকে ঘরোয়া কাজে আটকে রেখে তার অন্তরনিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত ক'রতে। কিন্তু ঘটনাচক্রে আর দেরী করা সম্ভব নয়। অঞ্জলী ভাবে যে, এত দিনে দাদা তার নিশ্চয়ই সৌমেনকে ভুলে গেছে; ভুলে না গেলেও তার পিছু-নেবার অদম্য বাসনা দমিত হ'য়েছে, অন্ততঃ পূর্ব্বের সে উৎসাহ আর নেই। সৌমেনও নিশ্চয় এত দিনে এমনি সুন্দরভাবে আত্মগোপন ক'রে আবার নূতন ক'রে তার জীবন আরম্ভ ক'রেছে যে, এখন সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে; তাকে ধরা খুবই শক্ত। অঞ্জলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

অঞ্জলীর বিবেক বলে যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে কর্ত্তব্য-চ্যুত করা ঘোর অন্যায়; মহাপাপের কাজ। সরকার বাহাদুর জানে যে, অপরাধীর সন্ধানে বিপুল যথাযথভাবে আত্মনিয়োগ ক'রেছে; কিন্তু অঞ্জলী ছলে-কৌশলে বিপুলকে তা ক'রতে দেয়নি। অধিকন্তু সে দিয়েছে খুনীকে প্রশ্রয়। সাধারণের চোখে, সমাজের চোখে, তার দাদার চোখে ধূলো দিতে পা'রলেও, সে ভগবানের চোখে ধূলো দিতে পারবে না; তাই এই স্বেচ্ছাকৃত পাপের সাজা তাঁর কাছে জমা হ'য়ে রইলো। মানুষের কাছে নিষ্কৃতি পেলেও বিধাতার কাছে তার কাজের কৈফিয়ৎ দিয়ে শাস্তির পশরা তাকে মাথায় ক'রে নিতে হবেই হবে!

ভাবতে ভাবতে অঞ্জলী আনমনা হ'য়ে যায়। ভুলে যায় সমাজ, সংসার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; ভেসে ওঠে চোখের সামনে একজনের একখানি অনুতপ্ত মুখ! সে মুখ কি ভোলবার!

কাজের অবসরে সে সৌমেনকে নিয়ে খেলা করে নিজের মনে। সৌমেন এখন কোথায় আছে, কি ভাবে আছে—জানতে তার ইচ্ছা হয়। একখানা পত্র দেওয়া তার উচিত ছিল। অতি বড় নিষ্ঠুর সে! নাঃ, পত্র না দিয়ে সে ভালই ক'রেছে, বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছে; কি

কাজ পত্র দিয়ে? ওতে বিপদ আছে। পত্র দেওয়া ভাল নয়, ধরা পড়ার বেশী সম্ভাবনা। কে জানে কার হাতে ব'লতে কার হাতে চিঠি এসে প'ড়বে! অঞ্জলীর দৃঢ়বিশ্বাস যে, ভালবাসার জোরে সে-ই রাখবে সৌমেনকে বাঁচিয়ে। একদিন না একদিন, সুদূর ভবিষ্যতে দুঃখ অমানিশার ঘোর অন্ধকার আপনিই কেটে যাবে; সেদিন—সেদিন—ভাবতে পারে না অঞ্জলী, অত্যধিক আনন্দে তার দুটো চোখ জলে ভরে আসে। আর যাই করুক সৌমেন, অঞ্জলীর ভালবাসার সে কোন দিনও অমর্য্যাদা ক'রবে না, তা কি সে পারে!

বরানগরের বাগানে থাকার আরো একটা উদ্দেশ্য আছে অঞ্জলীর, তবে সেটা মুখ্য নয়—গৌণ। সৌমেন খেয়ালী, খেয়ালের বশে যদি কোন দিন ফিরে আসে তবে এই বরানগরের বাড়ী তার পক্ষে অঞ্জলীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রশস্ত স্থান। অঞ্জলীর অজান্তে তার অন্তরাত্মা চায় সৌমেনের সাক্ষাৎ, ক'লকাতার বাড়ীতে ফিরে যেতে না চাইবার এও একটা বিশিষ্ট কারণ।

* * * * *

সেদিন ক'লকাতা থেকে ফিরে ভয়ানক মুষড়ে প'ড়লো বিপুল। সি. আই. ডি. ডিপার্টমেণ্ট থেকে চিঠি পেয়ে সে গিয়েছিল সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে। চালচলন, হাবভাব, চেহারা এবং কথাবার্ত্তায় তিনি কতকটা সাহেব এবং সাহেবী ভাবাপন্ন; আসলে তিনি বাঙালী।

খবরের কাগজের দু'খানা 'কাটিং' তিনি এগিয়ে ধ'রে ব'ললেন, Just go through it! It is a matter of regret, Mr. Bose যে, আজও আপনি খুনীটার সন্ধান ক'রতে পারলেন না! শুনলাম—কিছু মনে কর্বেন না সেই খুনীটা আপনার বিশিষ্ট বন্ধু। বিপুল উত্তরে ব'ললে, Once he was my dearest friend but now he is my bitterest enemy. আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে সে বিয়ের রাত্রে

আমারই স্ত্রীকে হত্যা ক'রেছে! তা ছাড়া—Duty is duty! For the sake of duty—

সাহেব হেসে ব'ললেন, Hope—your sense of duty will soon prove your sincerity!—

—Of course! ব'লে অভিবাদন জানিয়ে ক্ষুণ্নমনে বিপুল বাড়ী ফিরে এলো।

গত দু'দিন যাবৎ বিপুল যেন উঠে-পড়ে লেগেছে বরানগরের কাজ শেষ ক'রে ক'লকাতার বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য। মিস্ত্রীর কথা কানে না তুলে সে আধ-শুকনো ইটে পাঁজা তৈরী করার হুকুম দিলো। আগে প্রতিটি কাজে সে নিতো অঞ্জলীর পরামর্শ, এখন সে আচম্বিতে নিজেই হ'য়ে উঠলো সর্ব্বেসর্ব্বা। সদাই যেন অন্যমনস্ক, কিসের একটা চিন্তায় সে যেন বিব্রত; মেজাজটাও হঠাৎ হ'য়ে উঠলো রুক্ষ। দাদার এই আকস্মিক ভাবান্তরে চিন্তিত হ'লো অঞ্জলী, কিন্তু মুখে কিছুই ব'ললে না। আপনাআপনি তাদের প্রাত্যহিক রুটিন গেল বদলে। বিদ্রোহী বিপুল আনলে অঞ্জলীর ধরাবাঁধা কাজে বিশৃঙ্খলা। সর্ব্বত্র সে এঁকে দিলে আশু বিদায়ের ছাপ্। বৃথাই কারণ অনুসন্ধানে মাথা ঘামালে অঞ্জলী, কোন সূত্রই সে আবিষ্কার ক'রতে পারলে না।

আজ পাঁজায় আগুন প'ড়লো, আগামী কাল ক'লকাতায় ফেরবার দিন স্থির। আজ আর বিপুল বাড়ী থেকে বেরুল না। গত ক'দিনের তুলনায় আজ যেন তার মানসিক অবস্থা একটু ভাল অর্থাৎ গুরুগম্ভীর ভাবটা ঈষৎ হালকা।

বৈকালে তারা দু'ভাই-বোন একসঙ্গে চা খেতে ব'সলো। এক সপ্তাহ বা তারও বেশী একসঙ্গে ওদের চা খাওয়া ঘটে ওঠেনি, কারণ কাজের তাড়ায় দুপুরেই বিপুল বেরিয়ে যেতো এবং ফিরতো একেবারে রাত্রে।

চা খেতে খেতে বিপুল ব'ললে, জানি, ক'লকাতায় ফিরতে তোর ইচ্ছা নেই কিন্তু আমার আর এক মুহূর্ত্তও বাজে কাজে নষ্ট ক'রবার উপায় নেই। অথচ আমি এখানে না থাকলে তোর থাকাও অসম্ভব! কি ক'রবো বল, আমি বাধ্য হচ্ছি তোর মতের বিরুদ্ধে কাজ ক'রতে!

—কে ব'ললে আমার ক'লকাতায় ফেরবার ইচ্ছা নেই। আমি তো যেতে সব সময়ই প্রস্তুত। তবে কিনা—

বাধা দিয়ে বিপুল ব'ললে, তবে কিনা তোর এই সাজানো বাগান ছেড়ে যেতে কষ্ট হ'চ্ছে, আদত কথাটা হ'চ্ছে তো এই? ও আমি জানি, তোর মনের কথা আমার অজানা নয়।

ব'লতে ব'লতে হাসতে লাগলো বিপুল।

অঞ্জলী নীরবে চা খেতে লাগলো।

বিপুল ইতস্তত: ক'রে বললে, তাই—তাই আমি ভাবছি কি জানিস? তোর এভাবে একা একা—মানে নিঃসঙ্গভাবে—আবার অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে—এই আর কি, ভারি মুস্কিল নয় কি?

ঘুরিয়ে কথাটা ব'লতে গিয়ে বিপুল গুলিয়ে ফেললে, বেশ পরিষ্কার ক'রে আসল কথা ব্যক্ত ক'রতে পারলে না। কেমন যেন একটা বাধো-বাধো ভাব তার বলার পথে বাধার সৃষ্টি ক'রলে। আভাষে-ইঙ্গিতে অস্পষ্ট একটা কিছু বুঝেও না-বোঝার ভানে অঞ্জলী দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সিগারেটটায় বারকয়েক টান দিয়ে বিপুল ব'ললে, বুঝলি না, মানে আমি তোর এবার বিয়ে দিতে চাই! তা'হলে তুইও নিশ্চিন্ত আর আমার তো কথাই নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা মানুষের পক্ষে বড় শক্ত কিনা, তোর তখন আর সে সব বালাই থাকবে না। এখন তোর ইচ্ছামত অথবা আমার ওপর যদি ভার দিস—মানে কথা দিস, তাহ'লে—

—বিয়ে আমি করবো না, দাদা!

—তার মানে? গর্জ্জে উঠলো বিপুল, তার গলার স্বর মুহূর্ত্তে গেল বদলে।

অতি কষ্টে অতি যত্নে এতদিন মনের যে গোপন কথা সে ব্যক্ত হ'তে দেয়নি আজ তা তার চোখের জলে পূর্ণরূপে ব্যক্ত হ'য়ে গেল। পলকের তরে দাদার মুখের দিকে চেয়ে সে চোখ নত ক'রলে, গণ্ড বেয়ে ঝরে প'ড়লো অব্যক্ত অশ্রুর বন্যা। কেমন ক'রে কিসের দৌর্ব্বল্যে সে যে নিজেকে হারিয়ে ফেললে তা সে নিজেই বুঝতে পারলে না। তার সংযম, তার দৃঢ়তা, তার গুপ্ত কথা ও ব্যথা সব কিছুই ভেসে গেল মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় দু ফোঁটা চোখের জলে।

—ওঃ! একটা অস্ফুট ব্যঙ্গোক্তি ক'রলে বিপুল!

ক্ষণেক নীরবতার পর বিপুলই ক'রলে স্তব্ধতা ভঙ্গ, ছিঃ, আমার বোন যে একটা খুনীর জন্যে চোখের জল ফেলবে—এ আমার কল্পনারও অতীত!

বিনয়নম্রকণ্ঠে অঞ্জলী ব'ললে, তুমি তাকে ক্ষমা কর, দাদা!

ক্ষোভে দুঃখে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো বিপুল, কি—কি ব'ললি? সৌমেনকে তুই বললি ক্ষমা ক'রতে! আমার বোন—

অঞ্জলী যেন উন্মাদ হ'য়ে গেছে, ভেঙে গেল তার লজ্জার বাঁধ; লাজ, সঙ্কোচ, ভয়, সব কিছু ভুলে গিয়ে সে আকুল আগ্রহে জড়িয়ে ধ'রলো বিপুলের দুটি পা। দাদার পা দু'খানি চোখের জলে সিক্ত ক'রতে ক'রতে মিনতিভরা কণ্ঠে ব'ললে, তোমার বোনের জন্যেই তুমি তাকে ক্ষমা করো, দাদা।

পাষাণ গ'লে গেল, বিপুলের চোখ দুটোও হ'য়ে উঠলো জলে টলটলায়মান। সে অঞ্জলীকে পায়ের তলা থেকে তুলে নিলে সস্নেহে। বাঁ হাতে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে ডান হাত বোনের মাথায় রেখে

ব'ললে সে অশ্রুসিক্ত চোখে, গীতার কথা—তোর বৌদির কথা মনে ক'রে তাকে তুই ক্ষমা ক'রতে বলিস? ওরে, সে হতভাগা যে তোর বৌদির সাধ-আশা, তোর সাধ-আশা; কারুর আশাই পূর্ণ হ'তে দেয়নি!

—বৌদির অমর আত্মার যদি কথা বলার শক্তি থাকতো তবে নিশ্চয়ই আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি তোমায় মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা ক'রতেই ব'লতেন।

বিপুল—ম্রিয়মান বিপুল ব'ললে, তা হবার নয়, অঞ্জু—তা হবার নয়। শুধু তোমার দাদা নয়—স্বয়ং বিধাতা তার হন্তারক!

ঘরের ভিতর থেকে সি. আই. ডি. অফিস থেকে আনীত খবরের কাগজের দুখানা 'কাটিঙ্' এনে অঞ্জলীর সামনে ফেলে দিয়ে বিপুল নিঃশব্দে স্থানত্যাগ ক'রলে।

প্রথমখানায় লেখা,—"গত ২৯শে আষাঢ়, সন ১৩.........বিবাহের রাত্রে বিখ্যাত সখের গোয়েন্দা এবং জমিদার শ্রীযুক্ত বিপুল বসুর স্ত্রী গীতা দেবীকে কোন দুর্বৃত্ত বা দুর্বৃত্তবৃন্দ হত্যা করে; এ সংবাদ সম্ভবতঃ পাঠক-পাঠিকাবর্গের স্মরণ আছে। এক বৎসর অতীত প্রায় অথচ আজ পর্য্যন্ত সেই হত্যাকারী বা হত্যাকারিদিগের কোন সন্ধানই হইল না। নরহত্যাকারীর দল যদি সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের অবহেলায় বা অবিবেচনায় অনায়াসে অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে দেশে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সমাজ ও শৃঙ্খলার ভয় হইতে আমরা এ বিষয়ে মহামান্য সরকার বাহাদুরের ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

দ্বিতীয়খানির ওপর একখানি ক্ষুদ্র ছবি ছাপা। ছবিখানির তলায় লেখা—নিরুদ্দিষ্ট হত্যাকারী সৌমেন রায়। এক লাইন ফাঁক দিয়ে আবার ছাপার হরফে লেখা—উপরি-উক্ত হত্যাকারী সৌমেন রায়কে

ধরাইয়া দিতে পারিলে সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

'কাটিং' দু'খানি প'ড়ে অঞ্জলী নিশ্চল জড়ের মত ধীরস্থিরভাবে গালে হাত দিয়ে ব'সে রইলো। দূর থেকে দেখলে - লোকটা বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ হবে! পলকবিহীন নেত্র তার সৌমেনের ছবিখানির ওপর নিবদ্ধ, চোখের জল আপনি শুকিয়ে গেছে, গালের ওপর শুকনো চোখের জলের অস্পষ্ট দাগ। চিন্তা তার চিরদিনের সাথী। বছর কয়েক আগে বিপুল ঠাট্টা ক'রে বলতো, 'অঞ্জু আমাদের দার্শনিক না হ'য়ে যায় না!' কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে চিন্তার গতি তার রুদ্ধ। ক্ষমা ক'রতে পক্ষান্তরে অস্বীকার ক'রেও দাদা তাকে যে আঘাত দিতে পারে নি, খবরের কাগজের এই তুচ্ছ দু'টুকরো কাগজ তার চেয়ে লক্ষ-গুণ শেলের আঘাত হেনেছে তার বুকে! চিন্তা, ভাবনা, আশা, উদ্বেগ-হারা হ'লে মানুষের জীবনে বাকি থাকে কি?

চিন্তা-ভাবনার অতীত হ'য়েও একটা কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না যে, সৌমেনকে বাঁচার দাবি থেকে বঞ্চিত ক'রতে পারে—এমন কি কেউ আছে!

অন্য সময় হলে এমন উদ্ভট সন্দেহের জন্য নিজেকে পাগল ব'লে অঞ্জলীর মনে হ'তো।

বেয়ারা একখানি চিঠি দিয়ে গেল অঞ্জলীর হাতে।

সাধাসিধে চিঠি, কোথা থেকে কে লিখছে—নাম ঠিকানা পর্য্যন্ত নেই। চিঠি লিখতে হয় লিখছে, উত্তরের আশা রাখে না।

'অঞ্জু!

পশ্চিমের ধূলো, কাঁকর আর মেড়ো বরদাস্ত না হওয়ায় ক'লকাতায় ফিরছি। টাকা যা আছে তাতে আরো মাস কয়েক স্বচ্ছন্দে চ'লে

যাবে। শরীর এক রকম। জয় দুর্গা ব'লে ঝুলে তো পড়ি; বরাতে যা থাকে হবে। তবে রাখে কৃষ্ণ মারে কে—না কি বল ?

ইতি—
"আমি"

চিঠিখানা যে সৌমেনের—একথা বুঝতে অঞ্জলীর দেরী হ'লো না। সে সযত্নে চিঠিখানি মুড়ে বুকের তলায় জামার নীচে লুকিয়ে রাখলে। আবার কি যেন ভেবে ঘর থেকে দেশলাই নিয়ে এসে দিলে চিঠিখানায় খাম সমেত আগুন ধরিয়ে। পোড়া-চিঠি হাত দিয়ে ঘ'ষে ছাই ধুলোয় পরিণত ক'রে চিঠির অস্তিত্ব, চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে ফেললে। তার বুক খালি ক'রে বেরিয়ে এলো একটা তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস।

এগার

সৌমেন ক'লকাতায় ফিরে পুরাদস্তুর ভোল পালটে ফেললে। তার নামকরণ হ'লো অতনু মুখোপাধ্যায়! ছোট ছোট চুল কেটে মাথায় রাখলে একটা মোটা টিকি। কাপড় জামা সম্বন্ধেও সে হ'লো সচেতন; পরণে আট হাত মোটা থান-ধুতি, গায়ে আদ্যিকালের বেনিয়ন, পায়ে তালতলার শুঁড়ওলা বিদ্যাসাগরী চটি। গলায় একখানা খেলো উড়ুনি। ধারণ ক'রলে মার্জ্জিত, শুভ্র একগাছি মোটা উপবীত।

মাস কয়েকের মধ্যে সে গোটাকয়েক মেস বদল ক'রলে। এক মাসের বেশী কোন মেসেই সে থাকে না, কোন অজুহাত দেখিয়ে স'রে পড়বেই পড়বে। বাইরে সাদাসিধে হ'লে কি হবে—খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে সে অতি আধুনিক, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি কিছুই বাদ না। মেসের বন্ধুরা ঠাট্টা তামাসা ক'রলে বলে, ভাইরে! আগে

তোমাদের এই অতনু মুখো: হরিদাসই ছিল কিন্তু লোভে প'ড়ে শেষটায় কালিদাস হ'তে বাধ্য হলো! কান্তকবির লাইন দু'টো মনে আছে তো? ওই যে—কি বলে, হ্যাঁ—

"টপ্ করে ঢুকি চাচার হোটেলে
খাই নিষিদ্ধ পক্ষী!
ভোর বেলা উঠে গীতা নিয়ে বসি
বাবা ভাবে ছেলে লক্ষী"!

বন্ধুরা বলে, তবে তোমার ঐ বাহ্যিক ভোল ছাড়তে হবে! পণ্ডিতি পোষাক ছেড়ে আমাদের মত ধুতি পাঞ্জাবী ধ'রতে হবে। বাইরে এক রকম ভেতরে অন্য রকম চলবে না।

সৌমেন হাসে প্রাণখোলা হাসি। বলে, ওরে ভাই! ভেক্ নইলে কি ভিক্ষে হয়। যজমান ঠকিয়ে কোন রকমে টিকে আছি, নইলে এ্যাদ্দিন পটল তুলতে হ'তো।

বন্ধুরা ঠাট্টা ক'রে বলে, মন্তোর-টন্তোর জানো—না অং বং চং ক'রেই ঘণ্টা নেড়ে সেরে দাও?

—বামুনের ছেলে, মন্তর জানবো না কেন? একান্ত আটকে যায়—গায়ত্রী আউড়ে যাই!

কৈ বলতো দেখি গায়ত্রী, কেমন তোমার মনে আছে দেখি?

জীব কেটে ভক্তি সহকারে সৌমেন বলে, ধ্যাৎ পাগল! গায়ত্রী কি কাকেও শোনাতে আছে?

—শোনাতে আছে—না ভুলে মেরেছো, তাই বলো?

সৌমেন বলে, সাইকেল চড়া, নারকোল গাছে ওঠা, সাঁতার কাটা আর গায়ত্রী জপা একবার শিখলে কেউ কোন কালে ভোলে না;

*বুঝলে—এ সব বেদ পুরাণের কথা।

প্রাণখোলা হাসি হেসে বন্ধুরা বলে, বেশ—ব'লতে না থাকে, লিখে দাও!

সৌমেন প্রমাদ গণে।

পরের দিন ভোরে গঙ্গাস্নানে যাবার নাম ক'রে সৌমেন গঙ্গার ঘাটে উড়েঠাকুরের শরণাপন্ন হয়। তাকে অনেক ব'লে বুঝিয়ে, গণ্ডা কয়েক পয়সা ঘুষ দিয়ে সে গায়ত্রী মন্ত্রটা কাগজে লিখে গঙ্গার ধারে ব'সে মুখস্ত ক'রে নিয়ে গঙ্গায় স্নান সেরে মেসে ফিরলো। সেদিন সন্ধ্যায় সে উপযাচক হ'য়ে গত সন্ধ্যার কথাটা পেড়ে যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে গায়ত্রী মন্ত্রটা কাগজে লিখে দিলে।

এর পর সে যে-কটা মেসে গিয়ে উঠেছে কোথাও ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে নি। ঘনিষ্ঠ হওয়ায় যে বিপদ কতখানি তা সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বত্রই একটা মুস্কিল বড়ই প্রকট হ'য়ে দেখা দিচ্ছে। তার বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে খাদ্যাদির তুলনা ক'রে মেসের বাসীন্দারা নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাসা ক'রবেই ক'রবে। এমন অবস্থায় দু'টি অসংলগ্ন পথ একযোগে বজায় রাখা তার পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন হ'য়ে উঠলো। হয় মাংসাদি ছেড়ে নিরামিষভোজী হ'তে হয়, অথবা থান, বেনিয়ন ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী ধ'রতে হয়!

মুস্কিল অবসান ক'রতেই হবে, নইলে প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা। নিজের মনে সমস্যা সমাধানে উঠে-প'ড়ে লাগলো সৌমেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার দেরী হ'লো না। থান, বেনিয়ন তার আসল পোষাক নয়, ছদ্মবেশ; কাজেই ওটা ছাড়া শক্ত নয় কিন্তু মাছ মাংস ছাড়া বাঁচা তার পক্ষে অসম্ভব। আঁশটে গন্ধ নইলে তার ভাতই মুখে ওঠে না। উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট ক'রেই *না ছাতুখোরের দেশে সে ক'টা* মাস কাটিয়েছে! মাছ মাংস ছেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বিপুলের কাছে অথবা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করাও বেশী বাঞ্ছনীয়।

হঠাৎ মেস ছেড়ে দিয়ে একদিন সৌমেন 'পুরসুন্দরী ধর্ম্মশালায়' গিয়ে উঠলো। গরীবের পক্ষে দিন দুয়েক থাকার প্রশস্ত আস্তানা।

ধর্ম্মশালায় কে কার খবর রাখে, মাত্র একদিনের চেষ্টাতেই ফুলবাবু না হ'লেও মাঝারি গোছের বাবু হ'য়ে উঠলো সৌমেন। মোটা টিকির উচ্ছেদ ঘটিয়ে কদমছাঁটা চুলই ফ্যাসন ক'রে কাটিয়ে নিলে। ধুতি, পাঞ্জাবী, নাগরা প'রে ছোট্ট সুটকেশটি হাতে নিয়ে বাগবাজারের গঙ্গার ধারে প্রায় সহরের শেষ প্রান্তে একটা মধ্যবিত্ত মেসে গিয়ে উঠলো সে—ধর্ম্মশালা ছেড়ে।

জোর ক'রে লোকের সঙ্গে মিশতে না চাইলে কি হবে, চিরদিন মিশুকে সে—না মিশে থাকা তার স্বভাববিরুদ্ধ। দলে ভিড়ে যেতে সৌমেনের বেশী সময় লাগলো না। তা ছাড়া, সুন্দর চেহারার জয় সর্ব্বত্র—তা সে মেয়েছেলেই কে জানে আর বেটাছেলেই কে জানে, অবশ্য মেয়েছেলের কথা একটু স্বতন্ত্র বৈকি!

সব ছাড়লে সৌমেন, তবে ছদ্মনাম আর পৈতে গাছটা বাদ দিয়ে। কারণ ও দুটো বজায় রাখতে আমিষ, নিরামিষ বা অপরের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না। একেবারে ব'সে থাকা ভাল দেখায় না, লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। সৌমেন সকালে, সন্ধ্যায় দু'টি ছেলে পড়ানো সুরু ক'রলে। মেসে প্রচার ক'রলে যে, সে সকালে সন্ধ্যায় মোটা টাকার গোটা চারেক টিউসন্ করে। দিন এক রকম হেসে-খেলেই কাটে।

সৌমেনের উদ্দেশ্য, আরো কিছুদিন এইভাবে গা-আড়াল দিয়ে কাটিয়ে সে প্রকাশ্যভাবে চাকরীর চেষ্টা ক'রবে। সকালবেলাটা ছাড়া দিনের আলোর পথে বেরোয় সে খুবই কম, কি জানি—সাবধানের মার নেই। মাঝে মাঝে অঞ্জলীর সঙ্গে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা হয়

কিন্তু জোর ক'রে সে নিজের মনকে নিজে এই ব'লে সান্ত্বনা দেয় যে, অঞ্জু আর কারুরই নয়—সে তারই আছে এবং থাকবে।

পুরাতন কথা মনে প'ড়লে ধিক্কারে তার মন ভ'রে যায়; অনুশোচনায় ইচ্ছা যায় আত্মহত্যা ক'রতে! অত্যন্ত দুর্ব্বল সে, ম'রতে ইচ্ছা ক'রলেই মরা যায় না; মরার সাহস থাকা চাই। মরবার কথা মনে হ'লেই আর একখানি করুণ মুখ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে; সাহসে তার বুকটা যায় ভ'রে; এ বিশাল দুনিয়ায় সে একা নয়, একজন আছে তার আপনার চেয়েও অতি আপনার! * * * গতদিনের গ্লানি তাই সে চায় চিরতরে মন থেকে মুছে ফেলতে, চায় স্বপ্নের মত ভুলে যেতে গত জীবনের যা-কিছু অবান্তর, পুরাতন স্মৃতি।

মেসটা ভারি জমাটি, ছাড়তে মন চায় না। দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। সৌমেন মনে ভাবে—আছি বেশ, আবার কোথা যাবো! পালিয়ে কি আর যমের মুখ থেকে বাঁচা যায়? বরাতে যদি থাকে—ধরা আমায় একদিন-না-একদিন প'ড়তেই হবে। মাসে একবার ক'রে স্থান-পরিবর্ত্তন করাও তো ভালো নয়, তাতেও তো লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে? ফেরারী আসামীরাই দ্রুত স্থান-পরিবর্ত্তন করে; তারই মত পালিয়ে বাঁচার ভুল ধারণা মনে মনে পোষণ করে। নাঃ, ও যাযাবর বৃত্তি এতদিন যা ক'রেছি—ক'রেছি, এখন থেকে স্থায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সৌমেন থেকেই যায়।

বসন্তের শেষাশেষি।—এরি মধ্যে বেশ গরম প'ড়েছে। মেসের মেম্বাররা অনেকেই ঘর ছেড়ে এখন থেকে ছাত আশ্রয় করার পক্ষপাতী। সৌমেন কিন্তু সে দলভুক্ত নয়, ফাঁকা জায়গায় সে শুতে পারে না; শুলে তার ঘুম আসে না। যত গরমই পড়ুক সে নিজের

সিট ছাড়তে রাজি নয়। শুধু তাই নয়; আরো একটি অভ্যাসে সে অভ্যস্ত; ঘরের ভিতরে ঘর অর্থাৎ মশারি নইলে তার চোখে ঘুম ধ'রবে না—মশা থাক বা নাই থাক।

সেদিন রাত্রে সবেমাত্র মশারিটি খাটিয়ে সৌমেন শুয়েছে, ছাত থেকে নেমে এলো সুনীল নামধারী একটি কলেজের ছাত্র। সৌমেনের সঙ্গে সুনীলের হৃদ্যতা একটু বেশী।

—অতনুদা, ঘুমুলেন নাকি? ছেলেটির গলার স্বর কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা। মশারির ভিতর থেকেই সৌমেন উত্তর দিলে, আবার কেন বিরক্ত ক'রতে এলে, বাওয়া! ছাতে আমি যাবো না।

—তা নেই যান্, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? মশারীর ভিতর মাথাটা ঢুকিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে সুনীল ব'ললে।

—ব্যাপার-ট্যাপার কাল সকালে, এখন্ একটু ঘুমুতে দাও।

—ঘুম কি আর হবে! ছাত থেকে দেখলুম, জন কয়েক পুলিশ আমাদের মেসের সামনে ঘোরাঘুরি ক'রছে।

—এ্যাঁ, পুলিশ! অতর্কিতে ব'লেই সৌমেন সামলে নিলে নিজেকে।

এক মুহূর্ত্তে গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করার চেষ্টা ক'রে বললে সৌমেন একান্ত অগ্রাহ্যভাবে, তাতে কি হ'য়েছে! ঘুরুকগে—!

সৌমেনের ঔদাসীন্যে বিরক্ত হ'লো সুনীল, ব'ললে, কি ব'লছেন আপনি! এখুনি খানাতল্লাসি আরম্ভ হ'লে জেরার ঠেলায় প্রাণ যে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে? অই—অই কড়া নাড়ার শব্দ। কি করি বলুন তো?

হাসি টেনে সৌমেন ব'ললে, তোমার অত মাথাব্যাথা কেন শুনি?

—তবে আপনি গিয়েই দরজাটা খুলে দিন না।

—আমাকে ডেকে না তোলা পর্য্যন্ত আমি উঠছি না। ব'লে সৌমেন পাশফিরে শুলো।

অবিশ্রান্ত কড়ানাড়ার শব্দ নৈশ স্তব্ধতা বিশ্রীভাবে ভঙ্গ ক'রছে। সুনীলের ডাকাডাকিতে অনেকেই জাগলো কিন্তু পুলিশের নাম শুনে কেউ-ই উঠলো না, ঘুমোবার ভানে চুপচাপ প'ড়ে রইলো। সৌমেন বিছানা ছেড়ে ছাতে গিয়ে দেখে এলো—ব্যাপারটা সত্যি। দোতলার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ব'ললে, যাও সুনীল! আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তোমার কোন ভয় নেই!

সুনীল দরজা খুলে দিতে নিচে নামলো, সৌমেন নামলো তার পিছু পিছু-। সুনীলের অলক্ষ্যে নীচে সিঁড়ির তলায় কাঠ, কয়লার স্তূপের পাশে সৌমেন আত্মগোপন ক'রলে। দরজা খোলামাত্র রিভলবার হস্তে বিপুল, অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারী ও কয়েকজন সার্জ্জেন্ট হুড়মুড় ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে প'ড়লো। দরজাগোড়ায় পাহারায় রইলো দু'জন লাঠিধারী দেশী পুলিশ। সুযোগের প্রতীক্ষায় ওত পেতে রইলো সৌমেন। ওপরে খানাতল্লাসি সুরু হ'তে বিলম্ব হ'লো না। বাক্‌সো প্যাঁটরা ভাঙ্গাভাঙ্গি, হিটলারী বিক্রমে জেরা—সবকিছুই কানে এলো সৌমেনের। দরজার একজন পাহারা দরজা থেকে একটু দূরে তখন শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদনে সবেমাত্র ব'সেছে, সৌমেন অন্য পাহারাটিকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী ক'রে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটলো। পুলিসের চীৎকারে মেসের ভিতর থেকে পুলিশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই বেরিয়ে এলেন। অনতিবিলম্বে সুরু হ'য়ে গেল পুলিশ আর আসামীর মধ্যে ছোটার প্রতিযোগিতা! পশ্চাৎ ধাবনকারী পুলিসের হুইসেল রাস্তার মোড়ের পাহারাকে ক'রলে সচেতন। সৌমেন বড় রাস্তা ছেড়ে গলির মধ্যে ঢুকলো, গলি পেরিয়ে প'ড়লো আবার বড় রাস্তায়। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন এসে তাকে জাপটে ধ'রলে, ধস্তাধস্তি ক'রেও সৌমেনকে ধরতে পারলে না। সামনে প'ড়লো এক পার্ক, সৌমেন লাফ দিয়ে পার্কের রেলিঙ্ অতিক্রম ক'রে উর্দ্ধশ্বাসে

ছুটলো। এ একেবারে বোম্বাই মার্কা ছবির দস্তুরমত বাহাদুরকা-খেল্, ধরি ধরি ক'রেও ধরা গেল না। কিন্তু এত ছুটেও সে পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম ক'রতে পারলে না। সে আচম্বিতে এসে প'ড়লো গঙ্গার ধারে, দেখলে আর পালাবার পথ নেই ; সামনে পুলিশ, পিছনে পুলিশ, আর ডানধারে গঙ্গা। তবে কি সে এবার গঙ্গায় লাফিয়ে প'ড়বে! মাত্র এক লহমার জন্য সৌমেন দাঁড়ালো, তার চোখে প'ড়লো—বাঁদিকে রেল লাইনের ওধারে বিপুলেরই বাড়ী ; বহু পুরাতন, বহু পরিচিত বাড়ী! সৌমেন লাইন টপ্‌কে গিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে দরজার কড়া নাড়লে। বাহাদুর চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দরজা খুলে দিলে। ভিতরে ঢুকে সৌমেন নিজের হাতে দরজা বন্ধ ক'রলে। আবাল্যের পরিচিত বাহাদুর সৌমেনকে দেখে কেমন ঘাবড়ে গেল, কি ব'লবে বা কি ক'রবে কিছুই ভেবে উঠতে পারলে না। বাহাদুরকে কোন কথা বলার অবসর না দিয়ে সৌমেন দোতলায় উঠে গেল।

অঞ্জলীর দরজার কড়া সশব্দে ন'ড়ে উঠলো।

—অঞ্জু! অঞ্জু! অঞ্জলী?

ত্রস্তে অঞ্জলী দরজা খুলে দিয়ে ব'ললে, তু—তু—তুমি!

সৌমেন ভিতরে ঢুকে দরজার ছিটকানি এঁটে দিতে দিতে ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে ব'ললে, সদলে তোমার দাদা আমার পিছু নিয়েছে।

—দাদা তোমায় এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে?

—খুব সম্ভব।

কি যেন ভেবে অঞ্জলী ব'ললে, তবে আর দেরী ক'রোনা, তুমি পালাও!

বাড়ীটার উত্তর দিকে মানুষ চলাচলের অযোগ্য এক ফালি সরু গলি, সেদিকে ছোট একটি বারাণ্ডা ; বারাণ্ডায় যাবার দরজাটা প্রায় বন্ধই থাকে— খোলার দরকার হয় না। অঞ্জলী তাড়াতাড়ি সেদিককার

দরজাটা খুলে ফেললে। বারাণ্ডা থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। বাড়ীর ভিতরে দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে কার যেন ক্ষিপ্ত ত্রস্ত পদশব্দ শোনা গেল, সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো সৌমেন। আনলা থেকে কয়েকখানা শাড়ী একত্র ক'রে বারাণ্ডার রেলিঙে বাঁধতে বাঁধতে ব'ললে অঞ্জলী, এইটে ধ'রে নেমে যাও।

এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে অঞ্জলীর দরজার কড়া কঠিন শব্দে ন'ড়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিপুলের সরোষ কণ্ঠ, অঞ্জু! অঞ্জু!

সৌমেন অতি সন্তর্পণে নীচে নেমে গেল। অঞ্জলী পাষাণমূর্ত্তির মত নিশ্চলচোখে কম্পিত বুকে চেয়ে রইলো,—সৌমেনের গমন-পথের দিকে।

প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজাটা বুঝিবা এবার ভেঙে প'ড়বে! বাইরে থেকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বিপুল ডাকছে, অঞ্জু! শীগ্‌গীর দরজা খোল!

দরজা খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো অঞ্জলী, কি ভেবে আবার ফিরে এলো উত্তরের বারাণ্ডায়, অন্ধকারের ভিতর তার জলন্ত চোখ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কার সন্ধানে ফিরলো; সে গিয়ে কম্পিত হস্তে দিলে দরজা খুলে।

সারা ঘরখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিপুল রক্তচক্ষে অঞ্জলীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন ক'রলে, সৌমেন কোথা?

অঞ্জলী নীরবে চক্ষু নত ক'রলে।

বিপুল ছুটে গেল উত্তরের বারাণ্ডায়, একত্র সন্নিবিষ্ট ঝুলন্ত শাড়ী টেনে তুললে ক্ষিপ্রহস্তে। তারপর উন্মাদের মত ঘরময় বার কয়েক পায়চারি ক'রে অঞ্জলীর সামনে দাঁড়িয়ে কঠোর কণ্ঠে ডাকলে, অঞ্জু!

—দাদা!

—এর মানে?

অঞ্জলীর মুখে কথা ফুটলো না।

—কি চাও তুমি ?

কি যেন বলতে গেল অঞ্জলী কিন্তু বিপুল তাকে সে অবসর দিলে না।

—একটা খুনীকে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি চাও সমাজ-শৃঙ্খলা ভেঙে দিতে, অন্যায়কে সমর্থন ক'রে তুমি চাও কোটি কোটি মানবের সুখ-শান্তি নষ্ট ক'রে—সমাজকে শ্মশানে পরিণত ক'রতে। শান্তির সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালতে !

অঞ্জলীর মনের জোর ফিরে এলো, সে দীপ্তকণ্ঠে ব'ললে, মাত্র একটা ভুলের জন্য কি মানব-জীবন ব্যর্থ হওয়াটাই সমাজ-শৃঙ্খলার কাম্য ? সমাজের চোখে, আইনের চোখে, ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই, দাদা ! অনুতাপের মর্মান্তিক যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে কি মানুষের মনের কালিমা মুছে যায় না ? ঘটনা-বৈচিত্রে সাময়িক উত্তেজনার বশে জীবনে মাত্র একটা ভুল যে মানুষ করে, তাকে স্বভাব-দোষদুষ্ট পর্য্যায় ভুক্ত করা যায় না—করা উচিত নয়।

—ওসব দর্শনতত্ত্ব ছাড়ো ! যে তোমার দাদার জীবন ব্যর্থ ক'রেছে তাকে তুমি চাও বাঁচিয়ে রাখতে ? ছিঃ এতবড় স্বার্থপর—

গম্ভীরকণ্ঠে অঞ্জলী ব'ললে, সৌমেনবাবুকে বাঁচতে সাহায্য করাই আমার জীবনের ব্রত ! আশীর্ব্বাদ কর দাদা, আজীবন আমি যেন তা-ই ক'রে যেতে পারি।

—না তুমি তা পারবে না। এসব নাটুকেপনা তোমায় ছাড়তেই হবে।

অঞ্জলীর তখন আর এক মূর্ত্তি, এত বড় সাহসী হ'তে জীবনে কেউ তাকে দেখেনি ; সে নির্ভীককণ্ঠে ব'ললে,—বেশ, আজ থেকে তোমার পথ আর আমার পথ এক নয়, দাদা ! এখুনি আমি এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি ! ঘৃণায় মুখখানি বিকৃত ক'রে বিপুল ব'ললে, আইনের

চোখে যে অপরাধী, বিদ্রোহী,—তার স্থান এ বাড়ীতে হওয়া সত্যই উচিত নয়!

আর একটি কথাও ব'ললে না অঞ্জলী। চোখে তার এলো না এক ফোঁটা জল। সে নীরবে গলায় আঁচল দিয়ে বিপুলকে প্রণাম ক'রে সেই নিঝুম রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে নামলো অন্ধকার পথে।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল বিপুল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো অঞ্জলীর গমন-পথের দিকে চেয়ে। বাধা দেওয়ার কথা দূরে থাক, একটা কথাও ব'ললে না অঞ্জলীর যাবার সময়। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মাথাটা কেমন তার গুলিয়ে সব যেন একাকার হ'য়ে গেল। টলতে টলতে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বিপুল অঞ্জলীর চেয়ারখানায় মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো। তার লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিপথে প'ড়লো গীতার একখানি ছবি। ছবিখানির দিক্ থেকে সে চোখ ফেরাতে পারলে না, তার নিজেরই অজান্তে শুষ্ক কঠোর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো, দু'এক ফোঁটা গড়িয়েও প'ড়লো গাল বেয়ে।

গীতার চিন্তায় বিভোর আত্মহারা বিপুলের সামনে যেন ছবিখানি গীতার জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে এসে দাঁড়াল।

ভৎর্সনার সুরে গীতা ব'ললে, ছিঃ কি ক'রলে তুমি! যাও—এখুনি ফিরিয়ে আনো!

—না—না, স্বেচ্ছায় যে যেতে চায় তাকে যেতে দাও।

বিপুলকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা ক'রে মিনতিভরা কণ্ঠে ব'ললে গীতা, ভুলে যাচ্ছো যে অঞ্জু তোমার বোন—মার পেটের একমাত্র বোন! তা ছাড়া, সে কোন দোষে দোষী নয়। সে যা' ব'লেছে—সে যা' বুঝেছে তার প্রতি বর্ণটি সত্য! যে নেই তার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন দেওয়ার কোন মানে হয় না। ছিঃ ছিঃ—তোমারি চোখের সামনে তোমার বোন মাত্র একখানি কাপড়ে চিরদিনের জন্য বাড়ী থেকে চ'লে গেল, তুমি

তাকে একটা মুখের কথাও ব'ললে না? উত্তেজনার বশে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ো না!

নিজের মনে নিজে ব'ললে বিপুল, উত্তেজনা! সত্যি—উত্তেজনার বশে এ আমি কি ক'রেছি! যাই—হ্যাঁ যাই, ফিরিয়ে আনি!

অঞ্জু! অঞ্জু!! অঞ্জু!!! ব'লে চীৎকার ক'রতে ক'রতে বিকৃত-মস্তিষ্কের ন্যায় বিপুল চেয়ার ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো ছুটতে ছুটতে।

মনিবের চীৎকারে বাহাদুর, চাকর প্রভৃতি যে যেখানে ছিল ঘুম চোখে ছুটে এলো কোন আকস্মিক বিপদের সম্ভবনায়।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে অঞ্জলী চ'লতে সুরু ক'রলে, কোন্ দিকে যাচ্ছে তাব ঠিক নেই, কোথা যাবে তারও নেই কোন ঠিক-ঠিকানা; চ'লতে হয় চ'লেছে দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত। অদূরে কয়েকজন লোককে হল্লা ক'রতে ক'রতে আসতে দেখা গেল, সম্ভবতঃ মাতাল। ঈষৎ প্রকৃতিস্থ অঞ্জলী একটা ডাষ্টবিনের ধারে অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রলে। লোকগুলো নিজেদের খেয়ালে চীৎকার ক'রতে ক'রতে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। রাতের ক'লকাতা নীরব, নীঝুম। অঞ্জলী পথে নামতে যাবে হঠাৎ ডাষ্টবিনের মধ্যে একটা কালো মাথা উঁচু হ'য়ে উঠলো। ভয়ে অঞ্জলী চীৎকার ক'রতে গেল কিন্তু গলা দিয়ে একটা ভয়ার্ত্ত গোঁয়ানী ছাড়া আর কিছুই বেরুলো না। পার্শ্বস্থিত ডাষ্টবিন থেকে লোকটি বেরিয়ে আসতে আসতে ব'ললে, ভয় নেই!

আঁৎকে উঠে ব'ললে অঞ্জলী, কে তুমি?

যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পারের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

বারো

কালের চাকার তলে তিনটি বছর মিশে গেল।

চট্‌কলের কুলী ব্যারাকের একাংশে একখানি টালি ছাওয়া ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের সামনে ধূলিধূসরিত খানিকটা অল্প পরিসর চত্বর। চত্বরের সামনে রেল কোম্পানীর ঝিল। ঝিলের গায়েই বি. এন্. আর্. কোম্পানীর রেল লাইন। লাইনের ওধারে ল্যাডলো কোম্পানীর বিরাট এবং বিখ্যাত জুট মিল। উঁচু রেল লাইনের ব্যবধান থাকলেও কুলী ব্যারাকের চত্বর থেকে কলের বড় বড় বাড়ী, মেসিন ঘরের লম্বা চোঙা, জলের ট্যাঙ্ক প্রভৃতি চোখে পড়ে।

কুলী ব্যারাকে লাইনবন্দী ঘর। এক একখানি ঘরে এক একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, গুটিকয়েক জরাজীর্ণ ছেলেমেয়ে, কারো বা উপরি হিসাবে বুড়ো মা বা বাবা। এ সারটার অধিকাংশই মিস্ত্রী অথবা কুলীর সর্দ্দারের বাস, সাধারণ কুলীদের চেয়ে এরা একটু বর্দ্ধিষ্ণু অর্থাৎ দু'বেলা শাকসিদ্ধ ভাত এদের কোনরকমে জোটে। এই ব্যারাকেরই একেবারে ধারের দিকে একখানি ঘরের চত্বর ও দাওয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

এই পরিচ্ছন্ন দাওয়ার ওপর এসে প'ড়েছে অস্ত-রাঙা-রবির লাল আলো। সে আলো ছড়িয়ে প'ড়েছে সারা কুলী ব্যারাকের নোনাধূলি-ভরা প্রাঙ্গণে, পাশের কাটা ঝিলে আর আশপাশের দীর্ঘ তাল, নারিকেল, সুপারি গাছের মাথায় মাথায়। ঝিল থেকে কাপড় কেচে এসে অঞ্জলী দাওয়ার ওপর ক্ষুদ্র আরসিখানি নিয়ে প্রতিদিনের মত আজও চুল বাঁধতে ব'সলো পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে।

আজ যেন তার চুলবাঁধা শেষ হ'তে চায় না। খানিকটা ক'রে বাঁধে আবার ঐ আবিরমাখা আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবে।

ভাবতে ভাবতে গুলিয়ে ফেলে চুলের গুচ্ছি। আবার খুলে আবার বাঁধে। নিজের মনে নিজেই মৃদু মৃদু হাসে, মুহূর্ত্ত মধ্যে কেমন একটা অজানা লজ্জার ছোঁয়াচ লাগে সারা মুখখানিতে। চুল বেঁধে সরু চিরুণীটার ডগা দিয়ে মোটা ক'রে সিঁথেয় দেয় সিঁদুর। বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙুল দিয়ে কপালে পরে ছোট্ট একটি সিঁদুরের টিপ। বাঁ হাতের লোহার নোয়ায় দেয় সিঁদুর ছুঁইয়ে, এয়োতির লক্ষণ সব কিছুই সে শিখে নিয়েছে।

প্রতিদিনের দেখা পল্লী—সন্ধ্যার পল্লীশ্রী আজ যেন নূতন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে তার মনের দুয়ারে হানা দিলে। বাঁশের খুঁটিটিতে হেলান দিয়ে আসিটা সামনে রেখেই সে আনমনে চেয়ে রইলো, উদাসদৃষ্টি তার চ'লে গেল দূর হতে দূরান্তরে; প্রকৃতির রূপ-পরিবর্ত্তনের মাঝে অঞ্জলী নিজেকে হারিয়ে ফেললে। কি-ই বা ছাই আছে নূতনত্ব, দেখবার আছে কি? সেই গতানুগতিক এক দৃশ্যপট।

স্তিমিতপ্রায় গোধূলী। এক পাল হাড়সার গরু, সঙ্গে গুটিকয়েক ঠেলে-দিলে-পড়ে-যাওয়া শীর্ণকায় বাছুর; তদের রাখালটির চেহারাও জানোয়ারগুলির সঙ্গে পরিষ্কার খাপ্ খায়। পেটজোড়া পিলে নিয়ে নিজের ভারে সে নিজেই নড়তে পারে না, গরুর পাল বাগ্ মানাতে পারবে কেন? না পারলে চ'লবে কেন, ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা; পেট তো শুনবে না! নুড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাখাল তার ক্ষুদ্র গরুর পাল লাইন পার ক'রে এপারে তাড়িয়ে নিয়ে এলো। এবার গরুর মালিকদের বাড়ীতে জীবগুলিকে পৌছে দিতে পারলেই আজকের রাতের মতো তার ছুটি।

"ওরে ঐ কেলে ছোঁড়া বাজায় বাঁশী প্রেম যমুনার পার রে—প্রেম যমুনার পার!— আর সন্ঝে বেলায় কদমতলায় রাধার অভিসার রে— রাধার অভিসার!!"

আনন্দের আতিশয্যে রাখাল তার মনগড়া সুরে গান ধরে। আর মাঝে মাঝে মুখের মধ্যে জিহ্বার কসরতে এক অদ্ভুত শব্দ ক'রে গরু তাড়ায়। এ তার নিত্য অভ্যাস।

রাখালের মুখে নিত্য-শোনা গান আজ কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় ভারী মিষ্টি লাগলো অঞ্জলীর কানে।

গুগলি খাওয়া শেষ ক'রতে মন চায় না অথচ দিনের আলো নিবে আসছে, হাঁসগুলোর নেই ব্যস্ততার অন্ত। ডোবার যত গেঁড়ি গুগলি আজই যেন তাদের শেষ ক'রতে হবে! মাথা তোলার ওদের নেই অবসর। ওদিকে দুলেদের, বাগ্দীদের ছেলে, মেয়ে, বোয়েরা প্রায় সমস্বরে সুর ধ'রেছে,—"আয়-আয়, চৈ-চৈ! আ-আ-আতু-উ!" 'প্যাক্ প্যাক্' শব্দ ক'রতে ক'রতে একটির পর একটি হাঁস ডাঙায় উঠলো, তাদের দেখাদেখি ঝিলের ভেতর থেকেও ডুব সাঁতার দিতে দিতে তীরের দিকে এগিয়ে এলো আর এক পাল হাঁস। বোধ হয় হাঁসের লোভে রেলের বাঁধের ধার থেকে উলুবনের ভিতর দিয়ে ছুটে বেরুলো একটা লেজমোটা শেয়াল, ছেলেমেয়েগুলো হৈ হৈ ক'রে দিলে তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে; নিমেষের মধ্যে প্রাণের মায়ায় শিয়ালটাও উধাও হ'য়ে গেল।

রেল লাইনের কাঠগুলো সমান দূরত্ব বজায় রেখে একটার পর একটা বসানো। চোখ চেয়ে দেখতে হয় না, শুধু সমান তালে পা ফেলে চ'ললেই হ'লো। আশপাশের বাসীন্দারা লাইনের ওপর দিয়ে পথ চ'লতে ভারী অভ্যস্ত, শুধু সিগনল্‌টার ওপর দৃষ্টি রাখতে তারা কদাচিৎ ভোলে। ঐ লাইনের ওপর দিয়ে হুঁকো হাতে ঘরামীরা কাজ সেরে দিনেব শেষে ফিরছে যে যার ঘরে।

ক'লকাতা থেকে একখানা লোকাল ট্রেণ অদূরে ঐ ষ্টেশনে এসে থামলো। ডেলি প্যাসেঞ্জাররা নামলো গাড়ী থেকে—কেউ বা

খালি হাতে আবার কারো হাতে বা গামছা, ঝাড়ন-বাঁধা বাজার।

হাজার নতুনত্ব বর্জিত হ'লেও আজ কিন্তু এই সব অতি-পুরাতন দৃশ্যপটই ভারি ভালো লাগলো অঞ্জলীর। সন্ধ্যা তখনও হয়নি, অদূরে পাড়ার ভিতর থেকে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হ'লো। শাঁখের আওয়াজ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলীর যেন চমক ভাঙ্‌লো, সে আর্সিখানা ঘরের মধ্যে রেখে প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তুলসীতলায় প্রদীপটি রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম ক'রে কি যে প্রার্থনা ক'রলে তা সে-ই জানে, দাওয়ায় উঠে শাঁখ বাজালে।

উনুনে আঁচ দিয়ে ডাল চাপিয়ে দিলে অঞ্জলী, তরকারী কুটে ময়দা মাখতে ব'সলো। ময়দা মাখে আর একবার ক'রে মুখ তুলে অঞ্জলী ওপাশের পথটার দিকে চেয়ে দেখে, পথটা রেল লাইনের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে তাদেরই ব্যারাকের পাশ দিয়ে উত্তরমুখে চ'লে গেছে।

প্রতিদিন এই সময়েই সৌমেন আসে, আজও এলো! বুকের বোতাম খোলা, খাঁকির হাফ্‌ সার্টটা হাফ্‌ প্যাণ্টের ভেতর গোঁজা। ধূলিধূসরিত স্যু'টার গলায় মোজাটা নেমে এসেছে, আধময়লা কোটটার এক হাত গলান; মাথার চুলগুলি এলোমেলো অবিন্যস্ত, পরিশ্রান্ত মুখের ওপর আজ যেন একটু আনন্দের ছোঁয়াচ।

কড়ার ডালটা খুন্তি দিয়ে নাড়তে নাড়তে অঞ্জলী হাসিমুখে ব'ললে, আজ যে ফিরতে একটু দেরী হ'লো?

আসলে দেরী কিন্তু একটুও হয়নি, কলের সিটি বাজার মিনিট কয়েকের মধ্যে সে এসে হাজির হ'য়েছে।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে দাওয়ার ওপর একটা রুইমাছ রেখে সৌমেন পা ঝুলিয়ে ব'সে ব'ললে, আমি কিন্তু তোমায় আজ এমন একটা সুখবর দিতে পারি অঞ্জু, যা শুনলে তুমি নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে!

—আমিও আজ তোমায় একটা আনন্দের খবর—ব'লেই অঞ্জলী অর্দ্ধপথে চুপ ক'রলে, তার নিটোল মুখখানি লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো।

জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে সৌমেন ব'ললে, কি—ব'লতে ব'লতে থামলে যে ?

হাসতে হাসতে অঞ্জলী ব'ললে, না—এমনি। মাছটা কত নিলে তাই জিজ্ঞেস কচ্ছিলুম। কি আনন্দের খবর—বলনা ? আচ্ছা, এখন থাক। হাতমুখ ধুয়ে নাও, তোমাকে জলখাবার দিয়ে শুনবো !

জামা প্যাণ্ট ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব'ললে সৌমেন, মাছটা কুটে ফেলবো, অঞ্জু ?

—তুমি মাছ কুটবে ! হাঃ হাঃ হাঃ—হেসে ফেললে অঞ্জলী।

তা নইলে তোমার যে হাতজোড়া ? কখনকার ধরা—প'চে যেতে পারে। দাওনা বঁটিটা, চেষ্টা ক'রে দেখি।

—তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে ! যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে—ওকি, তবুও মাছ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে ব'সলে ?

—তুমি বুঝছো না অঞ্জু, আমি পারবো—ঠিক পারবো। এই গ্যাখো - ব'লতে ব'লতে সৌমেন নিজেই আঁশবঁটি নিয়ে এলো।

—নাঃ, তোমার ছেলেমানুষী এখনো গেল না। যথেষ্ট হ'য়েছে—সর দেখি ! ব'লে অঞ্জলী সৌমেনের হাত থেকে মাছ নিয়ে কুটতে ব'সলো। কুটতে কুটতে ব'ললে সৌমেনের মুখের দিকে চেয়ে, লক্ষ্মীটি, যাও। হাত মুখ ধুয়ে এসে একটু সুস্থ হও।

—কুটতে তো দিলে না, ব'সে ব'সে তোমার মাছ কোটা দেখতেও দেবে না ? তোমার মাছ কোটা দেখতে আমার ভালো লাগছে। আচ্ছা, টাটকা মাছের কালিয়া সুন্দর হবে—কি বল ? ঘি আছে

তো ? ঘি না থাকলে কিন্তু কালিয়া ভাল হবে না। নেই—? তবে যাই—ঘি'টা চট্ ক'রে নিয়ে আসি।

গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য মিশিয়ে অঞ্জলী ব'ললে, ব'সো দেখি ! রাঁধতে জানলে ঘিএর অভাব তেলেই মেটানো যায়। বাজার বুঝি এখানে !

সৌমেন ব'ললে, আচ্ছা, যাবো না। ঘিয়ের অভাব তুমি তেলেই মেটাও। হ্যাঁ, কি কথা বলো না ? সৌমেনের চোখের দিকে চেয়েই ফিক্ ক'রে হেসে মুখখানি নামিয়ে নিলে অঞ্জলী। সৌমেনের পক্ষে ঔৎসুক্য দমন করা কষ্টকর হ'য়ে ওঠে, অঞ্জলীর ঐ লজ্জামাখা হাসিটাই কেমন আজ মাধুর্য্যভরা অর্থপূর্ণ। হাস্য প্রহেলিকা ভেদ করার জন্য সৌমেনের চাঞ্চল্য বেড়েই যায়।

অঞ্জলী ব'ললে, তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসে জল খেতে না ব'সলে আমি কিছুতেই ব'লবো না !

সৌমেন হাতমুখ ধুতে চ'লে গেল।

কুলী সর্দ্দারের বৌ তার কোলের ছেলেকে কোলে নিয়ে অঞ্জলীর সামনে এসে দাঁড়ালো দোক্তা-পান চিবুতে চিবুতে।

অঞ্জলী মুখ তুলে ব'ললে, কি গো বৌ ? কর্ত্তা এলো ?

ছেলেটাকে ধুলোর ওপর বসিয়ে বৌ নিজেও ব'সলো, ব'ললে, ও হতচ্ছাড়া আধ বুড়োর কথা ছাড়িয়ে দাও। আজ হপ্তা মিলেছে, বহুত্ স্ফূর্ত্তি হবে—তোবে তো ঘরকে ফিরবে ! নবাবজাদ্‌গিরি হামি ওর ছুটিয়ে দিতে পারি, লেকেন ডর লাগে।

বৌ বহুদিন বাঙ্‌লা দেশে এসেছে, এলে কি হবে—বাঙ্‌লা ভাষাটা আজও সে সঠিক ভাবে আয়ত্ত ক'রে উঠ্‌তে পারেনি ; অনবরত বাঙ্‌লা বুলি ব'লতে চেষ্টা করার ফলে সে খাঁটি হিন্দীটাও ভুলতে ব'সেছে। তার কথাই এই রকম, হিন্দী-বাঙ্‌লার জগা-খিচুড়ি। বৌয়ের বয়স অনুমান

করা শক্ত। ফর্সা রঙ হ'লে কি হয়, উল্কীর ছাপে সারা অঙ্গ তার চিত্রিত-বিচিত্রিত। এক-আধটা রঙ নয়, লাল-নীল-কাল নানারঙের ছোঁয়াচ প্রায় তার প্রধান প্রধান প্রতিটি অঙ্গে। দিব্যি মোটা গড়ন, সর্দ্দারের বৌ ব'লে তাকে মানায়। মানুষটা ভারি সাদাসিধে, মনে তার ছল-কপট নেই; পরোপকারীও বলা যায়। কুলী ব্যারাকের মধ্যে অঞ্জলীকেই সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, তাই তার সুখ-দুঃখের যতো কথা অঞ্জলীর সঙ্গেই হয়।

অঞ্জলী কাটা মাছ চুবড়ীতে তুলতে তুলতে ব'ললে, খোকাদের জন্যে খানকয়েক মাছ নিয়ে যাও, বৌ! এতো মাছ আমাদের খাবে কে?

—হ্যাঁ, তাতো বটে! ব'লে বৌ ঝিলের ধারে কলাগাছ থেকে খানিকটা কলার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলো।

মাছের টুক্‌রো ক'খানা কলার পাতে মুড়তে মুড়তে বৌ ব'ললে, শুধু মাছ দিলে হবেনি, পলা খানেক তেলও চাই অঞ্জু-মা!

—বেশ তো, বাটি নিয়ে এসো!

কুলী-সর্দ্দার মঙ্গল বেশ পয়সা উপায় করে, দু'দশ পয়সা উপরিও আছে; কিন্তু তার অবস্থা চিরকালই ঐ 'অন্ত-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ'। ছেলেমেয়ে সংখ্যায় অনেকগুলি, আঙ্গুলে গ'ণে হিসেব হয় কিন্তু সব কটারই হাড়ির হাল; না আছে পরণে এক-আধখানা ছেঁড়া কাপড়, আর না দু'বেলা দু'মুটো পেটপূরে ভাত। সংসার চালাতে বৌকে তার নাকের জলে চোখের জলে হ'তে হয়। পাওনাদারদের অন্ত নেই, কাবলী পর্য্যন্ত। না হবে কেন, ও অঞ্চলে সেরা জুয়াড়ী আর মাতাল ব'লতে মঙ্গল সর্দ্দারকেই বোঝায়। হাতে টাকা পয়সা এলে আর রক্ষা নেই তার, মদে আর জুয়ায় খরচ করার নেশায় সে যেন পাগল হ'য়ে ওঠে। পকেট ভারি থাকলে সে একাই রাজা মারছে, উজীর মারছে; দিব্যি দিল-দরিয়া মেজাজ। পকেট খালি হোক, মঙ্গল সর্দ্দার কেঁচোর চেয়ে নরম

এবং অধম, মুখে তার রা'টি নেই। প্রথম প্রথম তার বৌ তাকে নিবৃত্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল, ফল হয়নি কিছুই; চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

এ হেন মঙ্গল সর্দ্দারের সাহেব মহলে কিন্তু বিশেষ প্রতিপত্তি অর্থাৎ ক'লো সাহেবদের সে হাতের মুঠোয় রেখেছে। সাহেবরা মঙ্গল সর্দ্দারের কথায় ওঠে-বসে। বিসদৃশ এবং বীভৎস বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রতে মঙ্গল সর্দ্দারের মতো আর দ্বিতীয় বন্ধু সাহেবদের সারা কলবাড়ীর এলাকায় নেই। নেশা ভাঙ্ করুক আর যাই করুক, ভয়ানক কাজের লোক সে। এই মঙ্গল সর্দ্দারের সুপারিশের জোরেই সৌমেন আজ এখানের এক নম্বর মিলের কুলীদের হাজরে বাবু।

চা খেতে খেতে সৌমেন ব'ললে, আজ একবারে রাত ক'রে খাবো অঞ্জু! এখন আর জলখাবার দিও না। মঙ্গল সর্দ্দার আজ তার পয়সা থেকে পাঁটার মাংস আর পরটা খাইয়েছে বিকেলে। কৈ—এবার বল?

মাছ ভাজতে ভাজতে অঞ্জলী ব'ললে কিছু না বোঝার ভানে, কি বলবো?

—মাছ কুটতে কুটতে কি যে ব'লবে ব'ললে?

—জলখাবার যখন খেলে না তখন সে কথা বলা হবে না।

—খেয়ে যদি অসুখ করে?

অঞ্জলী কোন উত্তর দেয় না।

—কি, ব'লবে না তো?

—তোমার কথা আগে বল! মুখ ফিরিয়ে ব'ললে অঞ্জলী।

অর্দ্ধ সমাপ্ত চায়ের কাপ দুয়ারে রেখে ঘরে ঢুকলো সৌমেন। কপাটের দিকে পিছন ক'রে রান্না ক'রছে অঞ্জলী, সৌমেন পা টিপে টিপে এসে ঠিক তার পিছনে দাঁড়ালো; কি যেন তার একটা মতলব আছে।

—ও মা! অতর্কিতে অস্ফুটকণ্ঠে ব'ললে, অঞ্জলী। কালিয়া

রান্নার দিকে মনটা তখন তার প'ড়ে আছে, কি যেন রান্নার একটা ভুল ক'রে ফেললে।

—চোখদুটো একবার বোঁজ তো? সম্মোহন কণ্ঠে ব'ললে সৌমেন।

মুখ না ফিরিয়েই অঞ্জলী ব'ললে, তোমার ঠাট্টা-ইয়ারকি এখন রাখো। চোখ চেয়েই যা হ'চ্ছে—বুঝলে না জানি—

সদ্য কিনে-আনা ইয়ারিঙ্ দুটো পিছন থেকে সৌমেন অঞ্জলীর কানে দুলিয়ে দিলে। বাঁ হাত দিয়ে দু'কানে হাত দিয়ে ইয়ারিঙ্ দুটো নাড়তে নাড়তে অঞ্জলী ব'ললে, এসব বাজে পয়সা নষ্ট ক'রতে কে তোমায় ব'ললে?

—তবু এখনো চোখে দ্যাখোনি শুধু হাতে দেখেছো! ব'লে হাসতে লাগলো সৌমেন।

কালিয়া উনুনে ফুটতে থাকে, সৌমেন একরকম জোর ক'রেই হাত ধ'রে টানতে টানতে অঞ্জলীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আরসীর সামনে দাঁড় ক'রিয়ে হ্যারিকেন তার মুখের সামনে তুলে ধ'রে ব'ললে, দ্যাখো কেমন মানিয়েছে। চমৎকার!

স্মিতহাস্যে অঞ্জলী ব'ললে, কত নিলে?

—যতই নিক্ না! ওগো আজ যে আমার মাইনে বেড়েছে দু'টাকা! ব'লে সৌমেন সপ্রেমে অঞ্জলীর মুখখানি তুলে ধ'রলে নিজের মুখের ওপর।

—আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, আমার যে কালিয়া পুড়ে যাবে! ব'লতে ব'লতে অঞ্জলী গলায় আঁচল দিয়ে সৌমেনকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলে।

সৌমেন ব'ললে, তার মানে?

—গয়না প'রলে তোমাদের প্রণাম ক'রতে হয়। ব'লতে ব'লতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অঞ্জলী।

হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে হাসতে সৌমেনও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব'ললে, কৈ—তোমার কথা তো ব'ললে না? কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে অঞ্জলী ব'ললে, রান্নার সময় বিরক্ত ক'রতে নেই।

চার-পাঁচখানা ঘরের ওধারে দু'নম্বর ঘর থেকে হঠাৎ পরিত্রাহী, মর্ম্মন্তুদ চীৎকার উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে খুন্তি হাতে নিয়ে উনুনশাল থেকে ছুটতে ছুটতে এলো বৌ, ব'ললে, ওগো অ হাজরেবাবু। তোমার গোড়ে পড়ি। মেরে ফেল্লে—একদম মেরে ফেল্লে—জানে মেরে দিলে বৌটাকে। ওরে বাপরে বাপ্, মার বলে মার; কিল-চড়-ঘুষি আবার লাথি। ম'রে গ্যালো বৌটা, চেঁচিয়ে কাঁদতে জানেনি গো—চেঁচিয়ে কাঁদতে জানেনি। ঘণ্টাখানেক ধ'রে প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে আর গোঁয়াচ্ছে। অমন মেয়ে এ তল্লাটে হবেনি গো—এ তল্লাটে হবেনি। ওগো ওদাসমশা—

সৌমেন এখানে নিখিল দাস নামে পরিচিত।

নন্দরাণীর কান্না শুনে তার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এবং বৌয়ের চীৎকার শুনে সৌমেনের ঘরের সামনে লোক জমে যেতে বিলম্ব হ'লো না। সৌমেন দু'নম্বর ঘরের দরজা সশব্দে নাড়া দিয়ে ক্ষিপ্তকণ্ঠে ব'ললে, বিপিন! বিপিন!! শীগ্‌গীর দরজা খুলে দাও।

মত্ত বিপিনের জড়িত কণ্ঠস্বর তখন বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে, চুপ্ শালী—বিলকুল চুপ্। গলাবাজী ক'রে শালী তুমি হাটের লোক জড় ক'রছো? ওরা কি তোর বাবা-খুড়ো? ফের যদি গোঁয়াবি তো গলা টিপে মেরে ফেলবো। আবার—ফের—! দাঁড়া, তোর নাকে-মুখে গামছা গুঁজে দিয়ে ফোঁস-ফোঁসানি বার ক'রছি! তবে রে শা—

ভেতর থেকে ভেসে আসে নন্দরাণীর আকুলকণ্ঠের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ, ওরে বাবারে—মেরে ফেললেরে। কে কোথা আছো গো—আমায় বাঁচাও গো—

দরজা প্রচণ্ড ধাক্কায় ভাঙ্‌বার উপক্রম হ'য়ে উঠলো।

—ভালো চাও তো এখনো দরজা খুলে দাও বিপিন, নইলে—

ভিতর থেকে নন্দরাণীর গোঁয়ানী কানে এলো। সৌমেনের প্রচণ্ড পদাঘাতে দরজার খিল গেল ভেঙে। মার খেয়ে নন্দরাণী মাটিতে প'ড়ে গোঁয়াচ্ছে। দরজা সশব্দে খুলে যাওয়ামাত্র একটা দেশী মদের বোতল উঁচিয়ে টলতে টলতে বিপিন দরজার ধারে এগিয়ে এসে ব'ললে, সব রগড় দেখতে এসেছো। দেখছো বোতল, কাঁচা মাথা দু'ফাঁক ক'রে ছেড়ে দেবো। স'রে পড়ো—সব স'রে পড়ো!

—কি ভেবেছো তুমি? ব'ললে সৌমেন।

মুখ ভেট্‌কে মাথা দুলিয়ে বিপিন ব'ললে, এঃ ভারী যে ওপরওলা-গিরি ফলাচ্ছো? ও সব ভারিক্কি চাল কলবাড়ীতে গিয়ে ফলিয়ো, এখানে আমি কারুর তোয়াক্কা নেহি করেঙ্গা! বাড়ীতে আমি আমার মাগকে মারবো, কাটবো, মাটি খুঁড়ে জ্যান্তো পুঁতে ফেলবো—আমার যা খুসী আমি তাই করেঙ্গা! তোমাদের মাথাব্যথার দরকার? আমি তোমাদের সালিশি ক'রতে ডেকেছি?

সৌমেনের ইঙ্গিতে একজন জোয়ান রকমের লোক বিপিনের হাত থেকে নিলে বোতলটা ছিনিয়ে, টানাটানি কাড়াকাড়ির সময় বোতলের বাকি মদটা সব প'ড়ে গেলো। অস্ত্রহারা বিপিন হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে সখেদে ব'ললে, বোতলটা নিলি নিলি—বেশ ক'রলি, কিন্তু মালটা কেন ফেলে দিলি?

বৌ, অঞ্জলী প্রভৃতি নন্দরাণীর মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, পাখার বাতাস ক'রে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। ঘরের দাওয়ার ওপর বিপিনের চ'ললো অবিশ্রান্ত বক্তৃতা।

সৌমেন ডাকলে, বিপিন?

—কে? অ ওপরওলা! কি ব'লবে বল, জ্ঞান আছে আমার চার

পো টন্‌টনে। ব'লতে পারে কোন শা—আমি মদ খেয়ে মাতলামি করি? No—Never!

—মাতলামি কর আর নাই কর, মোট কথা—তোমার স্ত্রীকে ধ'রে আমাদের চোখের সামনে এভাবে চোরের ঠ্যাঙানি ঠ্যাঙাতে পারবে না, কিছুতেই না। ফের যদি কর তবে সাহেবের কাছে তোমার নামে আমি report ক'রতে বাধ্য হবো।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বিপিন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ক'রে ব'ললে, এঃ, report অমনি ক'রলেই হ'লো। আমি তো আমি, সাহেব কি কিছু কমতি যায়! মাল টেনে সে তার মেমকে মারে না? আলবৎ মারে! যে মাল খায় সে-ই তার বৌকে ধ'রে মারে। তা ছাড়া, নন্দ কি আমার বৌ—না মাগ্? ওকে তো আমি আমাদের পাশের গাঁ থেকে বার ক'রে এনেছি। আমি ওকে কি মার মারি—ফোঃ, কিছুই নয়! ওর স্বামী পরাণ দুলে তাড়ি খেয়ে যা মার ওকে মারতো—হাঃ হাঃ হাঃ—একবারে রক্ত-ফেটে মারা যাবার দাখিল। মারের ধমকেই তো শালী ঘর-দোর ছেড়ে আমার সঙ্গে হাওয়া দিলে!

—ও সব বাজে কথা ছাড়ো। মারতে আমরা তোমাকে কিছুতেই দেবো না—তা সে নন্দ তোমার বউই হোক আর নাই হোক! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলে—তোমার একটু মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নেই। মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে আছে? আমরা অনেক সহ্য ক'রেছি, আর নয়। এই শেষবার তোমার—

কোটরে-ঢোকা চোখ দু'টো পিট পিট ক'রে সৌমেনের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে কথায় শ্লেষ মিশিয়ে বিপিন ব'ললে, ওঃ, খু-ব যে দরদ দেখছি! বলে—মায়ের চেয়ে মাসীর টান! ওপরওলার এত দরদ তো ভাল নয়! সন্দেহ হ'চ্ছে বাবা, ভেতরে কোন যোগাযোগ আছে নিশ্চয়! ঘরে ছুক্‌রী মাগ্ থাকতে—

—খবরদার, মুখ সামলে বিপিন ! যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা ! ব'লতে ব'লতে মারমুখী হ'য়ে ওঠে সৌমেন। বিপিনের মুখ কামাই যায় না, বা সে একটু দমে না। সে টলতে টলতে দোর থেকে উঠানে নেমে এসে ব'ললে, ওপরওলা আছো—ওপরওলা আছো ! আমার স্ত্রীকে নিয়ে তোমার অত কিসের হে, বাপু ! আবার রোয়াবি !

—তবে রে রাস্‌কেল !

অঞ্জলী ছুটে ঘর থেকে পাখা হাতে বেরিয়ে এসে সৌমেনকে ধ'রে ফেলে ব'ললে, ঘরে চলো ? মাতালের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা ক'রে লাভ কি ? ওর কি এখন মাথার ঠিক আছে ! আঃ এসো ?

—মারের চোটে ইডিয়টের নেশা আমি আজ ছুটিয়ে দেবো। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ব'ললে সৌমেন।

সৌমেনের হাত ধ'রে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ব'ললে অঞ্জলী, পাগল আর মাতাল সমান কথা, মারলে কোন্ ফল হবে—শুধু কেলেঙ্কারীই হবে !

নিজের ঘরের এলাকায় দাঁড়িয়ে বিপিন সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো, ভারি মুরোদ, মাগের আঁচল ধ'রে ঘরের কোণে গিয়ে আরসোলার মত ঢুকে পড়লো ! মারে সব্বাই ! গায়ে হাত তোলা চাট্টিখানি কথা নয় ! গা আড়াল দিলে কেন বাবা, মেরেই একবার ভ্যাখো—কত ধানে কত চাল ! বিপিন মুখুয্যের গায়ে হাত দেওয়া বড় যে-সে কথা নয় ! একেবারে ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়ে ছেড়ে দেবো !

উঠানের সামনে ক্রমশঃই ভিড় জমছে। বেটাছেলে মেয়েছেলে সংখ্যায় অনেক এবং প্রায় সকলেই কুলি পর্য্যায়ভুক্ত। কারো কোলে ছেলে—কারো কাঁধে, সবাই এসেছে ঝগড়া ঠিক শুনতেও নয়, দেখতেও নয়—উপভোগ ক'রতে ! আজ এঘরে, কাল ওঘরে, পরশু পাশের

ঘরে—স্ত্রী পুরুষে ঝগড়া-মারামারি এখানের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। দেখে দেখে আর শুনে শুনে বাসীন্দাদের চোখ আর কাণ প'চে গেছে। তবে যে চার-পাঁচ ঘর ভদ্রলোক এই ব্যারাকের বাসিন্দা তাদের মধ্যে এই বিপিন মুখুয্যেকে বাদ দিয়ে আর কারোর ঘরে কোন দিন স্ত্রী-পুরুষে ঝগড়াঝাঁটি খুবই কম হয়, প্রায় হয় না ব'ললেই চলে।

ভিড় সরিয়ে মঙ্গল সর্দ্দার বিপিনের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভয়াবহ চেহারা এই মঙ্গল সর্দ্দারের, যেমনি লম্বা আর তেমনি চওড়া, ইয়া বুকের ছাতি, কচা কচা গোঁপদাড়ি—মাথায় বাবরি চুলের রাশ। গলায় একটা আধপোয়াটাক ওজনের পিতলের মাদুলি। হাতে একগাছি খেঁটে। পরণে মলিনাদপি মলিন তেলচিটে ধরা একখানি মোটা থান খোঁট্টাই প্যাটার্ণে ফেত্তা দিয়ে পরা।

মঙ্গল সর্দ্দারের চেহারার অনুপাতে কণ্ঠস্বরটিও আতঙ্ক-উদ্দীপক। গম্ভীর-কণ্ঠে মঙ্গল ব'ললে, কি মুখুয্যেমশা! অত তড়পাচ্ছো কেনে? মালটাল কি আমরা খাইনি কখন? ছটাকখানেক মাল টেনে ব্যারাক যে তোলপাড় ক'রে দিচ্ছো গো, বাবুমশা। ওসব চলবেনি।

—যা, যা! যেমনি নিখিল—তেমনি এই ব্যাটা মোট্‌কা! মাণিক-জোড় দু'টি জুটেছে ভালো। দু'ব্যাটাই সাহেবের খয়েরখাঁ!

মঙ্গল সর্দ্দার ব'ললে, এই মাণিকজোড় দু'টি না থাকলে বাবুমশার হাড়ে যে এ্যাদ্দিন দুব্বো গজিয়ে যেতো! বেশী বাড়াবাড়ি করোনি মুখুয্যেমশা, হাঁড়ি আবার শিকেয় তুলে দেবো!

—যা যা ব্যাটা পাজি, ছুঁচো, ফিরিঙ্গীর গোলাম! সব ক'রবি তোরা! আরো কত কি—হয়তো অশ্রাব্য কিছু ব'লতে যাচ্ছিলো বিপিন, মঙ্গল তাকে সে সুযোগ দিলে না; ধ'রলে খপ্ ক'রে তার ঘাড়টি টিপে। হুঙ্কার দিয়ে ব'ললে মঙ্গল, দাসমশা তোমায় ছেড়ে দিয়েছে ব'লে আমি কিন্তু ছাড়ছিনি। তাকে ভাল মানুষ পেয়ে তুমি যা তা—

—ছেড়েদে ব্যাটা ছাতুখোর! জুতিয়ে লম্বা ক'রে দেবো! ওরে বাবা-রে—গেছিরে! খুন ক'রলে শা-আ-আ—

উপস্থিত জনতা হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো। মঙ্গলকে সকলেই চিনতো, সহজে সে কাকেও কিছু বলে না, কিন্তু একবার ক্ষেপলে আর রক্ষা নেই। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সেই জন্য সারা ব্যারাকের লোক তাকে ভালও বাসে যেমনি ভয়ও করে তেমনি। এখানের এই কুলী সমাজের ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা করার ভার একমাত্র তারই ওপর। একদিকে সে দয়ার দধীচি, অন্য দিকে সাপের চেয়েও সয়তান, ক্রূর।

—আজ তোমার ঘাড় ভেঙে ঝিলের পাঁকে পুতে ফেলবো—তবে আমার নাম মঙ্গল সর্দ্দার। ব'লতে ব'লতে চোখের নিমিষে সে বিপিনকে এক ঝটকায় মাটির ওপর ফেলে তার বুকের ওপর ব'সলো।

জনতার মাঝে উঠলো একটা আর্ত্ত কলরব। ছত্রভঙ্গ জনতার ভিতর থেকে সদ্য-সংজ্ঞাপ্রাপ্তা নন্দরাণী যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এসে তার দুর্ব্বল ছোট্ট দুখানি হাতে চেপে ধরলে ক্ষিপ্ত মঙ্গল সর্দ্দারের একখানি হাত, ব'ললে মিনতিভরা করুণ কণ্ঠে, সর্দ্দার! আজকের মত ছেড়ে দাও ওকে? এখুনি ম'রে যাবে!

নন্দরাণীর স্পর্শে শিথিল হ'য়ে এলো তার বজ্রমুষ্টি, তার দানবীয় ক্রোধ ও শক্তি মায়াবিনীর স্পর্শে লুপ্ত হ'লো; মঙ্গল মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে, আমার হাত ছেড়ে দে, বেটী।

আর একটি কথাও মঙ্গল সর্দ্দারের মুখ দিয়ে বেরুল না, নিজের কাজে সে যেন নিজেই লজ্জিত। কারো দিকে সে ফিরেও চাইলে না, ঘাড় হেঁট ক'রে আবছা অন্ধকারে রেল লাইনের দিকে ধীর পদক্ষেপে চ'লে গেলো।

সেদিন বিশ্বকর্ম্মা পুজা উপলক্ষে ছুটি।

চট্‌কলে একমাত্র রবিবার বাদ দিলে ছুটি মেলে খুবই কম, কাজ থাকলে রবিবারও বেরুতে হয়; অবশ্য তার জন্য আলাদা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা আছে। যন্ত্র নিয়ে যাদের কারবার, যন্ত্র-দেবতার উপাসনা উপলক্ষে ছুটি তাদের দিতেই হয়; যত কাজই থাক—বিশ্বকর্ম্মা পুজার দিন যন্ত্রে কেউ হাত দেবে না।

ভোর হ'তে না হ'তেই বিপিন সৌমেনের দুয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে ডাক্ দিলে, নিখিলদা—ও নিখিলদা ?

মদ পেটে পড়লে বিপিনের দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না সত্য, আসলে লোকটার প্রকৃতি কিন্তু অত্যন্ত সরল, মাটির চেয়ে নরম ; মনে কোন খল-কপটতা নেই। গত রাত্রের বিপিন যেন ম'রে গেছে, এ আর এক নূতন লোক। সাধারণতঃ মদ-পিয়াসীদের দিলটা একটু সরল ও সহজ। সহজ অবস্থায় বিপিন মাটির মানুষ সৌমেনকে সে ভালবাসে, ওপরওলা হিসাবে একটু হয়তো তোষামোদও করে। সৌমেন কুলীদের হাজরেবাবু, বিপিন তার সহকারী ; দু'জনে প্রায় সমবয়সী। সমবয়সী হিসাবে এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্দ একটু বেশীই লক্ষিত হয়। সৌমেন নিরক্ষর মঙ্গল সর্দ্দারকে খাতির করে এবং সব কাজেই নেয় তার পরামর্শ, কারণ ঐ বিচক্ষণ পরোপকারী ব্যক্তির দয়াতেই সে আজ ক'রে খাচ্ছে। বিপিন কিন্তু সৌমেনের ঠিক বিপরীত, ও কিছুতেই মঙ্গল সর্দ্দারকে সহ্য ক'রতে পারে না। তা ব'লে বিপিন নিমকহারাম নয়, সে স্বীকার করে যে মঙ্গল সর্দ্দারের চেষ্টাতেই এখানে দু'মুটো অন্ন ক'রে খাচ্ছে ; তবু সর্দ্দারকে সে দেখতে পারে না, কারণটা বোধ হয় তারও অজ্ঞাত।

বিপিনের ডাকাডাকিতে সৌমেনের ঘুম ভেঙে গেল। এত ভোরে ঘুম ভাঙানোর দরুণ সে সন্তুষ্ট হ'লো না। ভোরে ওঠা তো নিত্যকার ব্যাপার, সকাল সাতটার মধ্যে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে কলবাড়ীতে গিয়ে

হাজির দিতে হয়। হাজরেবাবুর হাজরে বিলম্ব হ'লে চ'লবে কেন ? কলের সিটি বাজলে আর রক্ষা নেই। বিপিন ঠাট্টা ক'রে বলে,—শ্যামের বাঁশী! বাজলে আর কথাটি নেই—ছুটতেই হবে অভিসারে।

বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকার ইচ্ছা থাকলে কি আর হবে, বিছানা ছেড়ে উঠতেই হ'লো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সৌমেন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ব'ললে, রাতের জের কি ভোরবেলাও কাটিয়ে উঠতে পারোনি হে ? কাক-কোকিল না ডাকতে ডাকতেই—নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না ! ব'সো, চা খাও।

দুয়ার থেকে ভাঙা বেতের মোড়াটা টেনে নিয়ে উঠানের এক কোণে পেতে ব'সলো বিপিন। সৌমেন হাত-মুখ ধুয়ে এসে নিজেই কাঠের উনুনটা জেলে চায়ের জল চাপিয়ে দিলে। অঞ্জলী ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে উঠানে নেমে এসে ব'ললে বিপিনের উদ্দেশে, ঠাকুরপো ! দোরে উঠে ব'সো। দেবর লক্ষ্মণের মত বিপিন নতমস্তকে বৌদির আদেশ বা অনুরোধ তৎক্ষণাৎ নীরবে পালন ক'রলে। নোনাধুলায় ভরা উঠানে প্রথমে জলছড়া দিয়ে অঞ্জলী ওপর ওপর ঝাঁটা বুলিয়ে ঝিলে গেল কাপড় কাচতে।

চা তৈরী ক'রে খাওয়া সৌমেনের অভ্যাস নয়। অন্যান্য দিন ভোররাত্রে জল চাপিয়ে অঞ্জলী সৌমেনের ঘুম ভাঙ্গায়। তৈরী চায়ের কাপ তার সুমুখে ধ'রে না দিলে সে বিছানা ছাড়তে চায় না। চা খেয়ে ভোরের আলোয় সে যায় স্নান ইত্যাদি সারতে।

অন-অভ্যাসের দোষে সে যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়ে। ঘাট থেকে এসে কাপড় ছেড়ে অঞ্জলী বসে চা তৈরী ক'রতে। গরম চায়ের পিয়ালা সৌমেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে অঞ্জলী ব'ললে বিপিনকে, এসো ঠাকুরপো, এগিয়ে এসো।

অঞ্জলীর হাত থেকে পেয়ালাটি নিয়ে বিপিন ডান হাতে তার পা ছুঁয়ে ব'ললে, আগে বল—আমায় ক্ষমা ক'রলে, নইলে চা তো চা—তোমার বাড়ী আমি জল-গ্রহণও ক'রবো না !

ত্রস্তে পা'টা সরিয়ে নিয়ে অঞ্জলী ব'ললে, কি যে কর ঠাকুরপো ! সকালবেলা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

— শুধু ছিঃ ছিঃ ছিঃ ক'রলে হবে না, আগে বল মুখ ফুটে—নইলে তোমার চায়ের কাপ আমি ছোঁবও না। মাথায় আমার পোকা আছে, জানো বৌদি—মাথায় আমার পোকা আছে !

—আচ্ছা তা নয় ক'রলাম, এখন চায়ের কাপটি শেষ করো দেখি।

চট্‌ ক'রে বিপিন অঞ্জলীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ব'ললে, বিশ্বাস ক'রবে না বৌদি—আমি এতোদিন বলি বলি ক'রেও ব'লতে পারিনি, তোমার মুখখানি আমার মা'র মুখের মতো !

সৌমেন নীরবে চা খেতে খেতে মন্তব্য ক'রলে, বাঃ বিপিন যে গাইছে ভালো !

বিপিন হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ফেললে, ব'ললে, আজ থেকে বৌদি আমার মা—ধরম্‌ মা !

—অঞ্জলী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলো কে জানে, রোদ না উঠতে উঠতে পুত্রলাভ। তোমার বৌদি অর্থাৎ কিনা ধরম্‌ মায়ের উচিত আজ আমাদের ভাল ক'রে খাইয়ে দেওয়া। ব'লে সৌমেন অঞ্জলীর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

অঞ্জলী ব'ললে, ঠাকুরপো ! আজ দুপুরে তোমার আর নন্দরাণীর আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ রইলো !

বিপিনের পিঠ চাপড়ে সৌমেন উল্লাস সহকারে ব'ললে, তোমার যাত্রাটা ভাল হে, বিপিন !

—তুমি গিয়ে মঙ্গল সর্দ্দার আর তার বৌকে ব'লে এসো—তারা

ছেলেপুলে নিয়ে আজ দু'পুরে এখানে খাবে। সৌমেনের উদ্দেশে ব'লে অঞ্জলী গৃহকার্য্যে মন দেয়।

বিপিনকে সঙ্গে নিয়ে নিমন্ত্রণের কাজটা সেরে সৌমেন বেরুলো বাজার ক'রতে।

নিমন্ত্রিতদের আহারাদি শেষ হ'তেই দুপুর পেরিয়ে গেল। অপরাহ্ন অতীতপ্রায়। অবেলায় খেয়ে সৌমেন ঘুমুচ্ছিল, অঞ্জলীর ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। সৌমেন মুখ-হাত ধুয়ে এসে দেখলে—গোধূলির স্তিমিত আলোকে অঞ্জলী তখনও ছোট্ট কাঁথাখানি একমনে চিত্রিত-বিচিত্রিত ক'রে নানা রঙের কাপড়ের পাড়-তোলা সুতা দিয়ে সেলাই ক'রছে ঘাড় হেঁট ক'রে। কপালের ওপর তার ফুটে উঠেছে ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা।

—বাঃ বেড়ে হ'য়েছে তো! পাশে দাঁড়িয়ে ব'ললে সৌমেন।

ক্ষণেকের জন্য পরিশ্রান্ত মুখখানি সৌমেনের মুখের ওপর তুলে আবার সে নিজের কাজে মন দিলে নীরবে।

—অবেলায় খেয়ে একটু বিশ্রাম পর্য্যন্ত ক'রলে না, সেই থেকে ঠায় কাঁথা নিয়ে ব'সে আছো? অত লোকের রান্না একলা হাতে রাঁধা কি যে-সে কথা! শুধু কি রান্না, নিজের হাতে কোটা আছে—বাছা আছে। জলের ঘটিটি পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবার—

—আঃ কি আরম্ভ ক'রলে! সংসারে কাজ কি কেউ করে না? সূচের দিকে লক্ষ্য রেখেই ব'ললে অঞ্জলী।

—কিন্তু অভ্যাস থাকা চাই!

অঞ্জলীর দিক্ থেকে কোন উত্তরই এলো না।

সৌমেন কাঁথাখানির দিকে চেয়ে ব'ললে, কিন্তু এ বৃথা পণ্ডশ্রম কেন? এত ছোট্ট ছোট্ট রঙ-বেরঙের কাঁথা তোমার হবে কি, কোন্ কাজে লাগবে?

স্নিগ্ধ লাজনম্র হাসিতে অঞ্জলীর মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠলো, অপূর্ব্ব শ্রী ফুটে উঠলো তার সারা মুখখানিতে। তার হাতের কাজের গতি ঈষৎ শিথিল হ'য়ে এলো, কি যেন বলি বলি ক'রেও সে লজ্জায় ব'লতে পারলে না। একবার শুধু অপাঙ্গে সে চেয়ে দেখলে সৌমেনের মুখের দিকে, চোখের ওপর চোখ পড়তেই সে চোখ নামিয়ে নিলে।

-এসব তুমি শিখলে কবে? কৈ ক'লকাতায় থাকতে তো কোন দিন দেখিনি? সৌমেন ব'সলো অঞ্জলীর পাশে।

—তখন প্রয়োজন হয়নি! ছোট্ট কথায় উত্তর দিলে অঞ্জলী।

কাঁথার প্রয়োজন—এখন—তোমার! বিস্ময়াত্মক অর্দ্ধ-অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললে সৌমেন।

সৌমেন নীরবে বিহ্বলনেত্রে চেয়ে রইলো অঞ্জলীর মুখের দিকে। অঞ্জলীর কাজে, কথায়, চাহনীতে হেঁয়ালী,.. কিন্তু কি এর তাৎপর্য্য? সৌমেন গবেষক হ'য়ে উঠলো। সে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চেয়ে রইলো অদূরে ঝিলের ওপরে ঐ দেবদারু গাছটার শিরডগে। একটা কথা ভাবতে ভাবতে আর-একটা কথা হঠাৎ তার মনে প'ড়লো। কাঁথার প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে সে অঞ্জলীকে জিজ্ঞেস ক'রলে, কাল যে কি একটা কথা ব'লবে ব'লেছিলে?

সেলাই বন্ধ ক'রে স্মিতহাস্যে অঞ্জলী ব'ললে, কি কথা?

—কি কথা তা' আমি কেমন ক'রে জানবো?

অঞ্জলী নীচেকার ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে মুখটা নামিয়ে নিলে, চোখেতে তার খেলছে তখন হাসির হিল্লোল।

—কি কথা, ব'ললে না?

মুখ নীচু ক'রেই অঞ্জলী ব'ললে, জানি না!

অঞ্জলীর বলার ভঙ্গী এবং গলার স্বর বড়ই অপূর্ব্ব, মাধুরীমাখা; লজ্জা, আনন্দ যেন এক সঙ্গে মিশে সৃষ্টি ক'রেছে এক অপরূপ মূর্চ্ছনা।

অঞ্জলীর মুখের সে শ্রী, তার কথার স্বর—চোখেই লেগে থাকে, কানেই ধ্বনিত হয় ; ব্যক্ত হয় না শুধু বর্ণনায়। কোন কিছু না জানার মাঝে যে এত রূপ, এত রস, এত গন্ধ, এত মধু লুকানো থাকতে পারে—তা সৌমেন জানলে তার জীবনে এই প্রথম। কিন্তু কি সে অপূর্ব্ব গুপ্তকথা যা অঞ্জলী নিজে জেনেও একান্ত প্রিয়তমকে আকুল আগ্রহে জানবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারছে না নিজেকে প্রকাশ ক'রতে! মানুষ মাঝে মাঝে মসৃণ পথে এমনিভাবেই দিশেহারা হয়। অপূর্ব্ব বিস্ময়ে সৌমেন চেয়ে থাকে অঞ্জলীর মুখের দিকে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, অঞ্জলী ব'ললে, বুঝতে পারলে না?

—তুমি না ব'ললে তোমার মনের কথা আমি কেমন ক'রে বুঝবো!

—তুমি কিছু বোঝ না! কাঁথা দেখেও বুঝতে পারছো না? ব'লতে ব'লতে হেসে ফেললে অঞ্জলী।

—এ্যাঁ, কি বলছো তুমি? নিজের কথা নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো সৌমেনের। কথার স্বরে তার না আছে বিস্ময়, না আছে উল্লাস আর না আছে কারুণ্য!

—যা ব'লছি ঠিকই ব'লছি। তবুও বুঝলে না? কাঁথাখানা মুড়ে রাখতে রাখতে ব'ললে অঞ্জলী।

সৌমেনের মুখে ফুটলো আনন্দের ছায়া, অপরূপ হাসি।

—তুমি—তুমি একটি—! ব'লতে ব'লতে অঞ্জলী উঠে প'ড়লো।

—ও কথা এতক্ষণ আমায় স্পষ্ট ক'রে ব'লতে হয়! আরে শোন, শোন, পালাচ্ছো কোথা? আজ তো আবার তাহ'লে ব্যারাকশুদ্ধো লোককে নেমন্তন্নো ক'রে খাওয়াতে হয়!

—আমি জানি না! একরকম ছুটেই অঞ্জলী ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

—তা ব'ললে ছাড়ছে কে? তোমার হবে ছেলে আর জানবো কি

আমি। ব'লতে ব'লতে সৌমেন ছোট ছেলের মত অসীম উল্লাসে একরকম লাফ দিয়েই অঞ্জলীর পিছু পিছু ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বিশ্বকর্ম্মা পুজার দিন কুলী মজুরেরা একটা বিশেষ জলসার ব্যবস্থা ক'রলে কুলী ব্যরাকের শেষ প্রান্তে—সন্ধ্যার কিছু পরে। এই বিশেষ উৎসবে মেয়েপুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ। উৎসবটিকে জীবন্ত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যই বোধ হয় অল্প-বিস্তর নেশা ক'রতে কেউই কার্পণ্য ক'রলে না। ডাবরি ভর্ত্তি তাড়ি আর ধান্যেশ্বরীর গন্ধে আলোচ্য স্থানটি ভরপুর হ'য়ে উঠলো। স্থান মাহাত্ম্যে অরসিকেরও কেবল 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং' হিসাবে মত্ত হওয়া নেহাত অস্বাভাবিক নয়।

কেরোসিনের দু'নলা হনুমান ল্যাম্পগুলো চতুর্দ্দিকে আলোর পরিবর্ত্তে ধূম উদগীরণই ক'রছে বেশী। তাড়ি ও দেশী মদের গন্ধে, কেরোসিনের ধুঁয়ায়, মত্ত নরনারীর উৎকট কোলাহলে স্থানটি ধূমায়িত, মুখরিত।

আসরের মাথার ওপর শতছিন্ন ত্রিপল, তলায় পাতা শতছিন্ন, মলিন সতরঞ্চ, চট, ছেঁড়া মাদুর প্রভৃতি। আসরের মাঝখানে চ'লেছে নাচ-গান আর বাইরে চ'লেছে দর্শকদের হল্লা। সংখ্যাতীত দর্শক, আসরে যাদের স্থান না হ'য়েছে তারা ব'সেছে মাটির ওপর উবু হ'য়ে, পিছনের দর্শকরা আছে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। গান-বাজনার চেয়ে গানের তারিফের মাত্রাই বেশী, অতিরিক্ত বাহবা দেওয়ার বা পাওয়ার ফলে গাইয়ে বাজিয়েরা তাল কেটে ফেলছে। যেমন কর্ণপটাহভেদী বাজনা তেমনি হৃদয়-বিদারক সঙ্গীত; প্রাণ যেন 'ত্রাহি মাং মধুসূদন' ডাক ছাড়ে! সাধে কি আর শ্রোতারা নেশা ক'রেছে, নেশা না ক'রলে ওখানে সাধারণ স্থিরমস্তিষ্ক লোকের ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকাই মুস্কিল—বিপজ্জনকও বলা যায়।

তবলার তালে তাল রেখে একটি আধাবয়সী মেয়েছেলে হেলে-দুলে নাচতে নাচতে গাইছিল :—

"শুনছো ওগো মেজদিদি,
খোকার বাপের চাকরী হবে।
তিরিশ টাকা মাইনে পাবে,
দশ টাকা তার আমায় দেবে—
দশ টাকা তার পকেট খরচ—
দশ টাকাতে নত্ গড়াবে।
এ বছর যেমন তেমন
আসছে বছর ইট্ পোড়াবে।
(আর) পুবের চাঁদ পচ্চিমে যাবে—
জানালাতে কাচ বসাবে।"

'হায়—হায়', 'ঘুরে ফিরে ভাই', 'বা-ভাই বা-ভাই বা-ভাই' প্রভৃতি তারিফ করার উৎসাহবাণীর দ্বারা আসরের জমায়েত মত্ত শ্রোতৃবৃন্দ গায়িকাকে উৎসাহিত ক'রলে। গান থামা মাত্র সুরু হ'লো হাততালি, চ'লেছে তো চলেইছে—বিরামবিহীন হাততালি।

আসরের মাঝখানে ব'সে বিপিন তখন খুব মাতব্বরি ক'রছিল, হঠাৎ কে যেন এসে তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। অদূরে একটা গাছের তলায় সৌমেন দাঁড়িয়েছিল, বিপিন টলতে টলতে গিয়ে সেখানে হাজির হ'লো।

—ফের মাতলামি সুরু করেছো? মাত্র ক'ঘণ্টার মধ্যে নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে! ছিঃ! ব'ললে সৌমেন।

—মাতলামি হয়তো একটু-আধটু আমি ক'রছি কিন্তু আমি কি কাকেও মেরেছি—না গালাগালি দিয়েছি! জবান্ আমার ঠিক আছে। তুমি দেখে নিও, নন্দরাণীর গায়ে হাত তুলবে আর কোন্ শা—! কেমন

নিজেকে সামলে নিলুম দেখলে? বেচাল আমার কাছে একটুও পাবে না। অই—অই শোন গান ধ'রেছে নলিনী, বেড়ে গায় মাইরি! এসো—গান শুনবে তো এসো।

সৌমেন ওর হাতটা চেপে ধ'রে বললে, আর তোমায় গান শুনতে হবে না—বাড়ী ফিরে চলো।

বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী ক'রে বিপিন ব'ললে, কি কথাই ব'ললে! অমন তোফা গান ছেড়ে আমি এখন বাড়ী ফিরে নন্দর প্যানপ্যানানি-ঘ্যানঘ্যানানি শুনি। চালাকি করোনি মাইরি; হাত ছেড়ে দাও।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিপিন আবার আসরে গিয়ে ঢুকলো। ইচ্ছা ক'রলে সৌমেন বাধা দিতে পারতো কিন্তু লাভ কি? মানুষকে কুপথে নিয়ে যাওয়া যতটা সহজ, শোধরান ততটা সহজ নয়। একটা চেঁচামেচি, হট্টগোল এবং কেলেঙ্কারীর ভয়ে বিপিনকে আর কোন কথা না ব'লে সৌমেন ঘরে ফিরে এলো।

হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে ছ'টি মাস কেটে গেল।

কুলী ব্যরাকের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ কিছু বদলায়নি। কুলীদের জীবনে আবার জোয়ার-ভাঁটা বা উত্থান-পতন কি? একান্ত একঘেয়ে জীবন। তবে হ্যাঁ, সৌমেনের সংসারে একটু নতুনত্ব এসেছে। আজ ক'দিন হলো—অঞ্জলীর একটি ফুট্‌ফুটে খোকা হ'য়েছে; আর সঙ্গে সঙ্গে একরকম বিনা কারণেই সৌমেনের বেড়েছে দু'টাকা মাইনে। লোকে ব'লছে, ছেলেটা পয়মন্ত!

অঞ্জলী তার ছেলের নাম রেখেছে, লক্ষ্মীকান্ত।

ছেলের নামকরণ নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক কথা-কাটাকাটি, বহু তর্কাতর্কি হ'য়ে গেছে। লক্ষ্মীকান্ত নামটা সৌমেনের কেমন পছন্দ হ'চ্ছে না। আধুনিক মেয়ে হ'য়ে কেমন ক'রে যে অমন

একটা সেকেলে বিদকুটে নাম অঞ্জলী তার নিজের ছেলের রাখতে পারে তা সৌমেন মোটে ভেবেই পায় না। আটকড়ায়ের দিন সন্ধ্যায় অঞ্জলী ব'ললে, তুমি দেখে নিও, লক্ষ্মীকান্ত নাম রাখা আমার সার্থক হবে।

উপহাসের হাসি হেসে সৌমেন ব'ললে, সার্থক হবে--না ছাই হবে!

—আজও কি গুছিয়ে মানে বুঝে কথা বলতে শিখলে না! খোকার যাতে অকল্যাণ হয়—এমন কথা কি তোমার মুখ দিয়ে না বেরুলেই নয়?

লজ্জায় সৌমেনের মুখ দিয়ে সত্যই আর কথা বেরুলো না। খোকার ওপর তো তার রাগ নয়, রাগ তার ঐ বেখাপ্পা নামটার ওপর।

সন্ধ্যার কিছু পরেই পালে পালে ছেলে এসে অঞ্জলীর দুয়ারের সামনে হল্লা সুরু ক'রলে। নন্দরাণী অঞ্জলীদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেদের দিলে একখানা কুলো। কুলোখানা বাজাতে বাজাতে ছেলেরা সমস্বরে সুর করে ব'লতে লাগলো, 'আটকড়ায়ে বাটকড়ায়ে ছেলে আছে ভালো.........ইত্যাদি। কাটি দিয়ে বাজাতে বাজাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা কুলোখানা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেললে।

ওদের প্রত্যেককে দেয়া হ'লো খৈ, মুড়ি, কড়াই, বাদাম প্রভৃতি মিশিয়ে এক একটি সরা, চারটে ক'রে নারকেল নাড়ু, একখানা ক'রে সন্দেশ আর একটি ক'রে গোটা আনি। দুটি ক'রে পয়সা দিবার কথা ছিল কিন্তু কার্য্যকালে তা হ'লো না, আনন্দের আতিশয্যে সৌমেন দিলে ওদের প্রত্যেককে এক-একটি আনি। শুনে অঞ্জলী খুসীই হলো।

ছেলের ষষ্ঠী পুজা হ'লোও খুব ঘটা ক'রে। সৌমেন ব'ললে, খোকার ভাতের সময় এমন ঘটাই ক'রবো যে সারা ব্যারাক শুদ্ধো লোক থ'হয়ে যাবে।

খোকার মুখে চুমা খেয়ে অঞ্জলী ব'ললে, মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে রাখেন তবেই তো— !

সৌমেন হাসতে হাসতে ব'ললে, এক ছেলের মা হ'য়েই যে তুমি ভয়ানক—

—কি ভয়ানক ?

—না, এই গিন্নী-বান্নীর মত পাকামো কথাবার্ত্তা সুরু ক'রলে !

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো অঞ্জলী, তুমি কিচ্ছু বোঝ না !

পরিহাসের সুরে সৌমেন ব'ললে, সেটা কি রকম ?

—ছেলের মর্ম্ম তুমি কি বুঝবে ?

—সত্যি ! আমি নিজেই এখনো ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ হ'য়ে ছেলের মর্ম্ম কেমন ক'রে বুঝবো বল ?

—ভাল হবে না বলছি, তুমি আমার সঙ্গে লেগো না !

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো সৌমেন।

রাত দুপুরে হঠাৎ সৌমেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। খিল খুলে বেরিয়ে এলো সৌমেন ঘুমচোখে। সারা উঠানে সেই নিশুতি রাতে মেয়ে-পুরুষ জমায়েত হ'য়েছে। অন্ধকারে কারুরই মুখ দেখা যাচ্ছে না, চাপা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর ; অস্ফুট কলরব রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রছে। ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর রকমের একটা কিছু ! সৌমেন সজাগ হ'য়ে উঠলো। সকলেই মুখ চাওয়া-চায়ি ক'রছে, যেন আসল ব্যাপারটা খুলে ব'লবার মতো সাহস তারা হারিয়ে ফেলেছে। ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো মঙ্গল সর্দ্দার। সে সৌমেনকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'লবার জন্য। ব্যাপারটি সত্যিই গুরুতর, সাঙ্ঘাতিক। বিপিনের গৃহিণী নন্দরাণী গলায় দড়ি দিয়ে ম'রেছে ! ঘণ্টাখানেক আগে বিপিন বাড়ী ফিরে

দেখে যে, সব শেষ হ'য়ে গেছে। ঘরের ভিতর আড়কাটা থেকে নন্দরাণীর দেহটা এখনো ঝুলছে, ভয়ে তারা লাশ নামায়নি।

ভাবনার কথা নিশ্চয়! সৌমেন গিয়ে দেখলে, বিপিনের নেশা ছুটে গেছে ; সে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছে।

ঝুলন্ত লাশটার দিকে চাওয়া যায় না, ভীষণ ভয়াবহ মূর্ত্তি ! নন্দরাণীর চোখ দু'টো অসম্ভব রকম বড় হ'য়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জিবের ডগাটা দেখা যাচ্ছে। লাশটার পায়ের নীচে মেঝের বুকে কাত্ হ'য়ে প'ড়ে আছে একখানা হাতল-ভাঙ্গা কাঠের চেয়ার। সম্ভবতঃ ওটারই ওপর উঠে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলে প'ড়বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ওখানা পা দিয়ে নন্দরাণী ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

সৌমেন ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে ব'ললে, পুলিশ না এলে চাবি খুলো না। ভোরে থানায় গিয়ে খবর দিও! বিপিনকে যে-কেউ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও, রাতটা তো কাটাতে হবে!

সৌমেনের দেখাদেখি সবাই একে একে যে-যার ঘরে ফিরে গেল। বিপিনকে নিয়ে গেল মঙ্গল সর্দ্দার।

নন্দরাণী ম'রেছে অর্থাৎ আত্মহত্যা ক'রেছে। তিলে তিলে জ্বলে-পুড়ে মরার চেয়ে এ এক রকম ভালই ক'রেছে। ভগবানের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যারা এ জগতে আসে, নন্দরাণী তাদের মধ্যে অন্যতম। কন্যাদায়ের হাত এড়াতে এক আশী বছরের বুড়োর হাতে মামা তাকে তুলে দিয়ে ভাবলে—নিষ্কৃতি পেলাম, কিন্তু ভবিতব্যের হাত এড়াবে কি ক'রে? বিয়ের দু'মাস পরে হাতের নোয়া খুলে সাদা থান প'রে নন্দরাণী ফিরে এলো মামার বাড়ী। যাক্, যা হবার তা তো হ'লো, মোট কথা নন্দরাণীর আইবুড়ো নাম ঘুচলো! মামীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাল-বিধবা মামাতো বোনটি মন্তব্য ক'রলেন, রাঁড় হ'য়ে দিনকে দিন ষাঁড় হ'চ্ছেন! নিরুপায় নন্দ! যৌবন যখন তনুর দুয়ারে হানা দেয় তখন

তাকে রোধ ক'রবে কে? ঘেন্না, অগ্রাহ্য, অযত্ন—দেহের ওপর দিয়ে তার অনেক অযথা অত্যাচারই চ'ললো কিন্তু সবই বৃথা। অনশনে, অর্দ্ধাশনে, উপবাসে কিছুতেই কিছু না। কিছুতেই বাগ্ মানানো গেল না, নিলর্জ্জ যৌবন তার দেহের দু'কূল কানায় কানায় ছাপিয়ে দিলে।

মামার সংসার ছেড়ে আবার শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে যেতে বাধ্য হ'লো নন্দরাণী। সেখানেও তার অদৃষ্টে জুটলো সেই হতশ্রদ্ধা! ননদ ভাজেদের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য ক'রে প'ড়ে রইলো নন্দ—শুধু দু'টি ভাতের জন্য। হোক্ এক বেলা, এক সন্ধ্যা, মোটা ভাত, মোটা কাপড় যোগাতে তো হবে! অবস্থা যখন ওর শ্বশুরকুলের এমনই সঙ্গীন, হঠাৎ ওদের মুস্কিল আসান একদিন আপনি এসে হাজির হ'লো। নদীর ওপারের পরাণ দুলে নন্দকে যেচে চাইলে পণ দিয়ে বিধবা-বিয়ে ক'রতে। এমন সুযোগ কি মানুষে ছাড়ে! পঞ্চাশটি টাকা ধার দিয়ে পরাণ দুলে নন্দরাণীকে একদিন বিয়ে ক'রে নদীর পারে নিয়ে গেল। নন্দর হাত থেকে চিরদিনের মত অব্যাহতি পেয়ে ওর শ্বশুরকুল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

সুখের মুখ দেখতে পাবার আশায় অন্যের অলক্ষ্যে নন্দ নিজের মনে নিজে একটু হাসলো, আর সবার অলক্ষ্যে হাসলো একজন—নন্দর ভাগ্যনিয়ন্তা অদৃশ্য দেবতা।

কথায় বলে, 'তুমি যাও বঙ্গে—কপাল যায় সঙ্গে!' পরাণদুলের স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পেতে বিলম্ব হ'লো না। অসম্ভব তাড়িখোর এই পরাণদুলে। ডাবরিতে এর সানায় না, কলসী খালি হয় পরাণের গোলাপী নেশা হ'তে। একজন নেশাখোরের এক-একটা খেয়াল বা ম্যানিয়া থাকে, পরাণের খেয়াল তার বৌকে ধ'রে কারণে-অকারণে ঠ্যাঙানো।

গ্রামের ডাকঘরের পিয়ন বিপিনের দৃষ্টি প'ড়লো নন্দরাণীর ওপর,

আশনাই জ'মে উঠতে খুব বেশী বিলম্ব হ'লো না। ব্যথার ব্যথী হ'য়ে বিপিন নন্দরাণীর বাস্তব দুঃখে বড় বেশী মুহ্যমান হ'য়ে প'ড়লো। বিপিনকে নন্দরাণীর ভালই লাগলো। না লাগবে কেন? বিপিন দেখতে-শুনতে নেহাৎ মন্দ নয়, অন্ততঃ পরাণের তুলনায় রাজপুত্তুর! তার ওপর হাব-ভাব, চলন-চলনে বেশ একটা মাদকতা আছে, একেবারে মূর্খ নয়—একটু-আধটু লেখাপড়াও জানে; মানে 'বাবু' লোক। আর সবচেয়ে বড় কথা হ'লো, বিপিন নন্দরাণীর ব্যথার ব্যথী!

বিপিনকে জীবন-পথের কাণ্ডারী ক'রে নন্দরাণী এক নিশুতি রাতে পরাণদুলের ঘর ছেড়ে বাইরের জগতে সুখের আশায় পা বাড়ালে।

বিপিন কি তাকে সুখী ক'রতে পারলে, না তার শুধু দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে!·········বিপিনের ঘরের আড়কাটা হ'তে ঝুলন্ত নন্দরাণী এই কথাটাই মনে করিয়ে দেয় যে, 'সুখের আশায় যে ঘর বাঁধিনু—অনলে পুড়িয়া গেল!' আর এত দিন পরে আজ হ'লো তার সর্ব্বদুঃখের, সর্ব্বযন্ত্রণার চির-অবসান।

রোদ উঠতে না উঠতেই কুলী ব্যারাক লাল পাগড়ীতে ছেয়ে গেল। সবার আগে ডাক পড়লো সৌমেনের, কারণ লেখাপড়া-জানা লোক হিসাবে সে-ই এখানের মাতব্বর। কিন্তু কোথায় সৌমেন! ভেজান দরজা, শূন্য ঘরে কেউ কোথাও নেই, শুধু গৃহস্থালীর উপাদান ও শূন্য তক্তপোষটা প'ড়ে আছে। সারা ব্যারাকে কোথাও তাদের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু গেল কোথা আর গেলই বা কেন? সকলেই স্তম্ভিত, কারুর মুখে কথা নেই। নন্দরাণীর আত্মহত্যায় তারা যতটা না আশ্চর্য্য হ'য়েছিল—তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হ'লো ওদের আকস্মিক তিরোভাবে। পুলিশ ভাবলে, নন্দরাণীর আত্মহত্যার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে, নইলে হঠাৎ ঘর-দোর, সাজান সংসার, সাধের চাকরী, সব কিছুর মায়া কাটিযে লোকটা স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘটনার রাত্রেই

স্থান পরিত্যাগ ক'রবে কেন? শুধু পুলিশ কেন, 'বিপিন থেকে সুরু ক'রে মঙ্গল সর্দ্দারের পর্য্যন্ত কেমন সন্দেহ হ'লো। কিন্তু এই অহেতুক সন্দেহের কোন কারণই কেউ ভেবে পেলে না। ভেবে না পাওয়ায় তাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। জটিল ব্যাপার জটিলতর হ'য়ে ক'রলে এক প্রহেলিকার সৃষ্টি!

বিপিনকে নজরবন্দী রেখে পুলিশ নিজের কর্ত্তব্যে মন দিলে। নানা জনকে নানা জেরার পর পুলিশ খানাতল্লাসী সুরু ক'রলে। কিন্তু সন্দেহ-উদ্দীপক কোন কিছুই নজরে প'ড়লো না।

নন্দরাণীর কঠিন হিম দেহ দড়ির ফাঁসি খুলে নীচে নামানো হলো। গায়ে তার ছেঁড়া জামা, গাছকোমর বেঁধে কাপড়পরা। মরার পর যাতে বে-আব্রু না হ'তে হয় সে সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সাবধানই ছিল, সজাগও বলা যায়। আঁচলের একটা খুঁট তার কোমরে গোঁজা, কষিটা বেশ একটু উঁচু। আঁচলের খুটে কি যেন একটা বাঁধা নয়? হ্যাঁ, ঠিক তাই; এক টুকরো কাগজ! আঁকা-বাঁকা অক্ষরে কাগজের ওপর কি যেন অপটু হাতে লেখা। অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার ক'রে দেখা গেল যে, সকল অপরাধ নিজের মাথায় নিয়ে নন্দরাণী মাত্র ক'টি অস্পষ্ট আঁচড়ে সকলকে মুক্তি দিয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় সে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছে, তার মৃত্যুর জন্য দায়ী সে নিজে। এ ক্ষেত্রে আর 'কেনর' প্রশ্ন ওঠে না, উঠলেও আইন অনুসারে হয় তা অবান্তর।

কিন্তু সস্ত্রীক সৌমেন অর্থাৎ তাদের হাজ্‌রেবাবু হঠাৎ এমন ভাবে পালিয়ে গেল কেন!

তের

ছ'মাস পরে যে দৃশ্যের যবনিকা উঠলো।

কার্জ্জন পার্কের এক ধারে একটা খালি বেঞ্চ। সন্ধ্যার অস্পষ্ট

আলো-আঁধারে এক পরিশ্রান্ত ভদ্রলোক ধীর-স্থির-স্খলিত চরণে বেঞ্চের এক ধারে ব'সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ভদ্রলোকের পরণে খাঁকির হ্যাফ্‌প্যান্ট, গায়ে খাঁকি সার্টের ওপর একটা বুকখোলা বোতামবিহীন জিনের কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জরাজীর্ণ জুতা, এক পায়ের মোজা জুতার গোড়ালি পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। ভদ্রলোকের প্যাণ্ট এবং কোট উভয়ই বিশ্রী ময়লা এবং তেলচিটেধরা। বেঞ্চের গায়ে ঠেসান দিয়ে চোখবুজে ভদ্রলোক ব'সে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগলেন। বোধ হয়—বোধ হয় নিজের অদৃষ্টের কথা। কিছুক্ষণ পরে আর একজন স্যুট্‌ধারী ভদ্রলোক তার পাশে এসে ব'সলেন যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে।

পরিশ্রান্ত লোকটি ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে একটা আধ-খাওয়া সিগারেট বের ক'রে দেশলাই জ্বাললেন কিন্তু দমকা বাতাসে গেল কাটিটা নিবে। আবার ধরাবার চেষ্টা ক'রলেন কিন্তু ধ'রলো না। স্যুটধারী ভদ্রলোক একবার চেয়ে দেখলেন। পর প'র ক'টা কাটি নষ্ট হওয়ায় ভদ্রলোকের একবারে জিদ ধ'রে গেল। হঠাৎ একটা কাটি জ্বলে উঠলো, ভদ্রলোক অতি সন্তর্পণে সিগারেটের টুক্‌রাটি ধরিয়ে নিলেন। জ্বলন্ত কাটির আলোয় ধূমপায়ীর মুখখানি দেখে স্যুট্‌ধারী চমকে উঠলেন এবং মাথার টুপিটা একটু সামনের দিকে টেনে দিয়ে ছু' এক মিনিট পরে উঠে গেলেন।

হাজার চেষ্টা ক'রেও যার খোঁজ পাওয়া যায়নি, সেই খুনে ফেরারী আসামী সৌমেন যে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে আজ চরম সীমায় উপনীত হ'য়েছে একথা বুঝতে স্যুটধারী ভদ্রলোকটির বিলম্ব হলো না। সৌমেনের জরাজীর্ণ পোষাক আর চেহারাই তার অবস্থার সম্যক প্রতীক। চট্‌ ক'রে মনে হ'লো তার আর এক কথা—অঞ্জলীর কথা! সৌমেন শুধু তার পত্নীহন্তা নয়, ভগ্নি-অপহারক নিশ্চয়; নইলে সে গেল

কোথা? অঞ্জলীর খোঁজেও তো বিপুল কম অর্থ ব্যয় করেনি! ঐ শীর্ণ-কায় পরিশ্রান্ত লোকটা শুধু তাকে স্ত্রী এবং ভগ্নি থেকে বঞ্চিত করেনি—ক'রেছে বিশ্বসংসার থেকে ! এ বিরাট বিশ্বের বুকে বাঁচবার মতো কোন অবলম্বনই তার রাখেনি ; নিঃস্ব, সর্ব্বহারা, পথের কাঙাল ক'রে ছেড়েছে। অথচ ওই হতভাগাই ছিল তার একদিন অভিন্নহৃদয় বন্ধু!

অন্ধকার আবছায়ায় অদূরে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে বিপুল ক্রমশঃই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। নিজের অজান্তে রিভলভারটা হাতের মুঠোয় সে সজোরে চেপে ধ'রলে, হঠাৎ পরিশ্রান্ত সৌমেনকে বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে দেখে তার চেতনা ফিরে এলো ; আর একটু বিলম্ব হ'লে কে জানে কি হ'তে কি হ'তো ; হয়তো সে সৌমেনকে গুলিই ক'রে বসতো।

দূরত্ব বজায় রেখে অতি সন্তর্পণে বিপুল সৌমেনের পশ্চাৎ অনুসরণ ক'রলে।

স্ল্যানেডে শ্যামবাজারগামী ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে ব'সলো সৌমেন। একটু বিপদে পড়লো বিপুল। একই ট্রামে উঠলে দেখাদেখি হ'য়ে যাবার ভয় আছে, অথচ এক ট্রামে না উঠলে আসামী হাতছাড়া হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, কে জানে কখন কোন জায়গায় নেমে যাবে! প্রথম শ্রেণী থেকে আসামীর ওপর লক্ষ্য রাখা একটু মুস্কিল! আর না উঠেই বা উপায় কি, তার সুপরিচ্ছদই যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার প্রধান অন্তরায় ; সবার দৃষ্টি যে তার ওপরই এসে প'ড়বে! প্রথম শ্রেণীতেই উঠলো বিপুল কিন্তু সিটে ব'সলো না, পাদানির ওপর দাঁড়িয়েই সে লক্ষ্য রাখলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উপবিষ্ট সৌমেনের ওপর। একাগ্রমনে শ্যেনদৃষ্টিতে বিপরীত দিকে তাকিয়ে থাকার দরুণ এক ভদ্রলোক চলন্ত ট্রোমে উঠতে গিয়ে পা-ই মাড়িয়ে দিলে বিপুলের।

কণ্ডাক্টর রাস্তা ছেড়ে তাকে সিটে গিয়ে ব'সতে অনুরোধ ক'রলে, বিপুল তার কথা শুনেও শুনলে না।

শ্যামবাজারে ট্রাম ডিপোর ধারে সৌমেন ট্রাম থেকে নামলো। ফুটপাথের ওপর তোলা উনুনে বেগুনি, ফুলুরি, আলুর চপ্ প্রভৃতি ভাজা হ'চ্ছে ; ছোট্ট শালপাতার ঠোঙ্গায় তেলেভাজা কিনে খেতে খেতে পথ হেঁটে চ'ললো সে। পোল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে প'ড়লো সৌমেন, বিপুল চ'লেছে তার পিছু পিছু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন বেঁচে সে নিজে আর তার সামনের ঐ পথবাহী শীর্ণ-জীর্ণ, খুনে, পলাতক আসামী সৌমেন ! সৌমেনকে দেখে প্রথমটা তার মনে হ'য়েছিল অঞ্জলীর কথা, কিন্তু এখন তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে মন থেকে মুছে গেছে অঞ্জলী !

হাঁটতে হাঁটতে ওরা হাজির হ'লো কাশীপুর বড় রাস্তায় কিন্তু সৌমেনের যেন পায়ে চলার পথের শেষ নেই, নিজের মনে ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত চ'লেছে তো চলেইছে। পা ধ'রে এলো বিপুলের, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা ! বিপুল নিজেকে সংযত ক'রলে।

ওটা ছাড়িয়ে সৌমেন চ'ললো বরাহনগরের দিকে। ওর কাছে পয়সা নেই নিশ্চয়, থাকলে ঠিক বাসে উঠতো। কোন দিনই ও পায়ে হেঁটে কলেজ যেতে পারতো না ! সুখী-ভোগী হিসাবে সৌমেন কিছু কমতি যায় না, বরং বিপুলের চেয়ে বেশী তো কম নয়। হাজার হ'লেও একলা মায়ের এক ছেলে তো ! তা ছাড়া চিরদিনই ও রূপোর চামচে মুখে দিয়ে মানুষ হ'য়েছে। অদৃষ্ট মন্দ, নইলে ছেলে-বেলায় মা বাপ হারিয়ে পরাশ্রিত হবে কেন !

হর্ণের আওয়াজে চমক ভাঙলো বিপুলের, ফিরে এলো মনে তার নূতন ক'রে নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞান। একি আবোল-তাবোল মাথামুণ্ড ভাবছে সে ! পিছন থেকে সৌমেনের আপাদমস্তক বেশ ক'রে দেখে নিলে বিপুল। হ্যাঁ, ঠিক সে-ই !

এঃ আর একটু হ'লে আসামী হাত ছাড়া হ'য়েছিল আর কি? বিপুল সজাগ, সন্ত্রস্ত হ'য়ে পথ চলে।

বরাহনগরে বড় রাস্তা ছেড়ে সৌমেন পাড়ার ভিতর ঢুকলো।

ইটের ওপর খোয়াঢালা এব্ড়ো-খেবড়ো আঁকা-বাঁকা অপ্রশস্ত পথে প্রতিপদে হোঁচট খাবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা। রাস্তার দু'ধারে কাটা নর্দ্দমার গন্ধে বুঝিবা অন্নপ্রাশনের ভাত শুদ্ধো উঠে আসে! নর্দ্দমার ওপাশে জঙলা বন, আবার কোথাও কোথাও বাঁশ-বাঁখারীর বেড়া, জায়গায় জায়গায় বুনোলতার ভরে বেড়া নুয়ে প'ড়েছে পচা নর্দ্দমার ওপর। লাইট পোষ্টগুলির মাথায় জ্ব'লছে কাচের আবরণের মধ্যে কেরোসিন-ডিবে। নানাজাতীয় পোকা চক্রাকারে ঘুরছে ঐ আলোর চারিদিকে, আলোক-বর্ত্তিকার অস্তিত্বে আলোর চেয়ে আঁধারই যেন প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

কিছুদূর গিয়ে বাঁহাতি একটা মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একখানি দোতলা বাড়ী। সৌমেন রাস্তা ছেড়ে ছোট্ট একটি লাফে মাঠে গিয়ে প'ড়লো। দরজার কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলে একটি ছোকরা—সম্ভবতঃ চাকর। কি যেন জিজ্ঞেস ক'রে সৌমেন ভিতরে চ'লে গেল, চাকরটা একবার বাড়ীর ভিতরের দিকে চেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে মাঠে এসে ব'সলো।

তখন সবেমাত্র জোছ্না উঠতে সুরু হ'য়েছে। বিপুল পল্লীর ভিতরের পথ পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে ক'লকাতাগামী বাসে উঠে একটা সিগারেট ধরালে।

*   *   *   *   *

নন্দরাণী—সেই কুলীব্যারাকের নন্দরাণী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার রাত্রেই সস্ত্রীক সৌমেন সেখানকার সকলের অজ্ঞাতসারে অতি সঙ্গোপনে চ'লে আসে ক'লকাতায়; সে প্রায় ছ'মাস পেরিয়ে সাত মাস

হ'তে চ'ললো। সাত-পাঁচ ভেবেচিন্তে ওরা স্থান ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল। অমনভাবে চোরের মতো লুকিয়ে চ'লে আসা সৌমেনের ঠিক ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অঞ্জলীর জেদে তাকে আসতে হ'লো।

নন্দরাণীর মৃত্যু—স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, পুলিশ হাঙ্গামার যথেষ্ট ভয় আছে। আর ক'ঘণ্টা পরেই পুলিশ এসে পড়বে, তদন্ত স্বরু হবে এবং সে দরবারে সৌমেনের যে ডাক প'ড়বে একথা নিশ্চিত। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে এসে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে! খুন—হ্যাঁ একরকম খুনই, খুনের তদন্ত ক'রতে এসে আর এক খুনে আসামীর সন্ধান বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয়। কাজ কি ওসব হাঙ্গামায়! লোকে কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! চাকরী! প্রাণে বেঁচে থাকলে অনেক চাকরীই জুটে যাবে। ভগবানের রাজ্যে না খাইয়ে মারাই যদি ভগবানের নির্দ্দেশ হয় তবে তা' রোধ করার চেষ্টা বৃথা! আপাততঃ স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা ক'রলে অঞ্জলী। নিজের হাতে সাজান গরীবের ঘরের ছোট্ট সংসারটি পিছনে ফেলে শিশুটিকে নিয়ে অঞ্জলী স্বামীর হাত ধ'রে রাতের অন্ধকারে কুলীব্যারাক ছেড়ে চিরদিনের জন্য চ'লে এলো।

তাদের এই আকস্মিক চ'লে আসা নিয়ে অনেক কথাই উঠবে কিন্তু সে সব কাল্পনিক কথাকে অঞ্জলী মোটে আমলই দিলে না। হয়তো এমন কথাও উঠবে যে, ওরাই নন্দরাণীর আত্মহত্যার মূলে কোন-না-কোন সাঙ্ঘাতিক কারণে জড়িত। পুলিশের খাতায় হয়তো নামও উঠতে পারে! যা হয় হোক, ও সব নিয়ে মাথা ঘামাতে চেষ্টা ক'রলে না অঞ্জলী; কারণ, নন্দরাণীর আত্মহত্যার কারণ আর কেউ না জানলেও জানে অঞ্জলী। আত্মহত্যার সঠিক খবর না দিলেও আভাষে-ইঙ্গিতে নন্দরাণী বহু দিন থেকেই তার মনের গোপন বাসনা তার কাছে ব্যক্ত ক'রে আসছে। নন্দরাণীর বিড়ম্বিত অভিশপ্ত

জীবনের ইতিহাস জানে অঞ্জলী। তার আত্মহত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে যদি কেউ দায়ী হয় তো—সে একমাত্র বিপিন আর পরোক্ষে দায়ী হ'চ্ছে তার দুরদৃষ্ট! অত্যাচারের ঘাত-প্রতিঘাতে তার শরীর এবং মন ক্লান্ত, অবসন্ন! মানুষ যেন তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, সবার হাতের ক্রীড়নক হ'য়েই সে জীবনটা দিয়ে গেল; মানুষ হ'য়ে মানুষের মতো বাঁচবার সৌভাগ্য কোন দিনই অর্জ্জন ক'রতে পারলে না।

কালের চাকার তলে কত যুগ, কত শতাব্দী মিশে গেল, এ তো মাত্র ছ'মাস; দেখতে দেখতে ছ'টা মাস কেটে গেল। সামান্য হাজরেবাবুর আয়ই বা কত যে, তা' থেকে একটা মোটামুটি রকমের কিছু সঞ্চিত হবে! নগদ যা কিছু ওরা সঙ্গে ক'রে এনেছিল তা' এই ক'মাস বাড়ীভাড়া দিতে আর সংসার খরচ ক'রতেই নিঃশেষ হ'য়ে এলো। ক'লকাতায় ফেরা অবধি একটি দিনও সৌমেন আলস্য ক'রে ব'সে কাটায়নি, প্রতিদিনই ফিরেছে চাকরীর চেষ্টায় কিন্তু বরাত বড় বালাই; কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না। আশার মোহে প'ড়ে ঘোরার তার বিরাম নেই।

আজই সকালে পোদ্দারের দোকানে অঞ্জলীর হাতের চুড়ি দু'গাছি বাঁধা দিয়ে বাড়ীভাড়া, মুদির দেনা আর গয়লার বাকি দুধের টাকা মেটানো হ'য়েছে। অতটুকু কচিছেলের দুধ নইলে কি চলে, ও তো আর ভাত খেতে পারে না! কাঁচা আনাজ তো প্রায় কিনে খেতে হয় না, এই ক'মাসেই অঞ্জলী নিজের হাতে কত কি তরি-তরকারির চাষ ক'রেছে। শুধু আনাজ-পাতি, শাকসবজি কেন; ফুলগাছের চাষও কম করেনি। প্রথম প্রথম সৌমেন তাকে ঠাট্টা ক'রতো কিন্তু এখন আর করেনা, বলে—হ'লো কি, তোমার হাতে যে সোনা ফলে, অঞ্জু! আহা, তবু যদি গাছগুলোর গোড়ায় রীতিমত জল প'ড়তো!

অঞ্জলীর দেখাদেখি সৌমেনও শেষ পর্য্যন্ত চাষ-বাসে মন দিলে, সময়

পেলেই গাছের গোড়ায় জল ঢালে—ঘাস নিড়োয়—বাঁশের খুঁটি পুঁতে লাউগাছ পুঁইগাছের জন্য মাচা বাঁধে—গাছের গোড়ায় গোড়ায় দেয় গোবর-মাটির সার। অঞ্জলীর অনেক দিনের ইচ্ছা একটি গরু পোষে। গরু পোষায় অনেক লাভ, খোকার জন্য দুধও কিনতে হয় না আর ঘুঁটে গোবরের তো কথাই নেই। সৌমেন প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলে, এবার চাকরী হ'লে আগেই তোমায় একটি বাছুর সমেত গরু উপহার দেবো। অঞ্জলী বলে, সত্যি দেবে তো?

কিন্তু গরু কেনা তো দূরের কথা, সংসার তো আর চলে না! কি ক'রে যে অঞ্জলী কি ক'রছে তা ওই জানে! আশায় আশায় কত দিন আর থাকা যায়? ভয়ানক মুষড়ে পড়ে সৌমেন, ধৈর্য্যেরও তো একটা সীমা আছে! যা হোক দুটি মুখে দিয়ে প্রতিদিনই সে বোরোয় চাকরীর চেষ্টায় আর প্রতিদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরে আসে শুকনো মুখে, ক্লান্ত চরণে। আশা নিয়ে যাওয়া আর নিরাশ হ'য়ে ফেরা—এ যেন তার দৈনন্দিন বাঁধাধরা রুটিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এক-একদিন তার বাড়ী ফেরবার পথে মেজাজ এমন খারাপ হয় যে, সে মনে মনে অঞ্জলীর সঙ্গে দস্তুরমতো ঝগড়া ক'রবে ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে আসে। অঞ্জলীই তো তার পথের কাঁটা সে-ই তো তাকে জড়িয়েছে সাতপাকের বাঁধনে। একটা পেটের জন্য তার কিসের চিন্তা, সে তো অনায়াসে কৌপীন সম্বল ক'রে লোটা-কম্বল হাতে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়তে পারতো কোন অনিশ্চিতের পথে। এও যদি সম্ভব না হ'তো তা হ'লে 'মরার বাড়া তো আর গাল নেই'—আত্মহত্যা করায় বাধা কি ছিল? যত নষ্টের মূল হ'চ্ছে অঞ্জলী! ছেলের মা হবার, সংসার পাতবার এতই যদি সখ তবে আর কোন ভাগ্যবানের গলায় মালা দিলেই পারতো!

ঝগড়া ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই বাড়ীতে পা দিলো সৌমেন, কিন্তু

খোকাকে কোলে নিয়ে অঞ্জলীকে এগিয়ে আসতে দেখেই তার সমস্ত সংকল্প চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেলো। স্ত্রী-পুত্রের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে তার অন্তর-আত্মা ব'লে উঠতো, আমি একটা অপদার্থ!

দিন ওদের এমনি ভাবেই কাটছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সৌমেন বাড়ীতে আসা মাত্র খোকা হামা দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ব'ললে, বাব্-বা বাব্-বা!

কুটনো কুটতে কুটতে অঞ্জলী ব'ললে, এদিকে আয় দুষ্টু ছেলে! আহ্লাদে আটখানা! তুমিও তো তেমনি, মুখ হাত ধোয়া—চা খাওয়া—একটু বিশ্রাম করা দূরে গেলো; ছেলে কোলে নিয়ে আদর ক'রতে ব'সলে! দাও দাও—নামিয়ে দাও! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার পরকাল তুমিই ঝরঝরে ক'রলে।

শুষ্ক হাসি হেসে সৌমেন ব'ললে, কিছুই তো দিতে পারিনি, আদর দিতে তো আর পয়সা লাগে না, অঞ্জু! নাঃ ছেলেটার বরাতই খারাপ!

—সারাদিন তেতেপুড়ে এসে এবার বুঝি দুঃখের পাঁচালী গাইতে সুরু ক'রলে? নাঃ তোমাদের নিয়ে আর পারি না!

ভাতের ফ্যান গড়িয়ে চায়ের জল চাপিয়ে অঞ্জলী ব'ললে, এসো তো খোকা—আমার কোলে এসো?

এক গাল হেসে খোকা বাবার বুকে মুখ লুকালো, বাঁবার কোল থেকে নামতে সে রাজি নয়। অঞ্জলী একরকম জোর ক'রেই খোকাকে সৌমেনের কোল থেকে নিজের কোলে নিলে, খোকা কোকিয়ে কেঁদে উঠলো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে উঠতে সৌমেন ব'ললে, একটু পরে গেলেই তো চ'লতো, অঞ্জু। নাঃ তোমার সবটাই বাড়াবাড়ি। আধ ঘণ্টা

চা খাওয়ার দেরী হ'লে আমি কি ভিরমি যেতাম? চুপ কর বাবা—চুপ কর! পাজি ছেলে—সোনা ছেলে—লক্ষ্মী ছেলে!

ছেলেকে শান্ত ক'রে সৌমেন জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুতে গেলো।

চা খেতে খেতে সৌমেন ব'ললে, কালীঘাটে যে বামুন ঠাকুর আমাদের বিয়ে দিয়েছিলো গো—আজ হঠাৎ চৌরঙ্গীতে তার সঙ্গে দেখা। ভেক তার পালটে গেছে, পরণে মোটা থানধুতির বদলে এখন দেখলাম গরদ। গলায় আধ ময়লা ছেঁড়া উড়ুনি আর নেই, এখন নূতন নামাবলী আর ধোপদস্তর সিল্কের চাদর। পায়ে আনকোরা বিদ্যাসাগরী শুঁড়তোলা চটি। চেহারাখানা বেশ খোলতাই হ'য়েছে, দিব্যি নেওয়াপাতি ভুঁড়ি, কপালে চন্দন, মাথায় নধর টিকি। প্রথমটা দেখে তো চিনতে পারিনি, হকচকিয়ে গেছলাম; সে-ই আমায় প্রথম চিনলে। পুজারী বামুন এখন জ্যোতিষার্ণব হ'য়েছেন, কলুটোলায় তাঁর অফিস। সে মূর্ত্তি যদি এখন একবার দেখতে অঞ্জু—তাহ'লে সত্যি সত্যি তাজ্জব হ'য়ে যেতে।

তরকারী চাপাতে চাপাতে অঞ্জলী ব'ললে, আর কি ব'ললে?

—হ্যাঁ সে ঠিক খেয়াল আছে। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলে। আজে-বাজে নানা কথার পর সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখে ব'ললে—'তোমার নামে একখানা লটারীর টিকেট কিনতে'।

উদগ্রীব হ'য়ে অঞ্জলী ব'ললে, তোমার কথা আর কিছু ব'ললে?

—নিশ্চয় ব'ললে। ব'ললে—আমার পরমায়ু দীর্ঘ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে কি বললাম জানো? বললাম হাতের নোয়া বজায় রেখে আমাদের অঞ্জু তাহ'লে বেশ কিছুদিন মাছভাতটা খেতে পাবে!

কৃত্রিম ঝঙ্কারে অঞ্জলী ব'ল্লে, আঃ কি সব আবোল-তাবোল ব'কছো !

কতকটা যেমন নিজের মনেই ব'লে চললো সৌমেন, বোকা ঠাকুর ! মাথার ওপর যার খাঁড়া ঝুলছে-তার পরমায়ু কি কখন দীর্ঘ হ'তে পারে ! ধরা দেওয়াই আমার উচিত ছিল, তাহ'লে—

—তোমার কি হ'য়েছে বলতো ? সংসারে সুখ দুঃখের কথা গেলো, চাকরী-বাকরীর আলোচনা গেলো, খোকার সঙ্গে গল্প-করা গেলো ; নিজের মনেই বকর বকর ক'রছো !

—ধূমায়িত বহ্নি ছাই ছাপা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু নিবানো যায় না, অঞ্জু ! যাক্ আপাততঃ তাহ'লে তোমার নামে একখানা লটারীর টিকিটই কিনি— কি বল ?

অঞ্জলী ব'ললে, যদি একান্তই কিনতে হয়, তবে আমার নামে না কিনে তোমার নামেই কেনো।

শুষ্ক হাসি হাসলে সৌমেন।

—কি, হাসছো বড় ?

—বাসের কণ্ডাকটর যাকে বাসে উঠতে দিতে চায় না তার নামে টিকেট কিনলে ফল যা হবে তা আমি আগে থাকতেই ভবিষ্যৎবাণী ক'রতে পারি।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে অঞ্জলী ব'ললে, তার মানে ?

—অর্থাৎ আমার মতো অপয়া লোককে বাসে তুললে—বাসে তাদের লোক হয় না।

ক্ষণেকের জন্য গুম খেয়ে ব'সে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগলো অঞ্জলী।

সৌমেনই প্রথম কথা ব'ললে। ব'ললে, তুমি যখন গররাজী তখন খোকার নামেই কেনা যাক্, কি বল ?

গম্ভীর অথচ করুণ কণ্ঠে ব'ললে অঞ্জলী, কারুর নামেই কিনে দরকার নেই!

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হাস্য-পরিহাসের অনেক কথাই হ'লো কিন্তু অন্য দিনের মতো ঠিক তেমন জ'মলো না, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা জোড়া তালি দেওয়া খাপছাড়া টুকরো আলোচনার সমষ্টি, কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগ নেই।

রাত তখন দু'টোই হবে।

বন্ধ দরজার কড়া নাড়ার শব্দে সৌমেনের ঘুম ভেঙে গেলো। এত রাত্রে চাকরটার আবার কি দরকার প'ড়লো! এই ভেবে ঘুমচোখে সে দরজা খুলে দেওয়ামাত্র টর্চের তীব্র আলো মুখের ওপর ছড়িয়ে প'ড়লো।

—Hands up! উদ্যত রিভলবার সৌমেনের বুকের ওপর ধ'রে বিপুল গ'র্জ্জে উঠলো।

দু'টো হাত ওপর দিকে তুলে কম্পিত কলেবরে সৌমেন মন্ত্রচালিতের মত পিছু হ'টে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়লো।

—সারা বাড়ী পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। পালাবার চেষ্টা ক'রলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য্য! বিপুলের বক্তব্য তখনও শেষ হয়নি, মশারীর ভিতর থেকে একটি নারীমূর্ত্তি বিপুলের সামনে এসে দাঁড়াবা মাত্র ঈষৎ কম্পিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, কে—

বৈদ্যুতিক আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে বিপুলকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো অঞ্জলী, ব'ললে আমায় চিনতে পারছো না, দাদা?

—তুই—তুই এখানে?

—আশ্চর্য্য হবার কি আছে, দাদা! আমি তো অন্যায় কিছু করিনি।

বিপুলের লক্ষ্য প'ড়লো অঞ্জলীর সিঁথির সিঁদুরের ওপর। এক লহমার জন্য সে নিজের কর্ত্তব্য ভুলে বিহ্বল নেত্রে চেয়ে রইলো অঞ্জলীর মুখের দিকে। পর মুহূর্ত্তে কঠোর কণ্ঠে বিপুল ব'ললে তোর মুখ চেয়ে আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলতে পারি না। না—না—কিছুতেই না!

—আমি একা নই! ব'লতে ব'লতে অঞ্জলী মশারীর ভিতর থেকে একটি ঘুমন্ত ক্ষুদ্র শিশুকে এনে বিপুলের পায়ের তলায় শুইয়ে দিলে।

ধীরে ধীরে বিপুল আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত শিশুটিকে সাদরে বুকে তুলে নিয়ে করুণ নয়নে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে, শিশুর গণ্ডে এঁকে দিলো চুম্বন রেখা সাশ্রুনয়নে। অঞ্জলীর কোলে শিশুটিকে ফিরে দিয়ে বোনের মাথায় হাত রেখে ব'ললে বিপুল বাষ্পরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠে,—তোরা সুখী হ'! তোর সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।

দাদা! ব'লে অঞ্জলী লুটিয়ে পড়লো বিপুলের পায়ের তলায়।

নীচে নেমে এসে বিপুল পুলিশ কর্ম্মচারীদের ব'ললে Excuse me! আপনাদের অনর্থক কষ্ট দিলাম। ভুল information! Good-night!

সদলে ওরা ফিরে গেল ক্ষুণ্ণ মনে।

গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ রজনী। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে উদ্‌ভ্রান্ত বিপুল একা এগিয়ে চ'ললো অনিশ্চিতের উদ্দেশে। কোথা যাবে, কেন যাবে, কি তার উদ্দেশ্য—সে তা' নিজেই জানে না! অবস্থা বিপর্য্যয়ে মানুষ মাঝে মাঝে এমনি নিশ্চেষ্ট, এমনি নিষ্ক্রিয় আর এমনি চিন্তাশক্তিহীন হ'য়ে থাকে! তখন তার মনে হয় এ দুনিয়ার সে কেউ নয়, এখানে আপনার ব'লতে তার কেউ নেই; একা সে—সম্পূর্ণ একা।

স্খলিত চরণে বিপুল এসে প'ড়লো গঙ্গার ধারে। গঙ্গার দু'কূল প্লাবিত ক'রে তখন জোয়ার এসেছে, পূর্ণ জোয়ার। স্থির ধীর গঙ্গার জলের ওপর ভেসে যাচ্ছে আকাশের অজস্র তারা। সব দিনের চেয়ে আজ যেন বেশী উজ্জল হ'য়ে শুকতারা দেখা দিয়েছে পুব আকাশের কোল ঘেঁসে। ভোর না হ'তেই ভোরের বাতাস বইতে সুরু ক'রলো।

নিশ্চল নেত্রে শুকতারাটির দিকে চেয়ে রইলো বিপুল। কিছুক্ষণের পর আপনাতে আপনি ফিরে এসে সে পকেট থেকে কাগজ-পেনসিল বার ক'রে কি যেন লিখলো স্বল্প গ্যাসালোকে। লেখা-কাগজের টুকরাটি সযত্নে পকেটে রেখে গঙ্গার কিনারায় এসে দাঁড়ালো বিপুল, এদিক ওদিক লক্ষ্য ক'রলো, কেউ কোথাও নেই, শুধু তীরস্থ অশ্বথ-গাছের ওপর কি একটা পাখী ডানা ঝট্ পট্ ক'রে তার-স্বরে ডেকে উঠলো।

গঙ্গার বাঁধানো খাড়াই পাড়ের গা ঘেঁসে বেশ কয়েক হাত নীচে স্রোত ব'য়ে চলেছে, বিপুল ঐ খাড়া-পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে গায়ের কোটটা খুলে ছুঁড়ে দিলো অদূরে রাস্তার দিকের ঐ আস্থদ গাছটার তলায়, তারপর দু'পাটি জুতাও দিলে ছুঁড়ে ঐ কোটের ওপর। আকাশের দিকে একবার শেষ চাওয়া চেয়ে গঙ্গার দিকে পিছুন ফিরে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বার ক'রে ঠিক কণ্ঠনালীর কাছে ধ'রলে। জলের দিকে ঈষৎ বেঁকে বিপুল আগ্নেয় অস্ত্রের ঘোড়াটি টিপে দিলো।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'লো ক্ষণেকের তরে, আকস্মিক গঙ্গা বক্ষে জাগলো ক্ষণেকের আলোড়ন. পরমূহুর্ত্তে আবার যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্; আবহমান কালের চলন্ত দুনিয়া আর গঙ্গা বক্ষে চলন্ত স্রোতে চ'লতে লাগলো ঠিক পুর্ব্বেরই মত।

পর দিন খবরের কাগজের সান্ধ্য-সংস্করণে দেখা গেলো :—

খুনী গোয়েন্দার আত্মহত্যা

ও

মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীকারোক্তি

(প্রাপ্ত পত্র হইতে গৃহীত)

কোন অনিবার্য্য কারণে আমি (বিপুল বসু) আমার সদ্য বিবাহিত পত্নী গীতা দেবীকে বিয়ের রাত্রে হত্যা ক'রতে বাধ্য হই। মিথ্যা এতদিন আমার বাল্যবন্ধু সৌমেন রায়ের ওপর দোষারোপ ক'রে ও পুলিশের চোখে তাকে দোষী প্রতিপন্ন ক'রতে চেষ্টা পেয়ে নিজে আত্মগোপন ক'রে ছিলাম, কিন্তু আর স্বীকার না ক'রে পারলাম না বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে! সৌমেন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। নিজে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে আমি সেচ্ছায় "আত্মহত্যা" কর'ছি। বিদায়……

ইতি—

বিপুল বসু

২রা জানুয়ারী, ১৯৪৩।